জয় যৌধেয়

Jai Yaudheya

Historical novel

by

Rahul Sankritayan

7.00

জয় যৌধেয়

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদক : শ্রীভগীরথ

বিশ্ববাণী
১১-এ বারাণসী ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :

আশ্বিন, ১৩৬৮

প্রকাশক :

ব্রজকিশোর মণ্ডল

বিশ্ববাণী

১১।এ, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্

কলিকাতা-৭

মুদ্রক :

শ্রীকালীপদ নাথ

নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

৬, চালতাবাগান লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ শিল্পী :

পিটার মাথুর

অঙ্কন লিপি :

শচীন বিশ্বাস

সাত টাকা

পূর্বকথা

জয় যৌধয় একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এতে খৃঃ সন ৩৫০-৪০০ (গুপ্ত সম্বত ৩০-৮০) ভারতবর্ষের রাজনীতিক, সামাজিক অবস্থার চিত্রণ করা হয়েছে। যৌধেয় খুব বড় এবং বলশালী গণরাজ্য ছিল। যমুনা সতলজ অর্থাৎ হিমালয় চম্বলের মধ্যে অবস্থিত ছিল এই রাজ্য। ইতিহাস এবং আমাদের পুরনো লেখকরা এদের সম্বন্ধে ক্রুর মৌনতা অবলম্বন করে আসছেন। বস্তুতঃ তাদের দ্বারা সম্ভব হলে হয়ত যৌধেয় নাম পর্যন্ত আমাদের কাছে এসে পৌঁছতে পারত না। কিন্তু সিক্কাগুলিকে কে অস্বীকার করবে। একদিন সকলের অজ্ঞান্তে সেগুলি মাটির নিচে আশ্রয় নিয়েছিল আজ তারা চীৎকার করে বলছে বিগত দিনের যত কাহিনী। লাশ নিজেই সাক্ষী দিচ্ছে, অপরাধীকে সনাক্ত করে। আজ তাই বিস্মৃত যৌধেয় আবার আমাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই এখনও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর তথা ভারতীয় পুরাতত্ত্ব গবেষক ডাঃ অলতেকরের মত বিদ্বান পরিষ্কার বলছেন যে ভারত থেকে বিদেশী কুষাণদের পাষাণ তুলে দেবার পিছনে যৌধেয় জাতির চেষ্টা ছিল, গুপ্ত বা ভারশির বংশের নয়।

চতুর্থ শতাব্দীতে সমুদ্রগুপ্ত অশোকের পাষাণ স্তম্ভে (যা আগে কৌশম্বীতে ছিল এবং এখন এলাহাবাদ কেল্লায় রয়েছে) যৌধেয়দের স্মরণে লিখেছেন তারা কর-দান-আজ্ঞা স্বীকার এবং (সর্বকরদানাজ্ঞাকরণপ্রণামাগামন) প্রণাম দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করেছে। সমুদ্রগুপ্তের লেখা থেকে বোঝা যায় যে সমুদ্রগুপ্ত যৌধেয়দের উচ্ছেদ করে নি। কিন্তু পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতে আমরা যৌধেয়দের আর কোনও হদিশ পাই নি। অতএব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে চন্দ্রগুপ্তই যৌধেযদের উচ্ছেদ করেছিল। আমি আমার উপন্যাসে সেই গৌরবশালী যৌধেয়গণ ও তাদের ধ্বংসলীলাকে চিত্রিত করেছি। এতে রাজা, রাজকুমার বা গুপ্তবংশী অধিকারীদের নাম ব্যবহার করতে ঐতিহাসিক সামগ্রীর উপযোগী করতে হয়েছে। জাতি হিসেবে যৌধেয়রা বিস্মৃত হয়েছে যখন, তখন কোন ব্যক্তির নাম পাওয়া খুবই শক্ত। সমাজ চিত্রণে আমি কালিদাসের গ্রন্থ এবং সেই সময়ের পর্যটক ভিক্ষু ফা-হিয়েনের যাত্রা বিবরণের সাহায্য নিয়েছি। ডাক্তার অলতেকর, প্রফেসর রাখালদাস ব্যানার্জী (The Age of the Imperial Guptas), এবং ডাঃ আর, এন, ডণ্ডেকর (A History of the Guptas)-এর

গ্রন্থ এবং গুপ্তকালীন শিলালিপি ও সিক্কাগুলি এই গ্রন্থ রচনায় বহুলাংশে সহায়তা করেছে।

যৌধেয়দের সিক্কা খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দী থেকে খৃঃ ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত পাওয়া যায়। কুষাণদের আগেকার যৌধেয় সিক্কায় (খৃঃ ১ম শতাব্দী) লেখা আছে দেখা যায়। "যৌধেয়ানাং বহুধান্যকানাং" বা "ভগবত্স্বামী ব্রহ্মণ্যদেবায়ঃ" পরের সিক্কাগুলিতে লেখা দেখা যায় "যৌধেয় গণস্য জয়ঃ" যৌধেয়ানা-জয়মন্ত্রশালীনা"। খৃঃ ১৫০ শতাব্দীতে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামা তার লেখায় (জুনাগড়) শত্রুর বীরত্বকে স্বীকার করে লিখেছেন "সর্বক্ষত্রাবিস্কৃত বীরশব্দ জা স্থেকানাং যৌধেয়ানাং"। ভরতপুর রাজ্যের তহশিল থেকে দুই মাইল দূরে যৌধেয়গণের এক মহাসেনাপতির শিলালিপি খোদাই করা রয়েছে "সিদ্ধং (।) যৌধেয় গণপুরস্কৃতস্য মহারাজ মহাসেনাপতেঃ পু.........ব্রাহ্মণোপুরঙ্গ চাধিষ্ঠানং শারিবাদি কুশলং পৃষ্ঠবা লিখত্যস্তিরস্যা......" (J. F. Fleet : Inscriptions of the Early Gupta Kings)।

এখন প্রশ্ন হল এই বীর যৌধেয় জাতি কি একেবারে উচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল? সেই যুদ্ধে অবশ্যই তাদের বেশী সংখ্যক লোক ক্ষয় হয়েছিল কিন্তু কিছু পরিমাণ যৌধেয় রক্ষাও পেয়েছিল। ভাগলপুর রাজ্য থেকে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত এক এলাকা "জোহিয়াবার" নামে পরিচিত এবং সেখানকার বহু সংখ্যক নিবাসীকে "জোহিয়া" (যৌধেয়) বলা হয়। করাচীর কোহিস্তানে জোহিয়া জাতি বাস করছে। তাদের সর্দারকে এখনও জাহিয়া-জো-সাম বলা হয়ে থাকে। অলবর এবং গুড়গাঁ-এর মেব এখনও যৌধেয় ভূমিতে বসবাস করে থাকে। এখনও তাদের পূর্ব বীরগাথা সকল শুনলে রোমাঞ্চিত হতে হয়। এরা এখন মুসলমান, কিন্তু যৌধেয় রক্তকে ভুলতে পারে নি। আজও তাদের স্ত্রীরা সেই সকল গান গেয়ে থাকে যে গীতের মাধ্যমে নারীদের কূপ-পূজা করাবার জন্য মেব বীরদের প্রাণোৎসর্গের হৃদয়-দ্রাবক বর্ণনা রয়েছে।

এ ছাড়া অগ্রবাল, অগ্রহরী, রোহতগী, রস্তোগী, শ্রীমাল, ওসবাল, বর্ণবাল, গহোই (?) প্রভৃতি জাতিকে আজকাল বৈশ্য বলে আমরা জানি, তারা সকলেই যৌধেয় সন্তান। যারা গণোচ্ছেদের পর তরবারী ছেড়ে পাল্লা-দাড়ি ধরতে বাধ্য হয়েছে।

যদিও এই উপন্যাসের শরীরে ঐতিহাসিক সামগ্রী অস্থিপঞ্জরের কাজ করেছে কিন্তু মাংস আমি নিজের কল্পনা দিয়ে পূরণ করেছি।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সমুদ্রগুপ্ত এবং যৌধেয়

আমার অতীত শৈশবের যখনকার কথা স্মরণ করতে পারি তখন আমার বয়স চার সাড়ে চার বৎসর। কিন্তু আজ যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই জীবনস্মৃতি লিখে রাখছি, তার জন্য আমার জন্মেরও তিন বৎসর আগে থেকে কাহিনী সুরু করা একান্ত প্রয়োজন।

বিশেষ করে তখন থেকে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে যে সকল ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি বা সময়ের গতির যে পরিবর্তন দেখেছি, তাতে আমার মনে ধারণা জন্মেছে যে অদূর ভবিষ্যতে, ভাবী বংশধরেরা হয়ত যৌধেয় নাম পর্যন্ত ভুলে যাবে, এবং যে গণস্বাতন্ত্রের জন্য লক্ষ লক্ষ যৌধেয় নরনারী হাসতে হাসতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, তাদের স্মৃতিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। হয়ত সেসব কাহিনী তাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে।

দেবপুত্র শাহীর (কুষাণ) দম্ভ চূর্ণ করেছিলাম আমরা। কিন্তু তার কৃতিত্ব গুপ্তবংশ নিতে চাইছে। আড়াই শ বৎসর আগে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার সঙ্গে যুদ্ধে তাকে আমরা এমন শিক্ষা দিয়েছিলাম যে তারপর আর কখনও তাঁর আমাদের দিকে ঘুরে তাকাবারও সাহস হয়নি। এমন কি উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপদেরও নয়। শক ক্ষত্রপদের নির্বল করতে যৌধেয়দের কৃতিত্বের অন্ত ছিল না। তবু তার জন্যও কালিদাস এবং আরও অনেকে যারা গুপ্তবংশকে যশশালী প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করতেন তাদের চেষ্টারও অন্ত ছিল না। এমন কি তাঁরা অনেকদূর কৃতকার্যও হয়েছিলেন।

সম্রাট বুঝতে পারলেন যে মিনান্দর এবং কণিষ্ক পন্থীদের হাত থেকে ভারতভূমিকে বাঁচাতে হলে, ভারতের সকল রাজ্য ও গণকে মিলিত হতে হবে। তাদের বীর যোদ্ধা, রণকুশলী সেনাবাহিনী প্রভৃতি সকল প্রকার শক্তি ও সামর্থকে একই সূত্রে বাঁধতে হবে। নতুবা বহিঃশত্রুর হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করা অসম্ভব। তাই সমুদ্রগুপ্ত আরও লিখলেন ঃ

আমি লিচ্ছবি দৌহিত্র ভারতের জনমনের জনগণের মহামিলনের সেই সূত্র হতে চাই। যৌধেয়গণের এক অঙ্গুলি পরিমাণ ভূমিও আমি অপহরণ করতে চাই না। আমার একমাত্র কামনা যে ভারতের মাটি থেকে বিদেশী ম্লেচ্ছদের শেষ চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে। যৌধেয় খড়গ মহামিলনের সেই বৃহৎ সূত্রের সঙ্গে মিলিত হউক। যুদ্ধের নির্মমতা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করেছে। যাদের আমি আমার মাতৃকুল বলে মনে করি তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে আমি রাজী নই। যদি যৌধেয় বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভারতের বাকী অংশ থেকে বিদেশী শাসণের উচ্ছেদকল্পে অস্ত্র ধারণ করতে রাজী হন, তাহলে আমি আমার সেনাপতিকে সাত দিনের জন্য যুদ্ধ বন্ধ করতে আদেশ দিয়েছি, এই সময়ের মধ্যে যৌধেয় বন্ধু নিজে এসে লিচ্ছবি দৌহিত্রের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করুন।

এই যুদ্ধে যৌধেয়গণের ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হয়েছিল যে যৌধেয়গণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। ইতিমধ্যে সমুদ্রগুপ্তের পত্র পেয়ে চিন্তার অবসর পেলেন তাঁরা। তখন যৌধেয়গণের গণসভাপতি আমার পিতা মহারাজ, মহাসেনাপতি কুমার যৌধেয়, আর্জুনায়ণ-গণের গণসভাপতি নরবর্মা, ও কুনিন্দগণের গণসভাপতি রোহিত, এরা তিনজনে যুক্তি করে এই তিন গণসঙ্ঘের সভাপতি সুষেণ যৌধেয় সহ মথুরা গেলেন সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে।

সমুদ্রগুপ্ত আনন্দিত হলেন এবং সমাদরে এদের অভ্যর্থনা করলেন। প্রাণ খুলে আলোচনা করলেন। বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে লড়াই করবার

ব্যয় হিসেবে সম্মিলিত যুদ্ধকোষে কিছু অর্থদান করতে বললেন সম্রাট। সম্রাটের প্রস্তাব তারা সানন্দে অনুমোদন করল।

যৌধেয়, আর্জুনায়ন ও কুনিন্দগণের মধ্যে মহারাজ মহাসেনাপতি সুষেণ পদাধিকারে বা ক্ষমতায় যদিও সবচেয়ে বড় ছিলেন কিন্তু সকলের সঙ্গে আলাপ করে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত বুঝতে পেরেছিলেন যে এদের মধ্যে আমার পিতা কুমার যৌধেয় সবচেয়ে চতুর ও প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তাই তিনি সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট হয়েছিলেন আমার পিতা কুমার যৌধেয়-এর দিকে।

সন্ধিপর্ব শেষ হলে সমুদ্রগুপ্ত যৌধেয় নগরী অগ্রোদকায় (অগ্রোহা) এসে স্বয়ং যৌধেয় বন্ধুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। এবং কিছুদিনের মধ্যেই সামান্য কয়েকজন দেহরক্ষী ও কয়েকজন সামন্ত সহ অগ্রোদকাতে এসে পৌঁছলেন।

রাজোচিত সম্মান দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো যৌধেয়গণ। তারপর শুরু হল আলাপ-আলোচনা আর সুখ-দুঃখ কাহিনী। যুদ্ধের ক্রুরতা এবং যৌধেয়গণের উপর অত্যাচারের কাহিনী শুনতে শুনতে সমুদ্রগুপ্তের অনুতাপ হল। চোখে জলের ধারা নেমে এল। কথা বলতে গিয়ে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে। উপস্থিত সকলে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ল। সম্রাট বললেন,—এ সব কিছুই আমার জন্য হয়েছে, এর জন্য আমিই দায়ী। আমার মস্তক আপনাদের সামনে নত করছি, আপনাদের খুশীমত দণ্ড দিন আমাকে। উপস্থিত সকলের চোখেও জলের ধারা নামে মহান সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের ব্যবহারে। সম্রাট যৌধেয় মহাসেনাপতি কুমার যৌধেয়'র চরণের দিকে হাত বাড়াতে কুমার সম্রাটকে ধরে আলিঙ্গন করলেন। বুকের মধ্যে চেপে ধরলেন আনন্দের আতিশয্যে। অতঃপর গণসংঘের সকল সদস্যদের সঙ্গে আলিঙ্গন করলেন সমুদ্রগুপ্ত। সকলের মন থেকে এক মুহূর্তে সকল ক্লেদ গ্লানি ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল আর অনলের শিখার মত এই সংবাদ সমস্ত যৌধেয় ভূমিতে ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না। সকলে শত্রুতা ভুলে গিয়ে সমুদ্রগুপ্তের জয়গান গাইতে লাগল ঘরে ঘরে।

তারপর মাত্র পনের দিনের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত আমার দিদির পাণিগ্রহণ করলেন এবং তাকে পাটরাণীর সম্মান দিলেন। যৌধেয়গণের আনন্দের সীমা রইল না। তারা সম্রাটকে পরমাত্মীয়ের মত সানন্দে গ্রহণ করলো।

আমার দিদি দত্তাদেবীর প্রথম পুত্র রামগুপ্তের জন্ম হয়েছিল পাটলীপুত্রে। কিন্তু দ্বিতীয়বার আসন্ন-প্রসবা হলে তিনি পিতৃগৃহে আসার কথা বললেন সম্রাটকে। সম্রাটও খুশী হয়ে পাঠিয়ে দিলেন। অগ্রোদকাতে দত্তাদেবীর দ্বিতীয় পুত্র চন্দ্রগুপ্তের জন্ম হল। তার তিন মাস পর আমার জন্ম হল। দিদির আনন্দের সীমা নেই। সম্রাটের উপর্যুপরি পত্র উপেক্ষা করে তিনি এক বৎসর পরে ফিরে গেলেন রাজধানীতে। চন্দ্রের চেয়ে আমার উপর দিদির স্নেহ ছিল অধিক। দুধ খাওয়াবার জন্যে যদিও অন্য ধাত্রী নিযুক্ত ছিল কিন্তু দিদি চন্দ্রগুপ্তকে নিজের স্তনদুগ্ধ পান করাবার সময় বলতেন "যৌধেয় দুগ্ধের অন্যরকম গুণ।" আমাকে আর চন্দ্রকে দিদি সদা সর্বদা নিজের কাছেই রাখতেন এবং অত্যধিক মমতার বশবর্তী হয়ে কতবার আমাকে নিজের স্তনদুগ্ধ দিয়েছেন। দত্তাদেবী আমার শুধু অগ্রজাই ছিলেন না দুগ্ধদাত্রী মাও ছিলেন। তাঁর স্নেহ মমতার কথা আমি ভুলতে পারবো না যতদিন এ দেহে প্রাণ থাকবে। রাজধানী ফেরবার সময় দিদি আমাকে নিয়ে যেতে চাইলেন নিজের সঙ্গে। কিন্তু মায়ের পক্ষে খুবই মুস্কিলের কথা। একে ত মায়ের একমাত্র পুত্র আমি তাও একটু বেশী বয়সে হয়েছি বলে মাতৃস্নেহও একটু বেশীই হবার কথা। তবুও বড় মেয়ের কথা রাখতে তিনি দিদিকে বলে দিলেন এক বছর বাদে নিয়ে যেতে। কিন্তু এক বছর আর অপেক্ষা করতে হল না। মায়ের ডাক এলো ওপার থেকে। মা মারা গেলেন। সংবাদ পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলেন দিদি, আর আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন পাটলিপুত্র। মায়ের চেহারা আমার মনে না থাকবারই কথা, কেন না আমি তখন নেহাতই শিশু। তবে

পরে সকলের কাছে শুনতাম যে মা-ও দিদির মুখের আদল ও দৈহিক গড়ন হুবহু একরকম ছিল। তাই যখনই আমি দিদির দিকে তাকাতাম, তখনই মায়ের কথা মনে পড়ত। দিদির স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। সমুদ্রগুপ্তের মহাদেবী (পাটরাণী)-র সম্মান পেয়েও এতটুকু আত্মাভিমান তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। দাসী বা পরিচারিকাদের উপরেও কখন রক্তচক্ষু দেখাতে বা কড়া ব্যবহার করতে দেখিনি।

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর দু-বৎসর আগে খৃঃ ৩৭২ সালে দিদি যখন দেহত্যাগ করলেন তখন সমস্ত পরিজনবর্গ, নগরের সকল নরনারী যেন একমাত্র আপনজনের বিয়োগ ব্যথায় দিনের পর দিন চোখের জল ফেলেছে। আমি তখন সিংহলে ছিলাম সংবাদটা পেতে দেরী হয়েছিল কিন্তু মাসাধিক কাল আমি শিশুর মতই অশ্রুপাত করেছিলাম দিদির মৃত্যু সংবাদে। তারপর আমি অনুরাধপুর মহাবিহার থেকে কোনও প্রকারে ছলছুঁতো করে চৈত্যগিরি (মিহিন্তলে) চলে আসি এবং সেখানেও মাসাধিক কাল আমার চোখের জল শুকোয়নি !

॥ দুই ॥

শৈশব কাল

আমার জ্ঞান হওয়া থেকে চন্দ্রকে আমার অভিন্ন অঙ্গ বলেই জানতাম। আমরা দুজনে যেন যমজ ভাই। চন্দ্র শৈশব থেকেই ভীষণ দুর্দান্ত প্রকৃতির ছিল। বাল্যসাথীরা পিছনে তাকে বলত চণ্ড। কিন্তু চন্দ্র আমার সঙ্গে কখনও চণ্ড ব্যবহার করেনি। অন্তঃপুরের পরিচারিকা এবং অন্যান্য রাণীদের সদাসর্বদা কঠোর শাসন করতো চন্দ্র। অতটুকু বেলাতেও চন্দ্রের আজ্ঞা অমান্য করবার সাহস ছিল না কারও। দিদির অত্যধিক আদরই চন্দ্রকে দুর্দান্ত হতে সাহায্য করেছে সবচেয়ে বেশী। ওর কথার বা খেয়ালের এতটুকু হেরফের হলে চারিদেকে হৈ চৈ পড়ে যেত। ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দিয়ে অবশেষে প্রমোদবনের ক্রীড়াপর্বতে গিয়ে জড় মূর্তির মত বসে থাকত। দিদি তখন আমাকে তার বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে চুমু খেয়ে আদর করে বলতেন,—বৎস, তুমি চন্দ্রকে ভুলিয়ে নিয়ে এসো, ও রাগ করেছে। তুমি ছাড়া আর কেউ ওর রাগ ভাঙ্গাতে পারবে না।

আর সত্যিই তাই হত। ভাই ভাই বলে আমি ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তখনি উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে হেসে ফেলত। আমার কথার অবাধ্য হয়েছে এমন একটি ঘটনাও আমার মনে নেই।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রর পরিবর্তন হল অনেক কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তন বিশেষ হয়নি। তবে নিজের উপর আধিপত্য বিস্তারের ক্ষমতা বেড়েছিল অর্থাৎ নিজেকে আয়ত্ব করতে সে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়েছিল।

আমার উপর সমুদ্রগুপ্তেরও স্নেহ ভালবাসা ছিল প্রচুর। কিন্তু তার রাজকার্যের নানাপ্রকার ঝঞ্ঝাট ঝামেলার পর হাজার রাণীর

কাছে হাজিরা শেষ করে আমাকে স্নেহ করবার তেমন সময় পেতেন না। যতটুকু সময় পেতেন সেটুকু ব্যয় করতেন রামগুপ্তের জন্য। কারণ রামগুপ্ত জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্থাৎ যুবরাজ ভট্টারক। রামের স্বভাব ছিল অত্যন্ত মধুর। চন্দ্রের ঠিক বিপরীত।

শিশুকালে সকল ছোট ছেলেদের মত আমাদের নানাপ্রকার গল্প শোনার সুবিধে ছিল। পরম ভট্টারক-এর ধনুগ্রাহিণী যবনী আর্থের বৃদ্ধা মা কুলুপা খুব সুন্দর সুন্দর গল্প বলতে পারতো। সত্তর বৎসরের বৃদ্ধা কুলুপার কর্পূর শ্বেত মুখ তেমনি সাদা চুলে ঢাকা থাকত। এত বয়সেও তাঁর শরীরের চামড়া কোথাও ঢিলে হয়নি। কুলুপা আমাদের সবচেয়ে প্রিয় পরিচারিকা ছিল। দিদি স্বয়ং তাকে খুব সম্মান করতেন। আমাদের দেশে পঁচিশ বৎসর বাস করেও মাগধী ভাষা শুদ্ধ করে বলতে পারতো না কুলুপা। হলকে থল বলতো আর সুহ (শুভ)-কে বলতো সুত্য। হ-এর উচ্চারণ একেবারেই করতে পারতো না কুলুপা। আমরা কুলুপার কাছ থেকে লম্বা লম্বা অনেক গল্প কাহিনী শুনতাম। সে সময়ে হ-এর উচ্চারণ নিয়ে সর্বদা আমাদের সজাগ থাকতে হত।

কুলুপার মুখে দেবতা ও রাক্ষসদের গল্প শুনতে খুব ভালো লাগতো আমাদের, তার বাচনভঙ্গি ছিল চমৎকার। কিন্তু রাত্রে আমাদের ভয়ে চোখ খুলতো না। রামের অবস্থা আরও কাহিল হত। রাত দূরে থাক, দিনের বেলায়ও গরমের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ঠাণ্ডা চৌবাচ্চায় যাওয়ার সাহস ছিল না। আমার যদিও একটু আধটু ভয় করতো, কিন্তু চন্দ্র'র কাছে এসব নেহাৎই মনোরঞ্জনের বিষয় ছিল। ভূত প্রেত, পিশাচ-পিশাচিনী, বেতাল প্রভৃতিকে একরত্তি ভয় করতো না চন্দ্র। এ ছাড়া রামকে ঠকাবার জন্যে বা ভয় দেখাবার জন্যে বিশেষ করে চন্দ্র সুযোগ খুঁজে বেড়াত।

একদিনকার কথা। অন্তঃপুরের উপবনে বসন্তোৎসবের সময় কামদেবের পূজার জন্যে সকল রাণীগণ উপস্থিত হয়েছেন। আমরাও দুজনে গেছি সেখানে চর্চরী শুনতে এবং সুরা'র গণ্ডুষ ফেলবার জন্য।

তাছাড়া নূপুরবদ্ধ চরণ চালনার তালে তালে কি করে অশোক ফুল ফোটে তাই দেখবার জন্য। চন্দ্র কিন্তু আমাকে আগে থেকে বলে দিয়েছিল যে এসব মিথ্যা ভূয়া। তবুও আমাদের কাছে বেশ তামাসার বিষয় ছিল সে উৎসবের উপকরণ।

অন্ধকার হয়েছে অনেকক্ষণ। কামপূজাও শেষ হয়েছে। আমাদের সুরার গণ্ডুষও আর চরণ-তাড়নাও শেষ হয়েছে, কিন্তু কোথায় অশোকের ফুলোদ্গম? সর্বক্ষণ আমি অশোক গাছের কুঞ্চিত পাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসে আছি ফুল ফোটা দেখবার জন্য। কিন্তু সব বৃথা। চন্দ্র কিন্তু অন্য মতলব আঁটছিল মনে মনে।

কঞ্চুকী বামন ও আর একজন পরিচারিকা যুবরাজ ভট্টারক রাম-গুপ্তকে নিয়ে চলেছে মহলে পৌঁছে দেবার জন্য। চন্দ্র আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে এল তমাল কুঞ্জে, যে পথ দিয়ে রামগুপ্ত মহলে যাবে। চন্দ্র'র কথামত আমরা দুজন একটা তমাল গাছের ডালের উপর উঠে বসলাম। ডালটা রাস্তার দিকে নত হয়ে ছিল। অন্ধকার খুব বেশী নয়, তবুও তমাল গাছ দিনের বেলায় অন্ধকার সৃষ্টি করতে প্রসিদ্ধ, তাই সেই জায়গাটা একটু বেশী অন্ধকারই ছিল। রামগুপ্ত যেই সেই ডালটির নিচেয় এসেছে অমনি পূর্বের সঙ্কেত অনুযায়ী সেই ডালটি ধরে খুব জোরে ঝাঁকাতে আরম্ভ করলাম, আর চন্দ্র অন্য ডালে বসে একটা তামার হাঁড়ির ভিতর পাথরের টুকরা নেড়ে আওয়াজ করতে লাগল এবং মুখ দিয়ে বাঘ ভালুক প্রভৃতি জন্তুর ডাক ডাকতে লাগল। ব্যস, তারপর যে দৃশ্যের অবতারনা হল তা দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না, তবে আমার একটু একটু ভয়ও করছিল পরিণতি দেখে। কঞ্চুকী প্রথমেই দৌড়ে পালিয়ে গেল। একজন খানিকদূর যেতে না যেতেই পড়ে গেল। বামন ভয়ে দু-হাত তুলে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতে লাগল প্রাণভয়ে। নিপুনিকা দাসী মুহূর্ত মধ্যেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। রাম ঐ সব দেখেই পিছন দিকে দিল লম্বা দৌড়। কিন্তু চন্দ্র ছাড়বার পাত্র নয়। ডাল থেকে এক লাফ মেরে নিচেয় নেমে রামকে তাড়া করল আর

হাঁড়ি মুখে দিয়ে নাকি সুরে কি সব বলতে লাগল। রামগুপ্তকে বেশী দূর যেতে হল না। ত্রিশ-চল্লিশ পা গিয়েই পড়ে গেল রাম। পড়ে গিয়েই নিশ্চল হয়ে গেল। তাই দেখে চন্দ্র ছুটে এল আমার কাছে। চন্দ্রও খুব ঘাবড়ে গেছে দেখলাম। এবার কিন্তু আমার আর পরিহাস ভালো লাগছিল না। এখন চিন্তা হল কোনও ক্রমে প্রাণ বাঁচাতে হবে। আঁকা-বাঁকা পথ ধরে মহলে এসে পৌঁছে খুব গম্ভীর হয়ে দিদির কাছে বসলাম, যেন কিছুই জানিনা এমন ভাব।

হাতীর দাঁতের সুন্দর পীঠাসনে দিদি বসেছিলেন, হাত নেড়ে নানা মুদ্রায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। লম্বা কেশের বিনুনীর মধ্যে যূঁই মল্লিকা ফুল সুন্দর ভাবে গাঁথা রয়েছে। দেহের সকল আভরণ ছিল নানাপ্রকার ফুলের তৈরী। অঙ্গদ, কঙ্কণ, হার, কর্ণফুল সব ফুলের আভরণ। তার মাঝে মাঝে সোনার তারা ও হাঁস চিকমিক করছে সর্বাঙ্গে। পরণে বত্তক (একপ্রকার শ্বেত পাখী মৎসভোজী) অঙ্কিত খুব মিহি শ্বেত শাড়ী। আশেপাশে বহু নারী উপবিষ্ট, কেউ বা দাঁড়িয়ে। কারও হাতে চামর, কারও হাতে ভৃঙ্গার (সোনার তৈরী জলপান করবার পাত্র) কারও হাতে ছত্র আর কারও হাতে সুগন্ধি আতর বা অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী।

আজ পরম ভট্টারক মহারাজ এই শ্রীগর্ভে রাত্রিবাস করতে আসছেন, তাই মহারাণী দত্তাদেবী আনন্দে উৎফুল্ল। প্রসন্ন বদনে অপেক্ষা করছেন মহারাজের।

আমি দিদির পাশে গিয়ে লক্ষ্মী ছেলেটির মত দাঁড়ালাম। আমার বয়স তখন সাত বৎসর। বসে থাকা অবস্থায় দিদির কাঁধ অবধি আমার হাত পৌঁছুত। আমি দাঁড়িয়ে দিদির কাঁধের উপর থেকে সরে আসা শাড়ীর আঁচলের উপর অঙ্কিত সুন্দর হংস-মিথুন দেখতে লাগলাম। আর চন্দ্র দিদির পায়ের কাছে বসে মাথা নিচু করে দিদির পায়ের নূপুরগুলির মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করে খেলবার ভান করতে লাগল। দিদি মোদক (লাড্ডু) আনতে হুকুম করতে

শান্তশিষ্ট হয়ে স্নেহভরে মহারাণীর বুকের মধ্যে মাথা দিয়ে বল্লাম "খিদে নেই, কিছু খাব না এখন।"

কিছুক্ষণের মধ্যে দূর থেকে আওয়াজ শুনতে পেলাম মহারাজ আসছেন তার সঙ্কেত "জেদু জেদু ভট্টা।"

ঘরের সকলে উঠে দাঁড়ায়, মহারাজকে স্বাগত জানাবার জন্য। মহারাজ শ্রীগর্ভে প্রবেশ করতেই সকলে জয়কার করে সরে দাঁড়ায়। মহারাজ কাছে এসে দিদির হাত ধরে পীঠাসনে বসলেন ও দিদিকে বসালেন।

মহারাজের অন্তঃপুরে সহস্রাধিক রমণী ছিল। রূপ সৌন্দর্যের ভাণ্ডার যেন। স্বর্ণকেশী গৌরবর্ণা যবনী, নীলকেশী অরুণ মিশ্রিত ধবলবর্ণা পারসীক সুন্দরী, গান্ধারী, সৌরাষ্ট্রিয় ও পার্বত্য কুমারী। একজনের উপর থেকে অন্যজনার দিকে তাকালে তাকেই মনে হত অধিক সুন্দরী, আবার অন্যজনার দিকে দেখলে মনে হত সেই বেশী সৌন্দর্যশালিনী। তবুও সমুদ্রগুপ্ত সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন এবং সম্মান করতেন পাটরাণী দত্তাদেবীকে।

আজকার বসন্তোৎসবকে অন্যবারের চেয়ে বেশী আড়ম্বরপূর্ণ করে পালন করবেন বলে স্থির করেছেন মহারাজ আর পাটরাণী। পরম ভট্টারক সমুদ্রগুপ্ত প্রবীণ বীণাবাদক। বীণাবাদনে তাঁর নিপুণ হাতের সুনাম আছে। আর পাটরাণী দত্তাদেবী তাঁর কোকিল কণ্ঠের জন্যে প্রসিদ্ধ। পানগোষ্ঠী, সঙ্গীত, নৃত্য মহোৎসবের সকল রকম আয়োজনই হয়েছে। পরিচারিকার হাত থেকে সুদৃশ্য বীণা তুলে নিলেন সমুদ্রগুপ্ত। কোলের উপর রেখে তারগুলির উপর মৃদু আঙ্গুল চালনা করে "কিন কিন" আওয়াজ করতে লাগলেন। পিছনে পাতলা পর্দার আড়াল থেকে নৃত্যকুশলী মধুকরীরা জনান্তিকে নৃত্য-মুদ্রার অভিনয় করছে। তাদের মৃদু নূপুরধ্বনি শোনা যায় ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম।

এমন সময়ে ঝড়ের মত নিপুনিকা দৌড়ে এসে মহারাণীর পায়ের উপর ধপাস করে পড়ে কাঁদতে লাগল। সকলে চমকে উঠল।

নিপুনিকা কাঁদতে কাঁদতে অস্পষ্টভাবে যা বললো তা হলো,—ভট্টিনী পরিত্তায়ধ, পরিত্তায়ধ। যুবরাজ ভট্টারককে ব্রহ্মপিশাচ ধরে নিয়ে গেছে, জাম্বুক বামন তমালকুঞ্জে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে আর কঞ্চুকী পাগলের মত প্রলাপ বকছে। আমিও বেহুঁশ ছিলাম, জ্ঞান হতেই ছুটে এসেছি······। নিপুনিকার বক্তব্য শেষ না হতেই পরম ভট্টারক আর মহারাণী উঠে দাঁড়ালেন। নিপুনিকার হাব-ভাব দেখে চন্দ্র'র পক্ষে হাসি চেপে রাখা কঠিন হয়ে পড়ল, তাই সে উঠে গিয়ে দিদির পিছনে মুখ লুকাল।

প্রতিহারী আগে আগে "ইতো ইতো ভট্টা" ধ্বনি তুলে এগিয়ে চললো আর পিছনে পিছনে সম্রাট, মহারাণী, মহলের সকলে। কুব্জ, মূক, বধির সকলে ছুটে চলেছে। বোবা ও কালা ত কিছুই বুঝতে পারছে না যে হঠাৎ কি এমন হল যার জন্য সমস্ত পরিজনবর্গ ছুটে চলেছে। তাদের হাত-পা নেড়ে আকারে বিকারে বোঝাতে চেষ্টা করছে কুব্জ কুরভক। কিন্তু চন্দ্র'র বোধ হয় এখনও মন তৃপ্ত হয়নি, তাই সে এগিয়ে এসে কালা ও বোবাকে আকারে ইঙ্গিতে বোঝাতে লাগল যে, ব্রহ্মপিশাচ তোমাদের দুজনের বলি চায়। শুনেই তো ওদের দুজনের অবস্থা যা হল তা বর্ণনাতীত। ওরা সেইখান থেকেই পালাতে চাইছিল কিন্তু ওদের মিত্র কুব্জ কুরভক আর বামন রেবতক ওদের ছাড়ল না।

যুবরাজ ভট্টারক রামগুপ্তের দুর্ঘটনার সংবাদ মুহূর্তে সমস্ত রানিবাসে ছড়িয়ে পড়ল এবং যে যেদিক দিয়ে পারল দীপযষ্টি (মশাল) নিয়ে তমালকুঞ্জে ছুটল। দেখতে দেখতে সমস্ত রাজান্তঃপুর উজাড় করে ছুটে এল সকলে।

রামগুপ্ত এখনও তেমনি নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে পথের উপর। লোকজনের সোরগোলে একটু একটু জ্ঞান ফিরে পেল যেন। কিন্তু ভয়ে চোখ খুলতে পারছিল না। দিদি সবচেয়ে বেশী ঘাবড়ে গেছিলেন রামগুপ্তের জন্য, তিনি রামকে দেখতে পেয়েই ছুটে গেলেন তার কাছে। মনে মনে আমিও খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম। দিদির কণ্ঠের

"বৎস, বৎস" ডাক শুনে রাম চোখ খুলল। এখনও পুরোপুরি ভয় কাটেনি রামের। শীতের রাত তবুও সমস্ত শরীর ঘামে ভিজে চপ চপ করছে। দিদি এবং মহারাজ রামকে নিয়ে নিজের শ্রীগর্ভে ফিরে এলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাম প্রকৃতিস্থ হল। ভুলে গেল প্রায় সে ঘটনা। কিন্তু নিপুনিকা, কঞ্চুকী আর বামন তাদের চোখে দেখা তমালকুঞ্জের মহাপিশাচের কাহিনী শতগুণে অতিরঞ্জিত করে মাসাধিককাল এখানে সেখানে বলে বেড়াতে লাগল। তাদের যেন ঐ কাজ। সমস্ত পাটলীপুত্রে ব্রহ্মপিশাচের নামে নানাপ্রকার কাহিনী ছড়িয়ে পড়ল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ খুব ঘটা করে হোম-যজ্ঞ জপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান করলেন আর সমুদ্রগুপ্ত ও মহারাণী লক্ষ দীনার (মোহর) দান করে পুণ্যার্জন আর পাপখণ্ডন করলেন। চন্দ্রের হাসি তখন দেখে কে ? বিজয়ের গর্বে বুক ফুলে উঠল তার।

বাল্যকালে চন্দ্রগুপ্তের দুরন্তপনার কত যে কাহিনী, তা বলে শেষ করা যায় না। প্রতি মুহূর্তে তার মস্তিষ্ক নতুন নতুন উপায় খুঁজতে ব্যস্ত থাকতো।

উদ্যানে অনেক জন্তু-জানোয়ার পোষা থাকত। তার মধ্যে একটা লালমুখো বানর ছিল। হঠাৎ একদিন চন্দ্র'র নজর পড়ল সেই বানরের দিকে। অমনি দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল তার মাথার মধ্যে। তার পর থেকে চন্দ্র আমাকে নিয়ে রোজ সেখানে যেতে লাগল। কোনওদিন কলা কোনওদিন অন্যান্য ফল প্রভৃতি দিয়ে সেই লালমুখো বানরটাকে বশ করতে লাগলো। আমাদের সাথে কখনও বা কুলুপা কখনও অন্যান্য পরিচারিকা থাকত। দু-চার দিনের মধ্যেই চন্দ্র লালমুখোকে বশ মানিয়ে ফেলল। তার কাছে গিয়ে বসে তার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল। তাই দেখে কুলুপা ভীষণ ঘাবড়ে গেল। কিন্তু চন্দ্র কুলুপাকে সাত-পাঁচ বুঝিয়ে আর ভয় দেখিয়ে নিরস্ত করল। এমনি সপ্তাহ দুই যেতে না যেতেই বানরটার সঙ্গে চন্দ্রর এমন বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে, বানরটা চন্দ্র'র হাত

ধরে দুই পায়ে হেঁটে বেড়াতে যেত এখানে সেখানে। চন্দ্র'র আদেশে বানরটার গলার বাঁধন খুলে দেওয়া হল। এবার স্বাধীন ভাবেই আমরা তিনজন বেড়াতে লাগলাম। এখন আমাদের তৃতীয় সাথী হল সেই লালমুখো বানর। তারও যত্র-তত্র যাতায়াত চলত আমাদের সঙ্গে, আর চন্দ্রর ত পোয়া বারো। তার জ্বালায় কুব্জ, বামন, কঞ্চুকী আর দাসীদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠল কয়েকদিনেই। চন্দ্র'র ইশারা করতে যতটুকু দেরী, অমনি রক্তমুখী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টেনে হেঁচড়ে তছনছ করে ছাড়ত নিমেষে। তখন চন্দ্র'র হাঁসি আর ধরে না।

মহারাণীর কাছে গাড়ী গাড়ী নালিশ পৌঁছুতে লাগল চন্দ্র এবং রক্তমুখীর নামে, কিন্তু চন্দ্র নেহাত ভালোমানুষটির মত বলত,—না মা, রক্তমুখী খুব ভালোমানুষ। ওকে মুখ ভেংচালে, ঢিল ছুড়লে, বিরক্ত করলে ত রেগে যাবেই। বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখ, আমি তাকে এখুনি তোমার কাছে নিয়ে আসছি, দেখলেই বুঝতে পারবে সে কত শান্ত। এই কথা বলেই চন্দ্র রক্তমুখীকে আনতে গেল। আর উপস্থিত যারা সেখানে ছিল তারা তো দিদির পায়ে পড়ে চীৎকার করতে লাগল,

—ভট্টিনী বারণ করুন, নইলে আবার এখানেও আমাদের রেহাই দেবে না। তাদের কথা শেষ হতে না হতেই চন্দ্র রক্তমুখীকে নিয়ে হাজির। আসবার সময় রক্তমুখীকে খুব করে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে।

—দেখ বেটা, মায়ের সামনে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। সেখানে আমার মত তুমিও ভালোমানুষটি হবে। লেজ নিচু করে মাথা নিচু করে থাকবে। আর আমি যখন মাথা উপরে তুলে ধরব তখন চোখে করুণার দৃষ্টি দিয়ে মায়ের দিকে তাকাবে। আর একটু যদি ভুল হয়েছে তাহলে আমার হাতের এই ডাণ্ডা আর তোমার মাথা, মনে থাকে যেন।

রক্তমুখী যেন চন্দ্রর কথা সবই বুঝতে পেরেছে। তাকে আসতে

দেখে সকলে এমনভাবে চাপাচাপি করে তার রাস্তা পরিষ্কার করে দিতে লাগল যেন পরম ভট্টারক আসছেন। শুধু মাত্র "জেদু জেদু" বলতেই যা বাকী। রামন কঞ্চুকীদের আঁচলের পিছনে লুকোতে চেষ্টা করে ত দাসীরা একে অন্যের পিছনে, বিশেষ করে এদের মধ্যে যারা দু-একবার রক্তমুখীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছে তাদের ত অবস্থা দেখবার মত। চন্দ্র কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে একেবারে অজ্জুকার সামনে এসে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল। রক্তমুখীকে দেখে অজ্জুকার মনটাও কেমন কেমন করেছিল, কিন্তু তিনি তাঁর দেবকে (দিদি চন্দ্রকে আদর করে "দেব" বলে ডাকতেন, আবার যখন আমি সঙ্গে থাকতাম, আমাদের দুজনকে তখন একসঙ্গে "জয়-দেব" বলে সম্বোধন করতেন) বিশ্বাস করতেন। চন্দ্রের উপর তাঁর পুরোপুরি আস্থা ছিল। চন্দ্রর পিছনে রক্তমুখীও মাথা নিচু করে চুপ করে বসল মহারাণীর পায়ের কাছে।

—দেখ অজ্জুকা রক্তমুখী কেমন ভদ্রমুখ। শুধু শুধু একে রাগালে এ ত রাগবেই। চন্দ্র রক্তমুখীর থুতনীতে হাত দিয়ে মুখ উপরের দিকে দিতেই অজ্জুকা তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ভালো করে। মনে মনে মহারাণীর বিশ্বাস হল। চন্দ্র তখন রক্তমুখীকে ইশারা করে মহারাণীর পা দেখিয়ে দিতে রক্তমুখী মহারাণীর পায়ের উপর হাত রাখল। তখন অজ্জুকা অস্ফুটস্বরে বলে ফেললেন—এ নিশ্চয় ভদ্রমুখ।

কঞ্চুকী আর অন্যান্য দাসীরা যারা রক্তমুখীর অত্যাচার সহ্য করেছে দু-একবার, তারা সমস্বরে প্রতিবাদ করল,

—না ভট্টিনী, বানরটি ভয়ানক দুষ্ট।

কেউ বললো,—এই দেখুন আমার কঞ্চুক ছিঁড়ে দিয়েছিল। কেউ দেখাল সেলাই করা উত্তরীয়। কিন্তু চন্দ্রের কথায় আর রক্তমুখীর ব্যবহারে অজ্জুকার বিশ্বাস হয়েছে যে রক্তমুখী ভদ্রমুখ। অতএব কারো কোনও নালিশ টিকল না সেখানে।

একটা গল্প যেমন বার বার শুনতে ভাল লাগে না তেমনি একই

ধরণের দুষ্টুমি খেলাও চন্দ্রর বার বার ভালো লাগত না। রক্তমুখীর খেলা দু-তিন মাসের মধ্যেই প্রায় শেষ হয়ে গেল। তখন আবার নতুন ধাঁন্ধা। দুঃসাহসের খেলা খেলতে চন্দ্র'র খুব আনন্দ হত। গাছে ওঠা, জলে সাঁতরান, উপর থেকে জলে লাফ দেওয়া, বিনা লাগামে খালি পিঠে ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি। কিন্তু এই রকম খেলায় পাটলিপুত্র অথবা দ্বিতীয় রাজধানী সাকেত (অযোধ্যা) নগরীতে তেমন স্বাধীনতা বা সুবিধা ছিল না। আমাদের বয়স পাঁচ বৎসর অতিক্রম করবার পর প্রতি এক দু বৎসর বাদেই আমরা অগ্রোদকাতে আসতাম বেড়াতে। পিতা মহাসেনাপতি আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন খেলতে, বেড়াতে, যেমন খুশী আনন্দ উপভোগ করতে। তিনি শুধু চাইতেন না যে আমরা অন্য কোনও বালককে দুঃখ দিই। কথায় বলে স্বভাব যায় না ম'লে। প্রথম প্রথম চন্দ্র খেলার সাথীদের কাছে নিজের রাজকুমারগিরি জাহির করতে গেল। কিন্তু এখানে যৌধেয় কুমারগণের সঙ্গে পাল্লা দিতে হবে। তারা প্রথমেই চন্দ্র'র পা ধরে লাগিয়ে দিল এক আছাড়। চন্দ্রও বুঝল যে অগ্রোদকার যৌধেয় বালকগণ একটু অন্য ধরণের। এমনি দু-একটি ঘটনা যা ঘটেছিল, চন্দ্র সে-সব গায়ে মাখে নি। আশ্চর্য হয়েছিলাম ও যেন কিছুই মনে করেনি। এরপর চন্দ্র মানিয়ে নিল নিজেকে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যৌধেয় বালকদের পরম প্রিয়পাত্র হয়ে উঠল। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল যে, মাত্র সাত-আট বৎসর বয়সেই পাটলীপুত্রের সেই দুর্দান্ত চণ্ড চন্দ্রগুপ্ত অগ্রোদকাতে এলেই একেবারে সম্পূর্ণ বদলে যেত। আবার পাটলিপুত্রে ফিরে গেলেই যা তাই।

যৌধেয়গণের শিশুশিক্ষার প্রণালী ছিল অন্য ধরণের। সন্তানকে তারা ভীষণ ভালোবাসতো কিন্তু তাদের ফুলের মত তৈরী করতো না কখনও। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌধেয় শিশুর মুখে খড়গ ধুয়ে জল দেওয়া হত। বাল্যকাল থেকেই তারা খড়েগর সঙ্গে খেলা করত। জীবন-মরণ খেলায় বিপদের মুখে অবহেলায় হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়ত যে কোনও যৌধেয়। বয়সের কোনও বিচার ছিল না তাদের।

তারা জীবনকে ভালোবাসতো, ভোগ করতো, বেঁচে থাকতে চাইত কিন্তু মৃত্যুকে অবহেলা করে। মৃত্যুর কথা কেউ ভাবতো না। তারই নাম বাঁচার মত বাঁচা।

দশ বৎসর বয়স হতেই আমরা অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে শূকর শিকার করতে যেতাম। ঘোড়ার পিঠে বর্শা হাতে করে ঘুরে বেড়াতাম, শূকরকে তাড়া করে গভীর জঙ্গলে ঢুকে পড়তাম। আবার কখনও বা শূকরের আড্ডার কাছে বসে অপেক্ষা করতে করতে রাত্রি শেষ হয়ে যেত। সে সময় আমরা তীর চালাতে পারতাম। এবং তীর চালনায় আমরা দুজন বেশ প্রশংসাও পেয়েছি, কিন্তু তীর দিয়ে শূকর মারা সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই বর্শা। এবং সে বর্শাও ঠিক একটি মাত্র স্থানেই মারতে হবে, নতুবা বিপদের আশঙ্কাই বেশী। চৌদ্দ বৎসর বয়সে চন্দ্র প্রথম শূকর শিকার করল, তার কয়েকমাস পর আমি।

যদিও অনেকদিন চেষ্টার পর আমরা কৃতকার্য হয়েছিলাম, তাই বলে শিকারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হইনি কখনও। দিনে বা রাত্রে যে কোনও শিকারী শূকর, শল্লকী (সাহী) মৃগ বা রোজ (নীলগাই) যা কিছু শিকার করুক না কেন শিকারের কাছে গিয়েই শিকারী চীৎকার করে সকলকে ডাকতো—কে কোথায় আছো ছুটে এসো। এই জঙ্গলে শিকার পড়েছে, তোমাদের ভাগ নিয়ে যাও। প্রথম প্রথম আমাদের দুজনের কেউই বুঝতাম না যে, শিকারী নিজে শিকার করে ভাগ দেবার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে ওঠে কেন। কিন্তু পরে পিতা বুঝিয়ে দিলেন যে, এ পৃথিবীতে যে কেউ যা কিছু সৃষ্টি করুক না কেন বা অর্জন করুক না কেন তা সেই একজনের দ্বারায় কখনই সম্ভব না। শত শত লোক চেষ্টা করে কিন্তু সফল হয় একজন। তাই সেই সাফল্য অর্জনকারী একজনের পিছনে আছে বাকী নিরানব্বুই জন অসমর্থ চেষ্টাকারীর পরিশ্রম। সেইজন্য যে সফল হয় তার পক্ষে উচিত নয় সেই কৃতকার্যতার ফল একা ভোগ করা।

তাছাড়া সোজা বুদ্ধিতে বিচার করলেও দেখা যায় যে একজন সফল হয়ে ফিরে আসছে আনন্দচিত্তে আর বাকী সকলে ফিরে আসবে শুষ্কমুখে শূন্যহাতে তার চেয়ে একজনের সাফল্য সকলে ভাগ করে সবাই হাসিমুখে ফিরে আসুক। ঐ জঙ্গলে শিকারে গিয়ে নানাপ্রকার জ্ঞান অর্জন করেছি আমি। নতুন নতুন ভাবধারার সঞ্চার হয়েছে আমার মনে।

এই শিকারের সময় যদি অন্য শিকারীও জঙ্গলে থাকতো তাহলে সেও শিকারের ভাগ পেত। আমাদের ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। ঘরের কথা পরে চিন্তা করা যাবে, শিকার পড়তেই আগে নিজেদের পেটপূজা করবার জন্য ছুটতাম কাঠের জোগাড় করতে। রাম দু-একবার মাতুলালয়ে এসেছে কিন্তু রাত্রে শিকারে বেরুবার সাহস ছিল না তার। আমরা সেই অন্ধকার রাত্রেও ছুটোছুটি করে কাঠ জোগাড় করে আনতাম। চন্দ্রের আর আর সব মাতুল গোষ্ঠিরা শিকারকে প্রস্তুত করত, আর আমরা দুজনে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালাতাম। কাঠের আগুনে ঝলসানো বরাহমাংস খেতে আমরা দুজনে খুব ভালবাসতাম। দাঁতওলা শূকরের মাংস কেটে কেটে কাঠের আগুনের উপর টাঙ্গিয়ে দিলে সেই মাংসের চর্বি গলে বিরাট অগ্নিকাণ্ডের সৃষ্টি হত আর ভাজাও হত খুব ভালো। তাছাড়া খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়ে যেত।

পাটলিপুত্রের রাজকীয় রান্না মাংসের কাছে এ মাংস খুবই সাধারণ। পাটলিপুত্রের রন্ধনশালায় সেই মাংসের মধ্যে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে এবং অন্যান্য স্থান থেকে আনা এলা (এলাচ) লবলী (লবঙ্গ) প্রভৃতি নানাপ্রকার সামগ্রী দিয়ে রান্না হত। তাই তার স্বাদের সঙ্গে তুলনা হত না। শিশুকাল থেকে এমনি ধরনের মাংস খেতে আমিও অভ্যস্ত ছিলাম। যৌধেয়গণের রন্ধনশালায় মাংস রান্না করতে অত উপকরণ ব্যবহার করবার কোনও রেওয়াজই ছিল না। তবুও যৌধেয়গণের সেই মাংস বা শিকারলব্ধ আগুনে ঝলসানো মাংস খেতেই যেন আমার ভাল লাগত। এর কারণ খুব সম্ভব আমার

দেহের যৌধেয় রক্তের পক্ষপাতিত্ব। সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে আমি বেশ বুঝতে পারতাম যে, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে এবং প্রচুর ঘি দিয়ে গুরুপাক মাংস দুষ্পাচ্য ছিল। তার তুলনায় সাদামাঠা, সিদ্ধ করা বা আগুনে পোড়ানো মাংস সাধারণ খাদ্যের চেয়ে অনেক সহজপাচ্য ছিল। গোটা একটা শূকর আগুনে পোড়াতে দেরীও লাগত অনেক। আগুনে চাপাবার আগে শূকরটার পেট চিরে নাড়ীভুড়ি বার করে ফেলা হত। সেই সময় তার মেটলিটা আমাদের দিয়ে দিত। এসব কাজ অবশ্য আমার অন্যান্য ভাই বা চন্দ্রের অন্য মাতুলগণ করত। শিকার করতে কষ্ট ছিল প্রচুর। যেমন দৌড়ানো, রাত্রির পর রাত্রি জাগরণ করা, রৌদ্রে পোড়া প্রভৃতি। কিন্তু মিলিত উৎসাহের কাছে সে কষ্ট কখনও কষ্ট বলে মনে হত না।

সেই শিশুকালেও যদি চন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করা হত যে "তার কাছে পাটলিপুত্র বেশী ভালো লাগে না অগ্রোদকা" তাহলে এককথায় উত্তর দিতে মুস্কিলে পড়ত চন্দ্রগুপ্ত। পরে যখন আমাদের শিক্ষা আরম্ভ হল তখন থেকে ক্রমশঃ অগ্রোদকাতে যাতায়াত কমে যেতে লাগলো। যদিও কখন এক-দুমাসের অবসর হত তখন সে সময় যেন চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে শেষ হয়ে যেত। তার জন্যে আমাদের দুজনার আফশোষের সীমা ছিল না। নাচগানে চন্দ্র খুব কুশলী ছিল আমিও কম ছিলাম না। কিন্তু মাত্র একটি ক্ষেত্রে আমি চন্দ্রগুপ্তের কাছে নিশ্চয় ছোট ছিলাম। তা হল ছদ্মবেশ ধারণ। বেশ বদল করবার নানাপ্রকার জিনিসপত্র গোপনে জোগাড় করে রাখতো ও নিজের কাছে। সাদা, কালো, হলুদ, ছোট-বড় দাড়ী-গোঁফ, শরীরের রং, স্ত্রী-পুরুষের নানাপ্রকার অলঙ্কার, বস্ত্র প্রভৃতি। চন্দ্রর এমনি উগ্র সাহসিকতার আমি যদিও আন্তরিক সমর্থন করতাম না সর্বদা, তবুও বাধা দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না বরং প্রত্যক্ষভাবে আমি সহযোগী ছিলাম। কারণ আমাদের দুজনকার সম্বন্ধ এমনই ছিল যে, যেকোনও কাজেই একে অপরকে সাহায্য করতেই হবে।

কুব্জ কুরভকের বিবাহ করবার বড় সাধ ছিল। সে থাকতো রাজঅন্তঃপুরে যেখানে হাজার হাজার সুন্দরী নারী থাকতো। কিন্তু ঐ সর্বঅঙ্গ বাঁকা অষ্টবক্রের দিকে কেউ ফিরেও তাকাতো না। তার জন্যে কুব্জের দুঃখের অন্ত ছিল না। আমাদের বয়স তখন এগার কি বারো। আমরা বিবাহের প্রলোভনে তাকে এমন ঠকিয়েছিলাম যে পরে সে কুব্জ কোন দাসী চেটীকেও বিশ্বাস করত না। চন্দ্রর উপর কুব্জের অগাধ বিশ্বাস ছিল, আর আমার প্ররোচনা ও প্রলোভনে সে বিবাহ করবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠল। আমরা তাকে বললাম, এক ত্রিলোকশ্রেষ্ঠা সুন্দরী তোমাকে বিবাহ করতে চান। শুনে তার আশ্চর্য হবারই কথা। আমি বললাম, সুন্দরী আর কেউ নয় ইন্দ্রের অপ্সরা রম্ভা। কোন অন্যায় কাজ করবার জন্য ব্রহ্মার পুত্র অষ্টাবক্র মুনি শাপ দিয়েছিলেন যে "স্বর্গে তোর আর স্থান নেই" এই কথা শুনে রম্ভা অনেক কান্নাকাটি করতে লাগলো। মুনির হাতে পায়ে ধরতে মুনি সদয় হয়ে বল্লেন, যা, মানবী রূপ ধারণ করে যদি তুই আমার মত কোন কুব্জকে বিবাহ করিস তাহলে আবার তুই স্বর্গে ফিরে আসতে পারবি।

এ কথায় কুরভকের আর অবিশ্বাস করবার মত কিছুই রইল না। কন্যা দেখতে চাইলে আমরা দূর থেকে বিন্ধ্যাটবীর পরিব্রাজক সামন্তর কন্যাকে দেখিয়ে দিলাম। আমাদের দলে আরও দু-চারজন বন্ধু এবং দু-একজন দাসীকেও টেনে এনেছিলাম। কিন্তু বিবাহ এবং ভাঁবর (বিবাহের পর বর বধূর অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করা) এর কথায় দাসীরা রাজী হল না। অগত্যা চন্দ্র বলল, আমি বধূ সাজব। অজ্জুকার মত চন্দ্রও সুদর্শন ছিল। চন্দ্রর দেহসৌষ্ঠবে আশ্চর্য রকমের নারীর কোমলতা ছিল। মাথার চুল স্ত্রী-পুরুষের সমান লম্বা থাকত। আবশ্যক শুধু উষ্ণীষক বেণী রচনা করবার। চতুরিকাও বধূ সাজতে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল! কারণ সে নারী, বিবাহ-মন্ত্র-ভাঁবর প্রভৃতি একবার অনুষ্ঠিত হলে ধর্মাসন (আদালত) থেকে কুরভক যদি আইনতঃ দাবী করে তাহলে সে বাধ্য হবে কুরভকের ঘর করতে,

পতিত্ব স্বীকার করতে। আমরা ভাবলাম দূর, দেবতারা এসব পরিহাস খেয়াল করবে না। চতুরিকা নিজে বধূ না সাজলেও নিজের চতুর হাতে চন্দ্রগুপ্তকে নিখুঁত বধূবেশে সাজালো। চন্দ্রর কেশের বেণীবন্ধনীর মধ্যে মধ্যে ফুলগুচ্ছ দিয়ে চমৎকার বেণী রচনা করল। কানে কুণ্ডল, গলায় মুক্তার এবং মোহরের মালা। বাহুতে ঝুরি ঝোলানো মণিজড়িত অঙ্গদ। হাতে স্বর্ণ কঙ্কন, কটিদেশে রসনাদাম, পায়ে সুন্দর নূপুর। কেশের মধ্যে ইতস্ততঃ মণি-মুক্তা বসানো।

চতুরিকা সূক্ষ্ম অঞ্জনরেখা টেনে দিল চন্দ্রর নয়নে। পায়ে অলক্ত এঁকে দিল, অঙ্গে অঙ্গরাগ এবং মুখে শ্বেতচূর্ণের প্রলেপ দিল। কমলা লেবু দিয়ে কৃত্রিম স্তন তৈরী করবার সময় চতুরিকা হেসে লুটোপুটি। অতঃপর লাল রংয়ের চীনাংশুক পরিয়ে দু-চারজনকে ডেকে এনে দেখাল। সত্যিই এমন সুন্দর নিখুঁত করে সাজানো হয়েছিল যে পুরুষ চন্দ্রগুপ্তের কোন অস্তিত্ব ছিল না। এমন কি অজ্জুকা দেখলেও তাকে চিনতে পারতেন না। ভাবতেন এ মেয়ে নিশ্চয়ই উচ্চকল্প (বিন্ধ্যাটবী) মহারাজকুমারী।

আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল যে চতুরিকা এবং তার সখীরা চন্দ্রর কাছে আসতে ইতস্ততঃ করত, তারা পরমানন্দে চন্দ্রকে বার বার আলিঙ্গন করতে দ্বিধা করল না! চন্দ্র আমার দিকে তাকিয়ে মুচকী হাসছে।

অতঃপর আমি কুব্জকে কন্যা দেখাবার জন্য ডাকলাম। নির্দিষ্ট জায়গায় কুব্জ কন্যা দেখল। কন্যাও নিপুণভাবে লজ্জা ও সঙ্কোচের অভিনয় করল। আমি প্রশ্ন করলাম কুব্জকে, তার পছন্দ হয়েছে কী না এবং সে বিবাহে রাজী আছে কী না। তখন কুব্জর মুখচ্ছবি যা হয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কুব্জেরও সেই দশা, সে হ্যাঁ, না, ভাষায় প্রকাশ করতে না পেরে মাথা কাত করে স্বীকৃতি জানালো শুধু।

আগে থেকে অন্যান্য সব কিছু তৈরী ছিল। স্বীকৃতি পাওয়ার পর

মন্ত্রপাঠ শুরু হল। সপ্তপদী (সাতপাক) মঙ্গলাচরণ প্রভৃতি ক্রিয়া শেষ হল। স্ত্রীরা মঙ্গলগীত গাইল। সুষ্ঠু ভাবে বিবাহ সম্পন্ন হল। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

বধূ পিত্রালয়ে চলে গেল বিবাহের পর। তারপর কুঞ্জের ব্যাকুলতা ক্রমশঃ মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে লাগল। নববধূকে পাবার আশায় তার সময় আর কাটতে চায় না। কিন্তু প্রথম প্রথম আমরা তাকে "আজ তিথি খারাপ," "কাল দুষ্টগ্রহের সঞ্চার" প্রভৃতি নানাপ্রকার বাজে কথায় ভুলিয়ে রাখলাম প্রায় একমাস। কিন্তু চালাকীরও সীমা আছে, পাছে কুঞ্জ অবিশ্বাস করে তাই বাধ্য হয়ে একদিন চন্দ্র বিষণ্ণবদনে কুঞ্জকে ডেকে বলল, কুরভক! তোমার সুন্দরী স্ত্রী আজ গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। জয় দেখতে পেয়ে নিজে লাফিয়ে পড়ে অনেক চেষ্টা করল কিন্তু পারল না তাকে বাঁচাতে। আমি নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর রাখছিলাম। হঠাৎ এক অপ্সরা জল থেকে উঠে এলো। প্রথম তার ঘন নীল কেশরাশি দেখা গেল জলের উপর, তারপর চাঁদের মত সুন্দর মুখ, কম্বু গ্রীবা, স্ফটিক শিলার মত কলশ যুগল সহিত বক্ষস্থল, ক্ষীণ কটি, বিশাল নিতম্ব, কদলী জানু, পাদপদ্ম প্রভৃতি একে একে উপরে উঠল। এক মুহূর্ত জলের উপর দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ আকাশে উঠতে লাগল, খানিক দূর গিয়ে আমাকে সম্বোধন করে বললো—কুমার! বিবাহ হতেই আমি শাপমুক্ত হয়ে গেছি। এখন ত্রিদশপতির দরবারে যেতে হবে। কিন্তু আর্যপুত্রের সাথে মিলনের আশায় আমি বিহ্বল হয়ে পড়েছি। তুমি আমার হয়ে পদ্মাঞ্জলি দিয়ে বন্দনা করে তাকে বলো যে একদিন আমি নিশ্চয় তার সঙ্গে মিলতে আসব।

একদিন চাঁদনী রাতে ক্ষীরশ্বেত জ্যোতি প্রসারিত করে নীল আকাশের নিচেয় ঐ ক্রীড়াপর্বতে আমার সঙ্গে আর্যপুত্রের আবার মিলন হবে।

এই কথা শুনে কুরভকের বিস্ময়ের অবধি রইল না। অবিশ্বাসের

কিছুই নেই এ কথার মধ্যে। বিষণ্ণমুখে কুব্জ বিদায় নিল বটে কিন্তু তারপর থেকে প্রতি পূর্ণিমার রাত্রে সে ক্রীড়াপর্বতের উপর গিয়ে তার প্রেয়সীর প্রতীক্ষায় বসে থাকতো। সেই একদিনের স্মৃতি সে ভুলতে পারেনি কখনও, সে যে তার পরিণীতাকে স্পর্শ করেছে, তার হাতে হাত দিয়েছে, তার মধ্যে ত অবিশ্বাসের কিছুই ছিল না। তবুও হয়তো ভুলতে পারতো যদি অন্ততঃ কোনও ভগ্নদন্ত, শ্যামলাঙ্গী দাসীও তাকে পতিত্বে স্বীকার করতো।

॥ তিন ॥

গান্ধার যাত্রা

তখন আমাদের দুজনকার বয়স ছয় বৎসর উত্তীর্ণ হয়নি। তিনজন গুরু আমাদের শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা হল। আমাদের সঙ্গে আরও কয়েকজন সামন্তপুত্র ছিল যাদের মধ্যে বীরসেন নামে এক সামন্তপুত্র সবচেয়ে অধিক কুশলী ও মেধাবী ছিল।

আগে আমাদের দুজনের জোড়া ছিল, এবার তিনজন হলাম।

পট্টিকার উপর মাটীর চূর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে কাষ্ঠলেখনী দিয়ে দাগ কেটে লেখা শুরু হল। প্রথম দিন "ওঁ নমঃ সিদ্ধম" বলে শুভমুহূর্তে আমাদের হাতে লেখনী দেওয়া হল, সেদিন অজ্জুকা খুব ধুমধাম করে উৎসব করলেন। অধ্যাপকদের "ক্ষৌম বস্ত্রের জোড়া" এবং অন্যান্য উপহারাদি দেওয়া হল।

আমি ও আমার পিতৃকুল বৌদ্ধ ছিল। আমার পিতা ভগবান সুগতের উপর খুব শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কিন্তু তিনি অন্ধভক্ত বা অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। কখনও কখনও তিনি বসে বুদ্ধের নানাকাহিনী শোনাতেন, তখন খুব ভালো লাগত শুনতে। কিন্তু যখন বুদ্ধের উপদেশ সম্বন্ধে সমালোচনা করতেন তখন বেশীর ভাগ কথাই বুঝতে পারতাম না।

অজ্জুকার পতিকুল ব্রাহ্মণ, গো এবং বিষ্ণুর পরমভক্ত ছিল। কিন্তু বুদ্ধের উপরই তাঁর শ্রদ্ধা বেশী ছিল। প্রতি অষ্টমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমায় নগরের দক্ষিণপ্রান্তে অশোকারামে তথাগতের "শরীর-ধাতু" (হাড়) পূজার জন্য যেতেন। সঙ্ঘকে ভোজন করাতেন এবং ধর্মোপদেশ শুনতেন।

পাটলীপুত্রে অবস্থানকালে বোধ হয় এমন দিন ছিল না যেদিন আমি অজ্জুকার সঙ্গে অশোকারামে যাইনি।

জ্ঞান হবার আগেই আমি পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদে এসেছিলাম, আর সেইখানেই আমার বাকী সময় কেটেছিল। কখনও সখনও অতিথির মত অগ্রোদকা যেতাম বটে কিন্তু সেখানে সকল সময়ই আমার চোখের সামনে সমুদ্রগুপ্তের বিশাল রণিবাস, দাসদাসী, পরিচারক-পরিচারিকা, রত্ন স্বুবর্ণ প্রভৃতি ছবির মত ভেসে বেড়াত। মহাদেবীর অনুজ ভ্রাতা এবং দ্বিতীয় রাজকুমার চন্দ্রগুপ্তের অভিন্নহৃদয় সহচর বলে প্রজারা বা অন্যান্য সকলে আমাকেও তাদের প্রভুর মত সমীহ করতো। কিন্তু জ্ঞান হবার পর যখন আমি প্রথম অগ্রোদক গেলাম এবং সেখানে আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা পেলাম, তখন আমার ধমনীর মধ্যে যৌধেয় রক্ত নেচে উঠল। যত দিন যেতে লাগল তত চিন্তা বাড়তে লাগল এবং একে একে হৃদয়ঙ্গম করতে লাগলাম।

পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে সম্মান ছিল কিন্তু ভয় ও সঙ্কোচ ছিল আরও বেশী। এখানে রাজপ্রাসাদের অন্দরে বাইরে এমন সমসাথী কেউ ছিল না যার সঙ্গে প্রাণ খুলে একটু মিশতে পারি। কিন্তু অগ্রোদকাতে কমপক্ষে এক হাজার যৌধেয় ঘর আছে। যদিও অবস্থা তাদের সকলের সমান নয়। কারও ধন ঐশ্বর্য আছে প্রচুর, কারও বা কম। যার প্রচুর আছে, তার ঘরে দাসদাসীও আছে একাধিক। যার নেই তাকে নিজেকেই করতে হয় সবকিছু। তবুও এই হাজার ঘর যৌধেয় সকলেই প্রায় সমান অবস্থার ছিল। কারও ঘরে শস্য নেই বলে তাকে কখনও উপবাস করতে হয় না। কারও ঘরে মদিরা নেই বলে তার ঠোঁট মদিরার স্বাদ থেকে বঞ্চিত থাকবে এমন কথা তারা ভাবে না। এর মধ্যে দান-কৃতজ্ঞতার কোনও প্রশ্নই নেই। সকল যৌধেয়গণই তাদের পড়শী বা বন্ধুর আহার-বিহারের সঙ্গে তাদের সমান অধিকারের দাবী রাখত।

আমার কাকীমা, জ্যাঠাইমার চেয়ে বৌদির সংখ্যা ছিল অনেক বেশী। যখন আমি অগ্রোদকা যেতাম তখন কদাচিত নিজের

বাড়ির খাওয়া জুটত কপালে। বিশেষ করে যখন আমার বয়স তের-চৌদ্দ বৎসর, তখন নৃত্যগীতে আমি বেশ পারদর্শী হয়ে উঠেছি এবং অগ্রোদকাতে গিয়ে যখন নাচ-গান প্রদর্শন করতাম, তখন আমার সকল বৌদিদের মধ্যে রেষারেষি শুরু হয়ে যেত আমাকে আঁচলে বাঁধবার জন্য। তাঁদের অপার স্নেহের তুলনা হয় না। পিতার একমাত্র পুত্র আমি। সেজন্য আমার আপন বৌদি ছিল না, কিন্তু যৌধেয়দের মধ্যে সকল বৌদিই আপন হত। কারণ, সকল যৌধেয়রাই নিজেদের দেহে একই বংশের রক্ত অনুভব করত। ভালো মন্দ সকল জমিই সমগ্র যৌধেয়রা নিজেদের বলেই ভাবত। প্রয়োজনানুসারেই চাষের জমির বিলি ব্যবস্থা করা হত যৌধেয়গণের মধ্যে। এইভাবে সকল যৌধেয়রা নিজেদের সকলকে একই পরিবারের বলে মনে করত। এরকম মনোবৃত্তি শুধু যে অগ্রোদকাতে ছিল তা নয়, রোহিতকী, খণ্ডিলা, শ্রীমাল, ওস প্রভৃতি সকল যৌধেয়নগরীতে সকলে সকলকে সহোদর ভাইয়ের মতই মনে করত। যৌধেয় বস্তীর (গ্রামের) যেকোন ঘরে গিয়ে "আমি যৌধেয়" এইটুকু বলতে যতটুকু অবসর, তারপরই সেই পরিবারের সেও একজন বলে গণ্য হবে। তার সঙ্গে কোনও বাধা নিষেধ ভেদাভেদ ভাব কিছুই থাকবে না।

আমি বহুবার নিজের বন্ধুদের ঘরে এমনি আনন্দ পেয়ে ধন্য হয়েছি।

সমুদ্রগুপ্তের রাজকীয় ভোজনালয়ের মত এখানে হয়ত, পঞ্চাশ প্রকার ব্যঞ্জন এবং সুরভিত চালের ভাত ছিল না কিন্তু এখানকার মত তৃপ্তি সেই রাজমহলের রাজভোগে কখনও অনুভব করিনি।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অজ্জুকার অগ্রোদকায় যাতায়াত কমে গেল। কিন্তু তাঁর মন সর্বদাই অগ্রোদকার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকতো।

আর মাঝে মধ্যে যখন আসতেন, তখন তিনি ভুলে যেতেন যে তিনি গুপ্ত চক্রবর্তীর মহাদেবী। সঙ্গেও তেমন ঝামেলা বিশেষ একটা নিয়ে আসতেন না। কেবল দু-চারজন এমন লোক নিয়ে

আসতেন, যারা তাঁর পিত্রালয়ের অকৃত্রিম প্রাণখোলা আনন্দ দেখে হিংসা করত না।

প্রতিশ্রুতি মত কখনও তিনি অগ্রোদকা থেকে পাটলিপুত্র ফিরে যাননি। একমাসের জন্যে যদি আসতেন, তাহলে নিশ্চয়ই দুমাস হত, কখনও বা তারও বেশী।

যদিও মা তখন বেঁচে ছিলেন না, কিন্তু তাঁর সহোদরা বোন দুজন ছিলেন, তাঁরা কখনও মায়ের অভাব বুঝতে দেননি আমাদের। তাছাড়া অগ্রোদকায় এমন এক ঘরও যৌধেয় পরিবার ছিল না যেখানে আমার বা অজ্জুকার আপন, মা, বোন, বৌদি প্রভৃতি ছিল না।

কখনও যদি তিনি নিজে না আসতে পারতেন, তাহলে আমার আসবার সময় যৌধেয়দের জন্য তাঁর স্নেহোপহার নিয়ে আসতে আমার প্রাণান্ত হত। কারও জন্য চিঠি, কারও জন্য অন্যান্য উপহার। কারও কথা তিনি ভুলতেন না কখনও। চিঠি লিখতে বসলে তা আর শেষ হতে চাইত না। ভোজপত্রের নিচে ভোজপত্র জোড়া দিয়ে সে এক বিরাট আকার ধারণ করতো। মনের কথা যেন ফুরোয় না। তাঁর চিঠিতে নামের সংখ্যা দেখে সকলে অবাক হয়ে বলত দত্তা তাহলে আমাদের ভোলেনি, কিন্তু এত নাম ও মনে রাখে কি করে।

আমি একদিন এই কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি সস্নেহে আমাকে চুম্বন করে বললেন,—ভাই, যৌধেয় রক্ত কী কখনও কাউকে ভুলতে পারে? তাঁরা আমাকে যৌধেয় ভূমি থেকে দূরে সরিয়ে দিলেও আমি আমরণ যৌধেয়কন্যাই থাকব।

সেবার আমি যখন অগ্রোদকা গেলাম, তখন বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাটলিপুত্র থেকে আমাদের নৌকা রওনা হয়েছে। পূবের হাওয়া এই সময় অনুকূল থাকায় যেতে সুবিধা ছিল খুব বেশী। চারিদিকের নদী নালা বর্ষার জলে ভরপুর থাকে এ সময়। এমন কি বহু সামুদ্রিক বাণিজ্য জাহাজ বিশেষ করে মাগধ

স্বার্থবাহী (ব্যাপারী) এ সময় যবদ্বীপ থেকে কৌশাম্বী পর্যন্ত পৌঁছে যেত।

একটা নৌকা বোঝাই হল অজ্জুকার দেওয়া উপায়নাদিতে। নৌকার কূপদণ্ডে (মাস্তুল) বিরাট পাল খাটানো, হাওয়া লেগে ফুলে উঠে তীরের গতিতে পশ্চিমের দিকে ছুটতে লাগল।

বারানসী পৌঁছে আমি সেখানকার উপরিক (ভাইসরয়)-এর গৃহে অতিথি হলাম এবং সর্বপ্রথমে সারনাথ দেখতে গেলাম। যৌধেয় রক্ত যেমন আমার দেহে প্রেরণা যোগাত, উত্তেজনার সঞ্চার করত, তেমনি আমার পৈতৃক ধর্মের উপরও আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। তাই ভগবান তথাগতের প্রথম ধর্ম প্রচারের পুণ্যভূমি দর্শন না করে থাকতে পারলাম না। প্রতিষ্ঠানেও (ঝুন্সী) আমার নৌকা একদিন, একরাত বিশ্রাম করল। সেখানকার রাজপ্রাসাদ এবং রাজোদ্যান পাটলিপুত্রের কাছে এমন কিছু আকর্ষণীয় নয়। তবে সেখানকার পুণ্য পরিবেশের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলাম আমি। লোকে গঙ্গা-যমুনার এই সঙ্গমস্থলে ডুব দিয়ে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে যাওয়ার আশায়। এই বিশ্বাস বা রীতি ভালো কি মন্দ, সে বিচার করবার ক্ষমতা তখনও আমার হয়নি, কিন্তু আমার শিশুমনের উপর প্রতিক্রিয়া কিছু হয়েছিল। পরে ব্রাহ্মণদের ধর্মজালের প্রতি যে সব কারণে আমার মনে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মেছিল, তার মধ্যে এটাও একটা শ্রেষ্ঠ কারণ ছিল।

প্রতিষ্ঠান থেকে আমাদের নৌকা যমুনা নদী ধরে চললো। কৌশাম্বী পৌঁছে আবার বিশ্রাম। এখানেও উপরিকের গৃহে আশ্রয় নিলাম। এখানে মহারাজ অশোকের রাজমহল দেখলাম, সেখানকার দ্রষ্টব্য রাজমহলে বড় বড় পাষাণ-স্তম্ভ যুক্ত আস্থান গৃহ (বৈঠকখানা অথবা দরবার গৃহ) যা পাটলিপুত্রে আগেও দেখেছি। তাছাড়া কৌশাম্বীতে দুটি বিশাল পাষাণ স্তম্ভ দেখলাম, যার একটিতে কিছু লিপি খোদাই করা। যে বৎসর আমি এবং চন্দ্র জন্মগ্রহণ করলাম, সেই বৎসরই আমার ভগ্নীপতি সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এই পাষাণ-

স্তম্ভে লিপি খোদাই করিয়েছিলেন। অক্ষরগুলি আমি পড়তে পারতাম, এগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ ভাষা বুঝতে পারতাম না। লোকের কাছে শুনেছিলাম যে কুমারামাত্য হরিসেন এর লেখা এটি একটি সুন্দর কবিতা।

কৌশাম্বী থেকে মথুরা পৌঁছলাম। দেবপুত্র শাহীর (কুষাণ) বহু প্রাসাদ এখনও এখানে বর্তমান রয়েছে, সেগুলিতে এখন মগধের অধিকারীরা বাস করছেন।

ইন্দ্রপ্রস্থ এসে নৌকা ছেড়ে দিলাম। এবার যৌধেয় ভূমিতে এসে গেছি, এখন নৌকার দরকার নেই। নৌকার জিনিষপত্র গাড়ীতে তুলে নিয়ে অগ্রোদকা যেতে হবে। কিন্তু সে জন্য আমাকে সেখানে দেরী করে গাড়ী জোগাড় করে ঝামেলা পোয়াবার দরকার নেই। অন্য লোকের উপর ভার দিয়ে একজনকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রোদকা চলে এলাম।

পিতা আমাকে পেয়ে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলেন। পুরো দু-বছর পরে অগ্রোদকা এলাম। আমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। পিতা অনেকক্ষণ আমার নিটোল স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। আমি যৌধেয় শরীর-সম্পত্তি হারাইনি দেখে তিনি সবচেয়ে বেশী আনন্দিত হলেন।

এবার অগ্রোদকায় এসে আর একবার যাত্রার সুযোগ হল। পাটলিপুত্র থেকে অগ্রোদকা বহুবার যাতায়াত করেছি অতএব এর মধ্যে নতুনত্বের কিছুই নেই।

পিতা এতদিন পর যৌধেয় পুরস্কৃতের (গণপতি) পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং অবসর নেবার পর থেকে ব্যবসা করছিলেন। এতদিন যাবত উক্ত ব্যবসার প্রায় সকল ভার কর্মচারীর উপর ন্যস্ত ছিল।

ব্যবসার উপকরণ ছিল পূর্বদেশের সূক্ষ্ম কার্পাস-বস্ত্র, স্বর্ণ-সূত্রিত বেনারসী ক্ষৌম বস্ত্র ও চন্দন প্রভৃতি, গান্ধার দেশীয় পান্ডু কম্বল, শুষ্ক

দ্রাক্ষা, কাপিশেয় সুরা এবং কম্বোজ দেশীয় ঘোড়া প্রভৃতি নানাপ্রকার সামগ্রী।

এবার পিতা নিজে সঙ্গে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। যাওয়াটা শুধু যে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে, তা নয়। অন্যান্য প্রধান উদ্দেশ্য হল যাওয়া আসার পথে তক্ষশিলার ধর্মরাজিকা চৈত্য এবং পুরুষপুর (পেশোয়ার)-এ অবস্থিত ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র দর্শন।

বর্ষা শেষ হয়ে গেছে। জমি শুকিয়ে গেছে। নদী-নালার জলেও টান ধরেছে। ফসল বোনা শেষ হয়ে গেছে, সেই সময় পিতা রওয়ানা হলেন। যাবার সময় আমি তাঁর সঙ্গে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। আগেই বলেছি, আমার কোনও ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করতেন না বা বাধা দিতেন না কখনও। তাঁর স্বভাব ছিল যেমন গম্ভীর তেমনি মাধুর্যময়। যৌধেয় জাতিকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসতেন তিনি।

সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত শ্বশুরকে সম্মানিত করবার জন্য বহুবার উচ্চ পদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন, কিন্তু পিতা তা গ্রহণ করতে রাজী হননি। যৌধেয় জাতির সেবা করাই তিনি সবচেয়ে বড় সম্মান বলে মনে করতেন। কিন্তু ইষ্ট-কুটুম্ব, জ্ঞাতি-পরিজন প্রভৃতি সব দিক রক্ষা করতেও অর্থের প্রয়োজন, অথচ এই ধন-ঐশ্বর্যের উপর তাঁর বীতরাগ ছিল প্রচুর।

কখনও কখনও তাকে বলতে শুনতাম যে,—যৌধেয়রা ধন, ব্যবসা এবং প্রভুত্বের পিছনে যেভাবে ছুটে চলেছে, এ একদিন সমগ্র জাতির পতন ঘটিয়ে ছাড়বে।

আমরা যাত্রা করলাম।

দল আমাদের বেশ বড়। পাঁচ-শত গাড়ী বোঝাই লক্ষ লক্ষ দীনার মূল্যের পণ্যদ্রব্য। তা ছাড়াও উট ও ঘোড়া ছিল আরও অনেক বেশী। এজন্য পথিমধ্যে দস্যু-তস্করের ভয় সর্বদা লেগেই থাকত। বিশেষ করে যখন আমরা যৌধেয় সীমান্ত শেষ করে শতদ্রু পার হয়ে দেবপুত্র শাহীর রাজত্বে পৌঁছলাম। দস্যুদের ভয় থাকলেও আমরা কখনও ভীত হইনি। কারণ আমাদের সঙ্গে পাঁচ-শত

যোদ্ধা ছিল, তাছাড়া প্রত্যেক গাড়ীতে দু-একজন ছিল যারা প্রত্যেকে যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষ। বিশ্রাম করবার নির্দিষ্ট জায়গা ছিল আমাদের। সেখানে খাদ্য-পানীয় এবং থাকবার ব্যবস্থা প্রভৃতির সুবিধা ছিল। পণ্যবোঝাই গাড়ীগুলিকে মধ্যে রেখে সকলে সশস্ত্র হয়ে চারিদিক ঘিরে পাহারা দিত। তরবারী, ধন বা জনসংখ্যায় আমরা যেমন মজবুত ছিলাম তেমনি যুদ্ধবাজ যৌধেয় বীরদের কথা ভূ-ভারতে সকলেই জানত ও। অতএব আমাদের কোন ভয় নেই। তাছাড়া পিতা ছিলেন দলনেতা।

শতদ্রু পার হতেই ক্রমশঃ দেবপুত্র শাহীর শক সৈনিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতে লাগল। যদিও পাটলিপুত্র বা অন্যান্য জায়গায় শক জাতির লোক দেখেছি কিন্তু একত্রে দু-চার শত বা ততোধিক এই প্রথম দেখলাম। শকদের গভীর দাড়ী-প্রীতির কারণ আমি বুঝতে পারিনি। অতি যত্নসহকারে দাড়ী রাখে এরা। একগাছা দাড়ির লোকসান সহ্য করা সম্ভব নয় যে কোনও শক-এর পক্ষে। ফলে সৌন্দর্য বা গম্ভীর ভাবের বদলে মুখগুলিকে ভয়ঙ্কর দেখাত। আমাদের চেয়েও বড় জামা পরে এরা, হাঁটু অবধি এবং তারও নিচে অবধি নামানো তার প্রান্তভাগ। কোমরে লম্বা পট্টী, মাথায় সূঁচলো টুপি, পায়ে সুথন (একপ্রকার পায়জামা) এমন ভাবে পরা থাকে যে কঞ্চুকের (জামা) বহরের নিচে প্রায়ই ঢাকা পড়ে থাকে। থলির মত জুতা প্রায় হাটু অবধি পৌঁছে যায়।

বেশভূষা বা ভাষায় শকদের সঙ্গে আমাদের যদিও কোনও মিল নেই, কিন্তু শকরাও আমাদের মত বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ ধর্ম মান্য করে। অবশ্য বৌদ্ধ ধর্মই বেশী। এর মধ্যে কিছু কিছু জৈন আছে, কিন্তু মাংস পরিত্যাগ করা এদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব বলে জৈনদের সংখ্যা খুব কম।

পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে থাকাকালীন আমি ম্লেচ্ছ শকদের সম্বন্ধে অনেক নিন্দাজনক কথা শুনেছি কিন্তু এখন এদের একমাত্র দাড়ী ভিন্ন অরুচিকর আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমাদের দলে তীর্থযাত্রী কয়েকজন যৌধেয় স্ত্রী ছিল। শকরা তাদের নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অতিশয় সম্মানের সাথে সেবা করল। এদের আদর আপ্যায়ণের মধ্যে সুরা এবং নাচের লোভে নিজেকে সামলানো খুবই কষ্টকর কিন্তু তীর্থযাত্রার ইচ্ছা নিয়ে এসেছে যারা তারা ব্রত নিয়েছে বলে অনেক কষ্টে নিজেদের সংবরণ করতে বাধ্য হল। যদিও বয়সে এরা সবাই প্রায় বৃদ্ধা।

ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্তা পার হয়ে আমরা তক্ষশিলার সামনে পৌঁছলাম। আমরা ধর্মরাজিকা মহাচৈত্যের সামনে এলাম। আমাদের সকল পুরুষরা দূর থেকে হাতজোড় করে প্রণাম করল, কিন্তু আমার কাকীমা, বৌদি প্রভৃতি সকল নারী পুণ্যাভিলাষিণীরা গাড়ী থেকে নেমে আভূমি নত হয়ে প্রণাম করল, বার বার তিন বার বন্দনা করল সকলে। তাদের দেখাদেখি আমিও তিনবার বন্দনা করলাম। আমার মাসীমা দেবসেনা এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভক্ত ছিলেন। সেখান থেকে আমাদের সকল নর-নারী ধর্মরাজিকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পায়ে হেঁটে এগিয়ে চলল।

তক্ষশিলায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা খুব ভালই হয়েছিল। ময়দান, বাগান বা পুকুর সবই ছিল সেখানে। খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি বাজার থেকে কিনতে হত। যদিও দেবপুত্রের রাজধানী পুরুষপুর এখান থেকে বহু দূরে, তবুও তক্ষশিলার বৈভব পুরুষপুরের (পেশোয়ার) চেয়ে কোনও অংশে কম ছিল না। বরং বাণিজ্যের রাজধানীই হল তক্ষশিলা। শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহীদের বিপনীশ্রেণী এবং তাদের প্রাসাদশ্রেণী সব রীতিমত রাজকীয়।

এখান থেকে কম্বোজ, কপিশা, বাহ্লিক, পারসীক, যবন এবং অন্যান্য দেশের বাণিজ্য-রাস্তা শুরু হয়েছে, কিন্তু সে রাস্তা বেশীর ভাগ সময় বন্ধ থাকার জন্য যাতায়াতে অসুবিধা হয় বলে তক্ষশিলাতেই পূর্বদেশ থেকে আগত বণিকরা তাদের পণ্য বিক্রি করে এখান থেকে পণ্যাদি কিনে নিয়ে যায়। এখানে পাটলিপুত্রের সার্থবাহ গণদাসের পুত্রের সঙ্গে দেখা হল। ওরাও বাণিজ্যে বেরিয়েছে এবং মমুনার

আর উত্তর স্রুঘ্নপুর (অম্বালা), শাকল নগরী ঘুরে তক্ষশিলায় এসেছে। তক্ষশিলা সম্বন্ধে পিতার কাছে অনেক কথা শুনেছিলাম। তিনি বলতেন,—তক্ষশিলা শুধু বাণিজ্যের রাজধানীই নয়, একদা বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল। সে সময় সুদূর মগধ থেকে বিদ্যার্থীরা এখানে আসত বিদ্যার্জন করতে। এখন অবশ্য পাটলিপুত্র সবচেয়ে বড় বিদ্যাকেন্দ্র। তবে উজ্জয়িনী এবং মথুরাতে শিক্ষার অনেকখানি ব্যবস্থা আছে বলেই কেবলমাত্র উত্তরাপথ (পাঞ্জাব) এবং অন্যান্য পশ্চিমী দেশের লোকেরাই এখানে আসে।

তক্ষশিলায় অনেকগুলি বিহার আছে, তার মধ্যে এই ধর্মরাজিকা-মহাবিহারই সবচেয়ে বড়। ধর্মরাজিকা চৈত্যের পাষাণ কঞ্চুকে উৎকীর্ণ রয়েছে নানাপ্রকার সুন্দর মূর্তি। পাশে অনেকগুলি প্রতিমা-গৃহ রয়েছে, তার মধ্যে ভগবান বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর-এর মনোরম প্রতিমা স্থাপিত রয়েছে। পূজাগৃহে অখণ্ড ঘৃতপ্রদীপ সদাসর্বদা জ্বলতে থাকে। পিতা ঐ অখণ্ড প্রদীপ জ্বালবার ব্যয় বাবদ নিজের দশ দীনার মূল্যের (দীনার=সুবর্ণ মুদ্রা) অক্ষয় নিবি খুলে দন্তকার শ্রেণীর কাছে জমা দিলেন (দন্তকার শ্রেণী=হাতী দাঁতের শিল্পিসঙ্ঘ)। শিল্পি সঙ্ঘ বৎসরে এক দীনার ব্যাজ (সুদ) দিতে রাজী হল, এবং সেই এক দীনারই ধর্মরাজিকার অখণ্ড ঘৃত প্রদীপ এক বৎসরের জন্য জ্বালাবার ব্যয় বাবদ যথেষ্ট ছিল। ধর্মরাজিকার ইতিহাস বলতে গিয়ে পিতা বলতেন, ভগবানের নির্বাণের পর তাঁর শরীর ধাতু (অস্থি) গুলিকে ভাগ করে রাজগৃহ, কুশীনগর, বৈশালী, কপিলাবস্তু, রামগ্রাম প্রভৃতি স্থানে আট নয়টি চৈত্য নির্মাণ করা হয়েছে। ভগবানের নির্বাণের সওয়া দুই শত বৎসর পরে অশোক যখন সম্রাট হলেন, তখন তিনি দেশের নানাস্থানে বহু চৈত্য নির্মাণ করলেন। পরম ধার্মিক ছিলেন বলেই তাঁর অপর নাম ছিল ধর্মাশোক। সেই জন্যেই এই চৈত্যের নাম হয়েছে ধর্মরাজিকা চৈত্য। আমি প্রশ্ন করলাম,

—পাটলিপুত্রের মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্য কী এতদূর বিস্তৃত ছিল?

—হ্যাঁ পুত্র, এখান থেকে আরও পঞ্চাশ যোজন পশ্চিম পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা বিস্তৃত ছিল। এখনও পর্যন্ত এই দেশের লোক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, এবং ধর্মাশোককে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। রাজবংশের উত্থান পতন আছে কিন্তু পুণ্যাত্মাদের কীর্তি চিরকাল অমর হয়ে থাকে পৃথিবীর বুকে।

অশোকারামেও (পাটলিপুত্রে) আমি শক, পারসীক ও যবন ভিক্ষু দেখেছি, কিন্তু গান্ধার দেশীয় ছাড়া এইখানেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক শক-ভিক্ষু দেখলাম। এদের মধ্যে বিদ্যাপ্রেম ছিল খুব বেশী। আমার মাসী বরাবর ভিক্ষুনী বিহারে যাতায়াত করতেন এবং শক-পুত্রী আর্যা বাশিষ্টের কাছে উপদেশ শুনতেন। আর্যা বাশিষ্টের বিদ্যা মধুর স্বভাব ও উপদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন সর্বদা।

এখন আমরা গান্ধার দেশে বাস করছি। গান্ধারীয়দের পোষাক পরিচ্ছদের সঙ্গে আমাদের পরিচ্ছদের যথেষ্ট অমিল লক্ষ্য করবার মত। তাদের পায়জামা গোল ঝুলওয়ালা এবং আঁকা বাঁকা সেলাই করা। ফলে আসল কাপড়ের উপর নানাপ্রকার রেখাযুক্ত হয়ে দেখতে সুন্দর লাগে।

পরবার পর পায়জামার নিচের দিকটা একটু সরু এবং উপর দিকটা মোটা গোল মনে হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কঞ্চুক ব্যবহার করে, মাথায় গান্ধারীয় উষ্ণীষ এবং উত্তরীয়। পায়ে জুতোর (চপ্পল) প্রচলন রয়েছে সকলের মধ্যে। আভূষণ ব্যবহার বিধিও যথেষ্ট রয়েছে এদের মধ্যে। কিন্তু শক ও শকানীদের, পুরুষ-স্ত্রী'র পোশাকের মধ্যে কোন প্রভেদ লক্ষ্য করবার মত নয়। উভয়ই একই প্রকার চোগা, থলির মত জুতো, কোমরবন্ধ আর শুঁচলো টুপি পরে। এরা গান্ধারীয়দের চেয়ে আভূষণ কম ব্যবহার করে। বিশেষ করে "কর্ণপুর"-এর প্রচলন বা সখ একপ্রকার নেই বললেই হয়। মগধ বাসী এবং যৌধেয় জাতীর চেয়েও গান্ধারী এবং শকজাতীর গায়ের রং অধিক ফর্সা। অনেকে আবার কটা চুল ও নীল চোখের অধিকারী।

এখানে শ্যামকেশী'র চেয়ে স্বর্ণকেশীর (পিঙ্গলবর্ণ) সমাদর খুব বেশী। পুরুষপুরে আমি অনেক কম্বোজ-দেশীয় উপাসক (বৌদ্ধ) নরনারী দেখেছি। তাদের মধ্যে কারুরও কালো কেশ বা কালো চোখ দেখিনি। তাদের চুল হাল্কা হলুদ রংয়ের আবার কারও বা সাদা। গান্ধারীয়দের রাজা বা রাজত্ব থাকা সত্ত্বেও গান্ধারীয়রা শকদের কাছে মাথা নত করে থাকে। এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টিকটু লাগত। এ প্রশ্নের উত্তরে পিতা বললেন,

—দেবপুত্র শাহী এখন আর স্বতন্ত্র রাজা নেই। পারসীক শাহকে কর দিতে হয় তাঁকে।

তক্ষশিলায় আমাদের দুই সপ্তাহ থাকতে হল। ইতিমধ্যে আমাদের সাথীরা তাদের কেনাবেচার কাজ শেষ করে ফেলেছে। অতঃপর আমরা এখানে গাড়ী এবং মালপত্র রেখে ঘোড়ায় চেপে পুরুষপুর রওয়ানা হলাম। লোকের মুখে শুনতাম গঙ্গার চেয়েও সিন্ধু বড়, কিন্তু স্বচক্ষে দেখবার পর আমি পিতাকে প্রতিবাদের সুরে বললাম,

না—পাটলিপুত্রের গঙ্গার চেয়ে সিন্ধু বেশী চওড়া নয়। পিতা আমার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে বললেন,

—সিন্ধু নদ গঙ্গার চেয়ে অনেক বেশী গভীর এবং উত্তাল।

সিন্ধুতট থেকে আমরা পাহাড় দেখতে লাগলাম। এখান থেকেই আমি প্রথম রজতময় হিমালয়ের হিমশিখর দেখলাম। মাসীমা বলতেন ওখানে দেবতারা বাস করেন; সে কথার সত্যি মিথ্যে বিচার করবার বুদ্ধি বা বয়স তখনও আমার হয় নি।

সিন্ধু পার হয়ে পুষ্কলাবতী (চার সদ্দা) হয়ে কয়েক দিনের মধ্যেই আমরা পুরুষপুরে পৌঁছলাম। এখানে দেবপুত্র শাহীর সুন্দর রাজভবনে আশ্চর্য রকমের সুন্দর সুন্দর মূর্তিকলা দেখে অবাক হলাম। পরে জানতে পারলাম যে গান্ধার মূর্তিকলা যবন কলাকারদেরই সহযোগিতার দান। নগরীর প্রাসাদশ্রেণী এবং প্রশস্ত চৌরাস্তা খুবই আকর্ষণীয়। অগণিত মন্দির গাত্রে নানাপ্রকার ভাস্কর্যের নিদর্শন।

এখানে এসে আমরা কণিষ্ক মহাবিহার দর্শন করতে গেলাম। পিতা বললেন, অশোকের মৃত্যুর তিন 'শ' বছর পরে তাঁরই মত বুদ্ধভক্ত রাজা হলেন কণিষ্ক। এই পুরুষপুরই ছিল তাঁর রাজধানী এবং তিনিই স্বর্ণ-রত্ন বিজড়িত এই মহাচৈত্য নির্মাণ করেছেন।

অতঃপর স্বর্ণ নির্মিত মন্দিরভাগের একস্থানে রক্ষিত একটি ভিক্ষা-পাত্র দেখিয়ে বললেন,

—এটি ভগবান বুদ্ধের ভিক্ষাপাত্র প্রথমে লিচ্ছবিগণের রাজধানী বৈশালীতে ছিল। কণিষ্কের রাজত্বকালে তিনি তাঁর সেনাপতিকে আদেশ করেছিলেন ঐ ভিক্ষাপাত্র এবং একজন শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ভিক্ষুকে এখানে নিয়ে আসতে। তখন সেনাপতি এই ভিক্ষাপাত্র বৈশালী থেকে এখানে নিয়ে আসে, আর বিদ্বানশ্রেষ্ঠ যিনি এসেছিলেন, তাঁর নাম হল আর্য সুবর্ণাক্ষী পুত্র মহাকবি অশ্ব ঘোষ।

তখন অবশ্য পিতার কাছে শোনা এত সব কথার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারতাম না। পরে বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার পুঁথি পাঁজী ঘেটে সেই সকল কথার মর্মোদ্ধার করেছিলাম এবং অনেক কিছুই জেনেছিলাম। যখন আমি প্রাচীন গ্রন্থরাজির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে থাকতাম তখন আমার মানস নেত্রের সামনে সাকার হয়ে ভেসে উঠত সেই চিন্তা, ঘটনাবলী। ষাট বৎসর পর সে সকল ঘটনা আজ আমি লিখতে বসেছি শুধু স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে, এটাও বোধ হয় অতীতের আহরণ করা জ্ঞানের প্রভাব।

এর পর আমরা যতদিন ছিলাম বহুবার কণিষ্ক-বিহার ও ভিক্ষাপাত্র দর্শন বা পূজার জন্য সেখানে গেছি, কিন্তু পিতা প্রায় সব সময়ই আর্য-অসঙ্গের কাছে তাঁর সেবায় সময় কাটাতেন। আর্য অসঙ্গের নাম সুদূর পাটলিপুত্রের অশোকারাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁচেছিল। অগাধ বিদ্যা ছিল আর্য-অসঙ্গের, স্বভাব ছিল সরল শিশুর মত। বয়স হয়েছে সত্তরের চেয়েও কিছু বেশী। দাড়ী-চুল না থাকার জন্য বৃদ্ধ বলে অনুমান করা কঠিন হত। ঠোঁটের কোনে সব সময় হাসি লেগে থাকত। তাঁর সেই সুন্দর তপ্ত কাঞ্চন-গৌর

শরীরের উপর অরুণ রংয়ের চীবর (ভিক্ষু বস্ত্র) খানি মনে হত যেন প্রভাতী সূর্যের চাদর। যেমনি তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের পরিবেণে (উঠান) বসতেন, অমনি বিদ্বান ভিক্ষু ও গৃহস্থেরা চারিদিকে ঘিরে বসত। পিতা ও অন্যান্য শ্রোতাগণ বুদ্ধ এবং যবন (য়ুনানী) দর্শন সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করতেন।

আমি তখন অবশ্য সে সকল আলোচনার মর্ম বুঝতে পারতাম না, তবুও ঘণ্টার পর ঘণ্টা পিতার সঙ্গে সেখানে অতিবাহিত করতে কোন কষ্টই অনুভব করতাম না।

প্রথম দিন আর্য-অসঙ্গ বন্দনা করবার সময় আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডেকে নিয়ে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন পিতাকে,— উপাসক সেনাপতি! তোমার পুত্র খুব মেধাবী, একে খুব লেখাপড়া শেখাও। পিতা হাতজোড় করে উত্তর দিলেন,

—আর্য! আপনিই বৎস জয়কে আপনার চরণে আশ্রয় দিন।

—আমার আর সে বয়স নেই, বৃদ্ধ হয়েছি। ধ্যান উপাসনা করবার পর যতটুকু সময় আমার হাতে থাকে, তা তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করে কাটে, অতএব বৎস জয়ের পড়াশুনায় বিঘ্ন হতে পারে।

—তবুও আপনার কাছে থাকলে ও অনেক জ্ঞানলাভ করতে পারবে।

—না উপাসক! ওর সময়ের অপব্যবহার হবে। তার চেয়ে এককাজ কর, আমার ছোট ভাই বসুবন্ধুকে তুমি জানো?

—হ্যাঁ আর্য! জম্বুদ্বীপের কোন লোকটি আচার্য বসুবন্ধুর নাম জানে না? আমি তক্ষশিলা এবং পুরুষপুরেও সংবাদ নিয়েছি, কিন্তু তাঁর সংবাদ পাইনি। এখন তিনি কোথায় আছেন?

—সে এখন প্রাচীতে (পূর্বদেশ) বোধ হয় পাটলিপুত্র অথবা সাকে'তে আছে। তার এক মিথ্যা বিশ্বাস জন্মেছে যে, কোন এক চক্রবর্তী বংশে একজন ধর্মাশোক আবিষ্কার করতে পারলে তথাগতের শাসন আরও পাঁচ শত বৎসর পর্যন্ত বেশ ভালভাবেই চলবে।

—চক্রবর্তী বংশের আশ্রয়ে ?

—হ্যাঁ, আমার মনে হয় বুদ্ধধর্ম এই রকম রাজরাজড়ার হাতে পড়ে ক্রমশঃ দুর্বল এবং মলিন হয়ে যাবে। ও ত বহুজন হিতার্থে। তুমি নিশ্চয় তথাগতের বাণীতে পড়ে থাকবে যে রাজার সৃষ্টি কেমন করে হল? প্রাচীনকালে রাজা ছিল না। জন (জনতা) স্বয়ং নিজেদের ব্যবস্থা করে নিত, যেমন করে এখন তোমরা অর্থাৎ যৌধেয়গণ করছ, যেমন করে তথাগতের সময়ে লিচ্ছবিরা করত। ক্রমশঃ লোকে অর্থের আদান প্রদানের মাধ্যমে ধনী গরীবের প্রভেদ সৃষ্টি করল। গ্রামের পাশে বড় বড় গভীর খাদ দেখেছ ?

—হ্যাঁ আর্য !

—ঐ খাদ থেকে যেমন মাটী সংগ্রহ করে ধনীদের বড় বড় ঘর বাড়ী, অট্টালিকা তৈরী করা হয় তেমনি ধনীদের কাছে নয়শত নিরানব্বুই জন গরীবের মুখের গ্রাস বঞ্চিত করে, শরীরের কাপড় হরণ করে, আর তাদের ন্যায্য রোজগার থেকে ঠকিয়ে ঐ সব ধন জমা করা হয়; আর তবেই তারা বড় বড় প্রাসাদ তৈরী করতে পারে, সুবর্ণ রত্নের দীপ জ্বালাতে পারে এবং সেই দুকুল, পাণ্ডু কম্বল পরতে পারে। যার সকল ঐশ্বর্য, ধন সর্ব সাধারণকে দুখী দরিদ্রে পরিণত করে একত্র করা, সে কী করে তথাগতের বহুজনহিতায় ধর্মের উপকার করবে? বড়জোর নিজের প্রাসাদের মত রত্ন জড়িত, মণি মুক্তা খচিত চকমকে দু-একটি চৈত্য বিহার বা প্রতিমা গৃহ নির্মাণ করতে পরে। কণিষ্কের বংশধর প্রায় তিনশত বৎসর যাবত একটি একটি করে বহু চৈত্য বা বিহার নির্মাণ করেছে। তার মধ্যে কয়েকটি চৈত্য এত মূল্যবান বা সুন্দর যে আজকার পুরুষপুরের রাজপ্রাসাদও তার তুলনায় হীনপ্রভ বলে মনে হয়। যেমন এই বিহার দেখতে পাচ্ছো হীরা-মতি মণ্ডিত। কিন্তু তুমিই বলতো, তথাগতের ধর্ম কী হীরা-মতি মণ্ডিত ধর্ম ?

—না আর্য ! তথাগতের ধর্ম বহুজন হিতায়।

—ঠিক বলেছ সেনাপতি ! আমি ভাবছি যে, তথাগতের ধর্ম

যেমন রাজাদের আঁচলে বাঁধা পড়েছে, তাকে আবার কী উপায়ে উদ্ধার করা যায়, এবং আবার বহুজন হিতায় ধর্ম হিসেবে পুনর্গঠন করা যায়। আচ্ছা বলতো, তথাগত লিচ্ছবি কুমারদের রাজভোগের চেয়ে গণিকা আম্রপালীর ভোজনকে কেন তৃপ্তিদায়ক মনে করেছিলেন?

—কেননা, ভগবান সকলের মধ্য থেকে উচ্চ নীচ ভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন।

—ঠিক! কেবলমাত্র ভিক্ষুকের জন্যই কিন্তু এই উদাহরণ নয়, সকল গৃহস্থদের জন্যেও। ভিক্ষুক, ভিক্ষুনী, উপাসক, উপাসিকাদের এই চার সঙ্ঘ এই জন্যে স্থাপিত হয়েছিল যে তারা তথাগতের প্রদর্শিত পথে চলবে, কিন্তু আজ দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ কী অবস্থা হয়েছে দেশের।

—হ্যাঁ আর্য, উপাসক, উপাসিকাও আজকাল ঠিক তেমনি করে জাত-পাত মানে যেমন করে ব্রাহ্মণদের শ্রাবণ (শিষ্য) রা মানে।

—হ্যাঁ সেনাপতি, তথাগতের শিষ্যরাও রাজার আশ্রয় গ্রহণ করাকেই ধর্মের অভিবৃদ্ধি বলে মনে করে। আর শুধু সেই কারণেই ধর্ম এখন আর বহুজনহিতায় নেই। এই চতুর্বিধ সঙ্ঘকে তথাগত সমুদ্ররূপে বোঝাতে চেয়েছেন, যে সমুদ্রে এসে সকল নদ নদী তাদের সকল ভেদ ভাব ভুলে গিয়ে এক হয়ে মিশে যায়; কিন্তু তথাগতের শিষ্যরা তাঁর বাণীর প্রকৃত মর্ম বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না।

—কিন্তু ব্রাহ্মণরা যদি সেই যুক্তি বা নিয়ম মানতে রাজী হয় তবে হয়ত কিছু হতে পারে।

—তা নয় সেনাপতি। তথাগত ব্রাহ্মণদের ভয় করতেন না। তাহলে তিনি সারনাথে ধর্ম-চক্র প্রবর্তন (প্রথম উপদেশ) করতেন না। তথাগতের যে ধর্ম ভারত, চীন, পারস্য, যবন প্রভৃতি দূর দূর দেশ অবধি বিস্তৃতি লাভ করেছে সে কী ঐ ব্রাহ্মণদের দয়ায়? না, সেনাপতি সে শুধু সেই ধর্মের সত্যতার জোরে, যুক্তির যথার্থতায়। সে ধর্মের মধ্যে প্রাণীমাত্রের জন্য ছিল দয়া, ছিল প্রেম; তার মধ্যে

ছিল জ্ঞান-প্রকাশের সুবিধা, ছিল বহুজনের হিতের ভাবনা। আর সেই কারণেই তথাগতের ধর্ম পৃথিবীর কোণে কোণে বিস্তৃতি লাভে সমর্থ হয়েছিল। কিন্তু আজ তার পরিণতি কি হয়েছে? অবশ্য তুমি এই রত্নখচিত চৈত্য বা গ্রামের মধ্যে রাজকৃপা-লাভী গ্রামবাসীদের অথবা আরও দু-চারটা বিহার দেখলে মনে করবে যে তথাগতের ধর্ম খুব ভালভাবেই চলছে কিন্তু তা নয়, আসলে তার মূলে ঘুন ধরেছে। আমরা কেউই বহুজন হিতায় কাজ করছি না। সকলেই আমরা বাসী রোজগার দিয়ে উদর পূর্তি করছি।

—এর কি কোন রাস্তা নেই আর্য?

—হ্যাঁ, রাস্তা আছে বৈ কি। রাস্তা হল বোধিসত্ত্বের প্রদর্শিত রাস্তা, মহাযান। মানুষ নিজের সুখ, স্বার্থ বা নির্বাণের জন্যে জীবন-ধারণ করলে চলবে না। তার জীবন-প্রাণ বহুজনহিতার্থে উৎসর্গ করতে হবে। প্রতিজ্ঞা করতে হবে যতদিন একটিও মানব দুঃখী থাকবে, ততদিন আমরা নির্বাণ চাই না। ততদিন আমাদের স্থান থাকবে আর্ত দুঃখীদের মধ্যে। ভগবান তাঁর ধর্মকে "এহিপশ্যিক" বলেছেন। তার গুণ এই পৃথিবীতে দেখাতে হবে। পৃথিবীর বহুজন আজ দুঃখী জীবন যাপন করছে, আর রাজা তার রনিবাসে পাঁচ শতের স্থানে হাজার পূরণ করতে এবং ভোগ-ঐশ্বর্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবার জন্য লুটপাট, যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে মেতে আছে, যাকে বলে দিগ্বিজয়।-

—তাহলে আর্য! আপনি রাজতন্ত্র পছন্দ করেন না?

—না, তথাগতও পছন্দ করতেন না। তাই ত তিনি কোন নিরঙ্কুশ, নিভ্রান্ত শিষ্য রেখে যাননি। সঙ্ঘকেই তিনি নিজের স্থানে গণ্য করে গেছেন।

—কিন্তু আমাদের দেশে দূর দূর থেকে আগত বিদ্বান ভিক্ষুরা এটুকু জানেন না যে রাজা না হলেও রাজ্য সুন্দরভাবে চলে।

—এই ত হল ব্রাহ্মণদের জাদু। তারা রাজাদের সঙ্গে মিশে

বহুজনের রোজগার লুঠ করতে বসেছে ; লুঠের নানাপ্রকার উপায়ের মধ্যে এও একটা উপায়। যদিও আজ পর্যন্ত বহু রাজারা নিজেদের বুদ্ধ ভক্ত বলে প্রচার করে থাকেন কিন্তু বিচার করে দেখলে দেখা যায় তারা বৌদ্ধ ভক্তের চেয়ে ব্রাহ্মণ ভক্তই বেশী।

—হ্যাঁ আর্য, শুধু ব্রাহ্মণ-ভক্ত নয়, তারা গো-ভক্তও বটে।

—তা বটে। ব্রাহ্মণ-ভক্ত হলেই গো-ভক্ত হতে হবে। এই কথা বলে আর্য-অসঙ্গ হেসে ফেল্লেন। তার সঙ্গে শ্রোতারাও হাসিতে যোগ দিল। অতঃপর আর্য হাসি থামিয়ে বল্লেন,

—এ হাসির কথা নয়, কাঁদবার কথা। বিশেষ করে এ প্রশ্ন হল বহুজনের হিতের প্রশ্ন, তাদের পরবর্তী হাজার হাজার বংশধরদের হিতের প্রশ্ন। বহুজনকে দুঃখ কষ্টের মুখে ঠেলে দিয়ে কিছু লোক সুখ-বৈভবের চরমে উঠে মহা আরামে দিন কাটাবে এটা মানব ধর্মের পক্ষে কলঙ্কজনক। যবন শক প্রভৃতি জাতিরা যখন আমাদের দেশে আসে জানো ব্রাহ্মণরা তখন কী বলেছিল ?

—কী আর্য ?

—ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ বলত। কিন্তু তথাগতের শ্রাবকরা তথাগতের উপদেশমত তাদের সঙ্গে প্রেম এবং সম্মানজনক ব্যবহার করতে লাগল। ক্রমশঃ তারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তথাগতের শরণ নিল। ক্রমে ক্রমে তারা ভারতবর্ষে পাকাপাকি বসবাসও সুরু করল এবং যেখানে যেখানে তথাগতের চরণ ধূলা পড়েছে সেই স্থানগুলিকে তারা পবিত্র তীর্থস্থান বলে মান্য করতে লাগল। স্থবির নাগসেন-এর শিষ্য যবনরাজ মিলিন্দ বড় বড় বিহার নির্মাণ করেছে। শকরাজ কণিষ্কের কত বড় বড় দান-উৎসর্গ রয়েছে তা তক্ষশিলা এবং পুরুষপুরের বিহারগুলির বৈভব দেখলেই অনুমান করতে পারা যায়। অবশেষে ব্রাহ্মণরা তাদের ম্লেচ্ছ বলে উপেক্ষা করবার ভুল বুঝতে পারল। তাছাড়া দক্ষিণার লোভকেও উপেক্ষা করা যায় না ; ব্রাহ্মণরা নতুন নতুন শ্লোক গঠন করতে লাগল, যে সব শ্লোকের মাধ্যমে তারা বোঝাতে চাইল যে যবন শক আদি বিদেশী

জাতিরা ক্ষত্রিয় আর্য। ব্রাহ্মণদের দর্শন না লাভ করবার জন্য এতদিন ওরা সংস্কারভ্রষ্ট হয়েছিল।

—আজ উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ বংশ শক-ম্লেচ্ছ'র বদলে শক-ক্ষত্রিয় বলেই পরিচিত।

—হ্যাঁ! তখন তথাগত শ্রাবকরা রাজাদের কাছে ধর্মের অভিবৃদ্ধি (সমৃদ্ধি) দাবী করল, কিন্তু পাশা ততক্ষণে সুচতুর ব্রাহ্মণদের হাতে চলে গেছে। তথাগত শ্রাবকরা গণসাম্যের দাবী করতে পারে, তার জন্য আন্দোলন করতে পারে, কিন্তু কাউকে উচ্চবর্ণ দান করবার ক্ষমতা একমাত্র ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া। ফলে রাজা ও সামন্তরাজ প্রভৃতি উচ্চবর্গের লোকেরা ব্রাহ্মণদের হাতে। যদি তথাগত শ্রাবকরা এখনও বোধিস্বত্বের পথ অর্থাৎ বহুজনহিতায় পন্থা গ্রহণ না করে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে তথাগতের ধর্ম এই দেশ থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

আমি বরাবর পিতার সঙ্গে আর্য-অসঙ্গের আশ্রমে যেতাম এবং তাঁর বাণী ও উপদেশ শুনতাম। তবে এখন একথা নিশ্চয় করে বলতে পারি না যে, উপরে উল্লিখিত সকল কথার সবটুকু বাল্য স্মৃতির অংশ অথবা পরবর্তী কালে আর্য-অসঙ্গের গ্রন্থাবলি থেকে আংশিক সংগ্রহ করা।

এই যাত্রার কিছুটা প্রভাব নিশ্চয় ছিল। তৎকালীন আলাপ আলোচনা বা আনুসঙ্গিক মেলামেশার ফলে এবং আর্য-অসঙ্গের বিহারে তাঁর উপদেশাবলী শুনে আমার মনে তথাগতের উপদেশ বা তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে আরও জানবার অদম্য উৎসাহ বা আকাঙ্খা জেগেছিল। পিতাও এ ব্যাপারে আমাকে প্রোৎসাহিত করতে লাগলেন। আর্য অসঙ্গ বললেন—বসুবন্ধু এখন প্রাচীদেশে বাস করছে, তোমার পুত্রকে শিক্ষার জন্য তাঁর কাছে পাঠিয়ে দাও।

সেই সময়ের আর্য অসঙ্গের অনেক উপদেশের মধ্যে একটি উপদেশ আমার স্মৃতিপটে আমরণ জেগে থাকবে। তিনি বলেছিলেন—কারও কথা ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস করো না, যতক্ষণ না নিজের অনুভব-

শক্তি, বিবেক বা বুদ্ধির তুলাদণ্ডে সঠিক বলে বুঝতে পারো। কালে কালে তাঁর এই উপদেশ আমার স্মৃতিপট থেকে মুছে যাওয়ার বদলে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

সে সময় আঙ্গুর ফলে পাক ধরেছে। লম্বা সোনালী রংয়ের দ্রাক্ষার থোকা দেখতে যেমন সুন্দর, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। আমি পাটলিপুত্রে কয়েকবার গান্ধারী সরস দ্রাক্ষা খেয়েছি, কিন্তু দ্রাক্ষাকুঞ্জে দ্রাক্ষা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে গুচ্ছ গুচ্ছ দ্রাক্ষা গাছ থেকে পেড়ে খাবার তুলনা হয় না। লাল লাল উডুম্বর প্রভৃতি নানাপ্রকার গান্ধারী ফল খেলাম যে সব ফলের গাছ এই প্রথম দেখলাম।

একথা বলতে পারি না যে যৌধেয় ভূমির চেয়ে গান্ধার ভূমি আমার কাছে ভালো লেগেছে, তবে সেখানকার জল, সেখানকার ফল অতিশয় সুস্বাদু লেগেছে।

পুরুষপুরে এসে অনেক কিছু নতুন জিনিস দেখলাম। অনেক নতুন নতুন জ্ঞান অর্জন করলাম এবং আমার চিন্তাধারা ও দৃষ্টিশক্তি প্রসারতা লাভ করল অনেকগুণ। সেখানকার সুন্দর সুন্দর রাস্তায় নানা দেশীয় লোকের ভীড়। নানাজাতীয় নর-নারী, তাদের রং বেরং-এর পোষাক, ভিন্ন-ভিন্ন চোখ মুখের গঠন এবং তাদের নানা-প্রকার মুখভাব আমি খুব মনোযোগী হয়ে দেখতাম।

একদিন আমি লাল মুখ কয়েকজন নর-নারীকে দেখলাম রাস্তার উপর। আমি প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট হলাম তাদের দিকে। অবশ্য শুধু তাদের লাল মুখ দেখেই আকৃষ্ট হইনি। তাদের চেহারার বৈশিষ্ট্য হল স্ত্রীদের মত পুরুষদেরও মুখ তেলের মত মসৃণ। দাড়ী-গোঁফের কোন চিহ্নমাত্র নেই। চোখের কোটরে একটা সরু পাতলা রেখামাত্র, আর গালের উপরের হাড়খানা এমন অস্বাভাবিক রকম উঁচু হয়ে আছে যে হঠাৎ চোখে পড়ে। তাদের বস্ত্র চামড়া দিয়ে তৈরী। লোমের দিকটা নিচে, কিন্তু স্ত্রীদের মাথার টুপিগুলোর লোম বাইরের দিকে দেখা যায়। দেখে অবাক হবার মতই চেহারা বা সাজ-পোষাক এদের। পরে জানতে পারলাম এরা

জাতিতে হুণ। ষাট যোজন দূর থেকে বাণিজ্য করতে এসেছে এখানে। পুরুষপুরে পারসীক জাতি অন্যান্যদের তুলনায় কিছু বেশীই বাস করত। আমরা যখন সেখানে ছিলাম সে-সময় দেবপুত্র শাহী পারসীক শাহানশাহের দরবারে গেছিলেন কার্যোদ্দেশে, তাই দেবপুত্র শাহীর দর্শন হল না। কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পুরুষপুর ছেড়ে আবার তক্ষশিলায় এলাম এবং সেখান থেকে অগ্রোদকায় ফিরে এলাম।

॥ চার ॥

শিক্ষা

বর্ষারম্ভের পূর্বেই আমি পাটলিপুত্র পৌঁছলাম। অজ্জুকা বার বার আমার গান্ধার যাত্রার নানা কাহিনী খুঁটিয়ে নাটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন এবং তাঁর সবচেয়ে বেশী আফশোষের কারণ হল যে আমাদের গান্ধার যাত্রার কথা আগে থেকে তিনি কিছুই জানতেন না। তাহলে তিনি ধর্মরাজিকা এবং পাত্রধাতুর পূজার জন্যে উপায়ন পাঠাতেন। আমি যখন বল্লাম যে পিতা তক্ষশিলায় দীপদানের জন্যে অক্ষয়নিবীকা দান করেছেন এবং পুণ্যের জন্য পিতা অজ্জুকা ও আমার নাম পাথরের উপর খোদাই করিয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হলেন।

পরে জানতে পারলাম যে আচার্য বসুবন্ধু বর্ষা-বাসের জন্য অশোকারামে এসে উঠেছেন। আমি অজ্জুকার কাছে পিতার সঙ্গে আর্য-অসঙ্গের যে-সব আলোচনা হয়েছিল সে-সব বল্লাম এবং অনুরোধ করলাম যেন আমাকে আচার্য বসুবন্ধুর কাছে লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা করতে। অজ্জুকা অবশ্য ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার আচার্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর উপদেশ শুনে এসেছেন। মনে মনে তিনি আচার্যের বিদ্যা এবং স্নিগ্ধ ব্যবহারের জন্য তাঁর উপর শ্রদ্ধাভাব পোষণ করতেন। অতঃপর আমার কথা শুনে পরমভট্টারক সমুদ্রগুপ্তের কাছে সে প্রস্তাব করলেন। পরমভট্টারক অজ্জুকার মুখে আচার্যের প্রশংসা শুনে মুচকী হেসে বল্লেন,—"তুমি নিজে আচার্যের শিষ্যা হয়েছ ; এবার বুঝি ঘরের সকলকে তাঁর চেলা বানিয়ে তুলবে ?" পরম ভট্টারকও মনে মনে আচার্যের উপর শ্রদ্ধাবান ছিলেন। হরিসেন-এর কাছে শুনেছিলেন যে আচার্য মহাকবি। তাছাড়া অন্যান্য

পণ্ডিতদের কাছেও আচার্যের পরিচয় জেনেছিলেন পরমভট্টারক। তার মধ্যে কেউ বলেন, আচার্য মহান তার্কিক, কেউ বলেন আচার্য সর্ব-শাস্ত্র-বিশারদ। অতঃপর পরমভট্টারক স্বয়ং গেলেন তাঁর কাছে এবং আচার্যকে পাটলিপুত্রে অবস্থান করবার জন্য অনুরোধ করলেন। অজ্জুকা কিন্তু আমার পড়বার বিষয়ে তাঁর পাকাপাকি মত দিতে পারলেন না হঠাৎ। তিনি কিছুদিন যাবৎ খুবই ভাবনায় পড়ে গেলেন। আমি তাঁর একমাত্র ভাই এবং পিতার একমাত্র পুত্র; তাঁর কেবলই ভয় হতে লাগল যে আচার্য বসুবন্ধুর কাছে শিক্ষালাভ করে আমি ভিক্ষু না হয়ে যাই। অবশ্য তিনি মনে-প্রাণে আচার্যকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন এবং জানতেন যে আচার্যের মত গুরু পাওয়া দুষ্কর।

সেদিন সকালে অজ্জুকা নিজের সঙ্গে খেতে ডাকলেন আমাকে। আমি গম্ভীর হয়ে বসলাম। আমার এক দুশ্চিন্তা ছিল যদি অজ্জুকা আচার্যের কাছে আমার শিক্ষার ব্যবস্থা করতে অমত করেন। খেতে খেতে অজ্জুকা আমাকে প্রশ্ন করলেন—জয়! তুমি কি আচার্যের কাছে বিদ্যালাভ করতে চাও?

আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে কী যে বলব বুঝে উঠতে না পেরে আদর করে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। নিজের মাথাটা রাখলাম তাঁর কাঁধের উপর এবং ধীরে ধীরে বল্লাম,—অজ্জুকা, তুমি যদি আজ্ঞা দাও তাহলে আমি নিশ্চয় যাবো আচার্যের কাছে শিক্ষালাভ করতে। পিতা ত আগেই বলে দিয়েছেন।

—বেশ! আমি স্থির করেছি যে তুমি আচার্যের কাছেই বিদ্যালাভ করতে যাবে। তাঁর মত গুরু পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। তবে আমি ভাবছি যে তোমার ঐ দুষ্টু ভাগনে চন্দ্রও তোমার সঙ্গে লেখাপড়া শিখবে। আমি আগামী দু-এক দিনের মধ্যে আচার্যের কাছে গিয়ে প্রার্থনা করব তিনি যাতে পাটলিপুত্রে থেকে তোমাদের শিক্ষাদানের ভার নেন। আমার মনে হয় তিনি নিশ্চয় রাজী হবেন।

সেই দিনই অজ্জুকা আচার্যের কাছে গেলেন। আচার্যের আন্তরিক· ইচ্ছা ছিল না একই স্থানে বেশীদিন কাটাতে, তবুও তিনি রাজী হলেন। অজ্জুকা তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বল্লেন,— ভদ্রে! আমি আপনাকে একই স্থানে বেঁধে রাখতে চাই না। আপনি এখানে অশোকারামে বা সাকেতের কালকারামে অথবা বৈশালী ও রাজগৃহের যে কোনও বিহারেই থাকুন না কেন আমার অনুজ জয় এবং পুত্র চন্দ্র আপনার অন্তেবাসী হয়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। আপনার কাছে শিক্ষা পেয়ে এবং আপনার সঙ্গলাভ করে ওরা যদি বুদ্ধ-শাসনের উপযুক্ত হতে পারে।

অতঃপর আষাঢ় পূর্ণিমা এলো। বর্ষাবরণের মহা-দানের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার সুরু হল। সেই পুণ্য লগনে আমি আর চন্দ্রগুপ্ত আচার্যের কাছে বিদ্যাশিক্ষার জন্যে গেলাম। শুরু হল আমাদের বিদ্যাশিক্ষার প্রথম সোপান। অবশ্য তার আগে যে নিরক্ষর ছিলাম তা নয়। দশ বৎসরের বালকের পক্ষে যতটা শিক্ষালাভ করা সম্ভব আমরা অবশ্য তার চেয়েও কিছু বেশীই শিখেছিলাম। যতটা শিখেছিলাম তার অধিকতর মাগধী ভাষায় শিখেছি। তার মধ্যে গদ্য-পদ্য, গণিত এবং সুলেখ-এর কিছু কিছু পাঠ শেষ করেছি মাত্র। সংস্কৃতে আমার জ্ঞান খুবই অল্প ছিল, একটু-আধটু বলতে পারতাম। অবশ্য তখন সংস্কৃতকে খুব কঠিন ভাষা বলে মনে হত, আর মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। আচার্য প্রথমেই আমাদের শিক্ষার পরিচয় নিলেন। তার পরও কিছুদিন কাটল, ততদিন আচার্য নানা উপায়ে আমাদের মনের অবস্থা এবং রুচির পরিচয় নিলেন।

বড় সুন্দর পদ্ধতিতে আমাদের শিক্ষার শুরু হল। আচার্য আমাদের জন্যেই "সপ্তকুমারিকাবদান" লিখলেন। সে সবের পাঠ গ্রহণ করতে আমাদের কোনই কষ্ট হত না। পড়তে পড়তে মনে হত যেন সেগুলি কোন পুরোনো পুঁথি থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মনে হত সেই সকল পাঠগুলি কত পরিচিত। যদিও সেগুলি আমাদেরই সামনে নতুন তালপত্রে নতুন কালি দিয়ে লেখা। সেই

সকল পাঠ স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর পদ্য সংযোজন করে গদ্যে লেখা। পরে জানতে পারলাম যে আমাদের শিক্ষাদানের জন্যেই তিনি নতুন পদ্ধতিতে ঐ নতুন রচনা করেছিলেন। অজ্জুকাও উৎসুক হয়ে থাকতেন আমাদের নতুন নতুন পাঠগুলি পড়বার জন্য। আচার্য আমাদের উদ্দেশ্যে যেই নতুন লিখতেন অমনি আগে অজ্জুকা একবার পড়ে নিতেন। তার মধ্যে থাকত সুন্দর গদ্য বা মধুর পদ্য এবং নানা বিষয়ে চমৎকার সব উপদেশ। ভাষা-লালিত্যের প্রতি অজ্জুকার লোভ ছিল চিরন্তন।

আমাদের পাঠ শেষ হলেই অজ্জুকা সেই সকল পাঠগুলি লেখকদের দ্বারা লিখিয়ে বহু সামন্ত-নগরীর শ্রম-শ্রেষ্ঠী স্বার্থবাহ বা কুলী রমণীদের পড়বার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। সেজন্য মহাদেবীর কাছ থেকে আচার্যের কাছে তাঁর নতুন নতুন অবদানের জন্য প্রায়ই তাগিদ আসতো। আমাদের পড়া শুরু হবার দুই তিন বৎসরের মধ্যেই আচার্য বসুবন্ধুর মহিমা অন্তঃপুরের অন্তরতম কোণ পর্যন্ত পৌঁছে গেল এবং আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল। এর আগে পর্যন্ত আচার্য বসুবন্ধু তর্ক-কর্কশ পাণ্ডিত্যের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, কিন্তু কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে তারই লেখনী থেকে অমন সব মধুর এবং সরস রচনা জন্ম নিতে পারে।

ভাষা সরল হবার জন্য আমার কাছে সংস্কৃতটা অনেকখানি সরল হয়ে এলো। আচার্য মধ্যে মধ্যে ব্যাকরণ এমন সুন্দর ভাবে বোঝাতেন যে আমাদের কোনও অসুবিধা না হয়। ব্যাকরণ শিক্ষা-পদ্ধতি এত সুন্দর ও সহজ ছিল যে তার মধ্যে রুক্ষভাব একেবারেই ছিল না। কখনও কখনও আমি সংস্কৃত এবং মাগধী ভাষার শব্দগুলির তুলনা করতাম এবং দুটি ভাষার উচ্চারণের ভেদ বা তফাৎ বার করবার চেষ্টা করতাম। আচার্য এ-সব লক্ষ্য করতেন। একদিন আচার্য তালপত্রে লেখা কিছু গদ্যকথা দিতে দিতে আমাকে বললেন—এই নাও আজ থেকে ছয় শত বৎসর পূর্বের মাগধী ভাষা। দেখেই আমি প্রথমটা হকচকিয়ে গেলাম। এ আবার কেমন মাগধী

ভাষা। কিন্তু তার দু-একটি গল্প পড়বার পর আমি প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলাম। মাঝে মাঝে দু-একজায়গায় আচার্যকে সাহায্য করতে হল। আমি প্রায় সব সময় চিন্তা করতাম ঐ মাগধী ভাষা নিয়ে, অতঃপর একদিন আচার্যকে বললাম,

—ভন্তে! আমার মনে হয় এই পুরাণো মাগধী ভাষা প্রায় আমাদের বর্তমান ভাষার মতই। তাছাড়া সংস্কৃতের সঙ্গেও সামঞ্জস্য রয়েছে অনেকখানি। হাসতে হাসতে আচার্য বললেন,

—হ্যাঁ বৎস ঠিকই বলেছ। বর্তমান মাগধী এবং সংস্কৃতের মধ্যবর্তী ভাষা ওটা।

—ভদন্ত! আচ্ছা মানুষ এই নিত্য নতুন ভাষার প্রচলন করে কেন? আমাদের মাগধী বা সংস্কৃত ভাষা ত ছিলই। এদেরও প্রচলন কোন দিক থেকে কম ছিল না ঐ পুরাণো মাগধীর চেয়ে। তবুও আবার ঐ মধ্যবর্তী ভাষা চালু করবার কি প্রয়োজন ছিল?

—তুমি কি মনে কর জয়, যে কোনও একজন মানুষ বসে একা একা একটি ভাষার সৃষ্টি করে? নতুন ভাষা কোন একজন বা দশজন মানুষের দ্বারা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। বংশ পরম্পরায় ক্রমশঃ একটি ভাষার সৃষ্টি হয়। যদি তুমি আজ থেকে দুইশত বৎসর আগে দিদিমার সঙ্গে কথা বলতে ত দেখতে পেতে যে তাঁর ভাষা আর তোমার মায়ের ভাষা এক নয়।

—তাহলে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বদলে যায়?

—হ্যাঁ বৎস! পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই নেই যার পরিবর্তন হয় না। আমি কোন এক সময় শিশু ছিলাম। তারপর তোমার মত কিশোর হলাম। ক্রমশঃ দাড়ি গোঁফ দেখা দিল। শরীর বাড়তে লাগল, বলিষ্ঠ হলাম আগের তুলনায়। আবার এখন চেয়ে দেখ। কখন যে চুপি চুপি বার্ধক্য এসে চেপে বসেছে এই দেহের উপর তা খেয়ালও করিনি। আজ দেখ আমার মুখে দুএকটি মাত্র দাঁত অবশিষ্ট রয়েছে। মাথার চুল প্রায় উঠে গেছে। আগের মত চোখে আর জ্যোতি নেই। অধিক সময় পর্যন্ত কিছুই পড়তে

পারি না। কোমরটা এখনও সোজা আছে কিন্তু আর কিছুদিন পর আর তাও থাকবে না, হয়ত কুঁজো হয়ে যাব। তাহলেই ভেবে দেখ শিশুকাল থেকে এই বার্ধক্য অবধি কত পরিবর্তন হয়েছে এ দেহের উপর।

—ভন্তে! যদি এই বৃদ্ধাবস্থা না হত তাহলে খুবই সুন্দর হত।

—তাহলে তুমি কি চিরদিন শিশু, কিশোর অথবা তরুণ অবস্থায় থাকতে চাও ?

—শিশুকালে নেহাত পরতন্ত্র হয়ে থাকতে হয়! কিশোরাবস্থাও খুব ভাল নয় কারণ তখনও শরীরের সম্পূর্ণ পুষ্টিসাধন হয় না, দুর্বল থাকে।

—তাহলে তুমি চির তরুণ হয়ে থাকতে পছন্দ কর ?

—হ্যাঁ।

—আর তরুণ অবস্থায়ই জন্মগ্রহণ করতে চাও ?

—এবার আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। হঠাৎ উত্তর দিতে পারলাম না। আমার মৌনাবস্থা লক্ষ্য করে আচার্য বললেন, "শোন! যদি তরুণাবস্থায় জন্মগ্রহণ করা সম্ভব হত তাহলে মাতার প্রয়োজন হত না। আর তরুণ-শরীর মাতৃগর্ভে ধারণ করাও অসম্ভব।

—তাহলে মায়ের প্রয়োজনই হয় না।

—হ্যাঁ বৎস!

—তাহলে কারো মাতৃস্নেহ মিলত না, মিলত না পিতার স্নেহ। সহোদর-সহোদরার অকৃত্রিম স্নেহ। সংসারে থাকতো না সৌহার্দ্যের প্রীতি ও স্নেহ।

—তাহলে ত পৃথিবী নীরস হয়ে যেত।

—হ্যাঁ। এমন নীরস হত যে স্নেহ, মায়া-মমতা সব কিছুই লুপ্ত হয়ে যেত। মাতা পিতা পুত্র কামনা করত না। বংশধরদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যেত। মানুষ বেঁচে থাকে বংশপরম্পরায়। অতএব আমার বা তোমার জন্মাবার আশা ছিল না। আর ঐ চির তারুণ্য শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না। পৃথিবী অচল হয়ে থাকত।

—অচল হয়ে থাকত?

—নিশ্চয়! আজ যেমন পরিবর্তনই বিশ্বের বিধান। তখন তেমনি অপরিবর্তন হত বিশ্বের বিধান। অতঃপর তখন কেবলমাত্র একটা ঋতুই থাকত। হয় গ্রীষ্ম, নয়ত বর্ষা, শীত বা বসন্ত যে কোন একটা চিরকাল থাকত অচল হয়ে।

—তাহলে ভন্তে। কোথাও নবীনতার ছাপ খুঁজেই পাওয়া যেত না।

—হ্যাঁ, নবীনতার নামই সৌন্দর্য। সৌন্দর্য লোপ পেত এ পৃথিবী থেকে। নবীনতাই মনের মোহিনী। পরিবর্তন আনে একঘেয়ে জীবনে। হেমন্তের পরে বসন্তের আগমনে প্রকৃতি নতুন পাতায়, ফুলে নতুন সাজে সজ্জিত হয়, কুঞ্জে কুঞ্জে জাগে বিহগের কল কাকলী। এ সব থেকে বঞ্চিতা হত পৃথিবী।

—কিন্তু পরিবর্তন না হলে আমাদের মরতে হত না।

—মৃত্যুকে ভয় পাও তুমি?

—নিজের মৃত্যুকে ভয় না পেলেও প্রিয়জনের বিয়োগ ব্যথায় মন কাতর হয়।

—মৃত্যুর এ এক অপ্রিয় রূপ। কিন্তু মৃত্যু না হলে নতুন জীবন মিলত না। মৃত্যু নবজীবন দান করে। নদীর উৎপত্তি মুখের স্রোতধারা কত ক্ষীণ ও কত শীর্ণ। কিন্তু যতই সামনে এগুতে থাকে, ততই সেই স্রোতধারা বিস্তৃত এবং গম্ভীর আকার ধারণ করে। নদী যদি নিজের সেই ক্ষীণ শীর্ণ স্রোতধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত, এবং তার প্রবাহ না থাকত তাহলে তার সঙ্গে দুর্গন্ধময় নর্দমার কোন পার্থক্যই থাকত না।

—হ্যাঁ, প্রবাহ দ্বারাই নদী জল নির্মল হয়।

—হ্যাঁ এই পৃথিবী নিজের বিচরণ পথে, নিজের প্রবাহের মধ্যে, পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও অধিক বিচিত্র, অধিক মোহময় হয়ে ওঠে। এই বিশ্ব সংসারের প্রতি অণু পরমাণুতে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে, পলে পলে পরিবর্তন হচ্ছে। আমার বা তোমার মনের মধ্যেও

প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তন হচ্ছে। এই হল পৃথিবীর শাশ্বত নিয়ম। এ পরিবর্তন অহিতকর নয়। এখন ভেবে দেখ মাগধী ভাষা সংস্কৃতের চেয়ে কম মধুর নয়।

—না ভন্তে! আমার ত মনে হয় সংস্কৃতের চেয়ে মাগধী অধিক সরস। বিশেষ করে ভাস, সৌমিল্ল আদি কবিগণের মাগধী কবিতা অতি মধুর এবং সরস।

—সেই জন্যেই পরিবর্তনকে আমাদের স্বাগত জানাতে হয়। যেমম বসন্তকে যেমন ভ্রমরের গুঞ্জনকে, আমের নব মঞ্জরীকে স্বাগত জানাই আমরা। পরিবর্তনের নিয়মে সকলের বিবেক বুদ্ধি সর্বদা সক্রিয় থাকে। স্বাধীন থাকে। নিত্য নতুন আবিষ্কার করতে পারে। আর জগৎ যদি অপরিবর্তনশীল হত তাহলে সকলেই নিষ্ক্রিয় ও নিষ্কর্মা হয়ে থাকত। মানুষের অস্তিত্ব হত মূল্যহীন।

যে সময় আচার্য আমাকে ভাষার পরিবর্তন সম্বন্ধীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, তখন আমি একবারও বুঝতে পারিনি যে গল্পচ্ছলে তিনি জগতের এক অতি মূল্যবান সূক্ষ্ম দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দিচ্ছেন। যে দর্শন ভগবান বুদ্ধ বিশ্ববাসীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। বিশ্ব সংসারের সব কিছুই যে পরিবর্তন হচ্ছে এ কথার সত্যতা এখন আমি পদে পদে বুঝতে পারছি। আমি অশোকের আস্থান মণ্ডপ দেখেছি, কিন্তু তার গঠনপ্রণালী বা নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি অধুনা আস্থান মণ্ডপের চেয়ে একেবারে ভিন্ন। মহাবোধী বজ্রাসনের পাষাণ বেষ্টনী (বোধগয়া) দেখেছি। তার গায়ে উৎকীর্ণ নরনারীর মূর্তিগুলি দেখেছি। সে সময়ের নারীরা আজকালকার নারীদের মত কুন্তল পরত না। তখনকার কণ্ঠহার ছিল এখনকার মালার চেয়ে ভিন্নরূপ। কঙ্কণ এবং নূপুরের বদলে সারা হাত পা চুড়ি দিয়ে ভর্তি থাকত। বস্ত্র এবং উষ্ণীষ প্রভৃতি সব কিছুই ছিল ভিন্ন রকমের। তখনকার নারীরা মাথায় (পাগড়ী) পরত।

আচার্য আমাকে মহাকবি অশ্বঘোষের মহাকাব্য খুব যত্ন করে পড়াতেন। বুদ্ধচরিত এবং সৌন্দরানন্দ পড়তে আমার খুব ভাল লাগত। আমার কণ্ঠ খুব মধুর। পরম ভট্টারক স্বয়ং চতুর বীণাবাদক এবং সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন। প্রায় প্রত্যহই রাজপ্রাসাদে সঙ্গীতের আসর বসত। সঙ্গীত প্রেম আমার মধ্যেও যথেষ্ট ছিল এবং বীণাতে পূর্ণ আয়ত্ত রাখবার চেষ্টা করতাম।

তখন আমার বয়স তের বৎসর। একদিন আমি বীণাতে একটি সুন্দর গান বাজাতে চেষ্টা করছি। পরে দেখি এককান দুকান করে খবরটা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ভয় হতে লাগল। যদি এ খবর পরম ভট্টারক পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে থাকে তাহলে তাঁর সঙ্গীতের ফরমাশ পূরা করতে সারা সময় চলে যাবে এবং আচার্য বসুবন্ধুর কাছ থেকে যে অপার জ্ঞানরাশি অর্জন করছিলাম তা থেকে বঞ্চিত হতে হবে। সেই থেকে চন্দ্র এবং আমার সমবয়সী ছেলেমেয়ের সামনে ছাড়া আমি আর গান বাজনা করতাম না। পাটলিপুত্রের এক গুণী সঙ্গীতাচার্যের কাছে গিয়ে আমি নিত্য অভ্যাস করতাম এবং দিন দিন সঙ্গীত-বাদ্য বিদ্যায়ও পারদর্শী হয়ে উঠতে লাগলাম।

তখন মূর্তিকলার দিকে আমার খুব ঝোঁক চাপল। কোন ভাল মূর্তি বা রেখাচিত্র দেখলেই আমি তার দিকে আকৃষ্ট হতাম। ছবিগুলির চিত্তাকর্ষক রং বারবার আমাকে সেইদিকে আকর্ষণ করত। চতুরিকা নাম্নী একজন পরিচারিকা ছিল অজ্জুকার, চমৎকার চিত্র আঁকত। আমি প্রায়ই তার পাশে বসে তার চিত্রাঙ্কন দেখতাম। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম তার দিকে, পটের উপর লেপ লাগিয়ে ছায়ায় শুকাতো, তারপর হালকা রংয়ের রেখা টেনে শরীরের একটি একটি অবয়ব আঁকত। তারপর দিনের পর দিন বসে নানারকম রং দিয়ে সেগুলিকে জীবন্ত রূপ দিত। আমি শুধু দেখতাম আর ভাবতাম চতুরিকার গুণের কথা। চতুরিকাও আমাকে যথেষ্ট সম্মান করত। শুধু ভট্টিনীর ভাই বলেই যে আমাকে সম্মান করত

তা নয়, আমার সহানুভূতিপূর্ণ সরল ব্যবহারের জন্যই আমি ওর সবচেয়ে বেশী প্রিয়পাত্র ছিলাম।

ছবি অঙ্কনের সময় চতুরিকার পার্থিব জ্ঞান থাকত না। তন্ময় হয়ে তুলি টানত পটের উপর। আর সেই কাজের জন্য প্রমোদবন, ক্রীড়াপর্বত বা ধারাগৃহ কোথাও তার মন টিকত না, তাই চতুরিকা আমার ঘরে বসেই চিত্রাঙ্কণ করত। আমার ঘরের মত নিরালা ঘর সমগ্র রাজপ্রাসাদে কোথাও ছিল না। এমন কি এখানে তার কোন সখীরাও তাকে খুঁজতে আসত না। একমাত্র নির্বাক দর্শক আমিই তার পাশে বসে থাকতাম। চতুরিকার তাই ছিল না কোনও অসুবিধা। সাদা পটের উপর ক্রমশঃ জীবন্ত হয়ে উঠত মূর্তি, তার নিপুণ হাতের তুলির টানে। আমি কখনও সখনও অবসর সময়ে দু-একটি প্রশংসা-বাক্য উচ্চারণ করতাম। চতুরিকা লজ্জাবনত চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখতো শুধু, তারপর আবার ডুবে যেত তার সাধনায়। চতুরিকার সৃষ্টি দেখে আমার লোভ হত, কিন্তু তুলি ধারণে ও আমার চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী। তাই প্রায়ই মনে হত আমিও একটা কিছু সৃষ্টি করে ওকে দেখাই। অগত্যা নগরীর নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে কুশলী শিল্পিদের কাজ দেখতে লাগলাম। কোথাও দেখলাম কুশল তক্ষক চন্দন বা অন্যান্য কাঠের উপর নানা-প্রকার ফুল, লতাপাতা, মূর্তি তৈরী করছে, কোথাও দেখলাম দন্তকার শিল্পী হাতীর দাঁতের সুন্দর মূর্তি তৈরী করছে, কোথাও মাথুর-শিল্পীরা পাথর খোদাই করে মূর্তি বানাচ্ছে। মনে মনে ঠিক করলাম এই তিন শিল্পের যে কোনও একটি শিখে চতুরিকাকে অবাক করে দেব। অবশেষে লুকিয়ে লুকিয়ে শিল্পাচার্যের কাছে যাওয়া আরম্ভ করলাম।

যদিও আচার্য বসুবন্ধুর কাছে শিক্ষাগ্রহণই প্রধান কাজ এবং লক্ষ্য ছিল আমার, কিন্তু যতটুকু অবসর পেতাম ততটুকু সময় আমি শিল্পাচার্যের কাছে যেতাম। চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে খেলাধূলা করবার আর সময় পেতাম না। তবে বিশেষ বিশেষ সময় ওর অভিন্নহৃদয় সহচর

হতেই হত। এ ব্যাপারটা চন্দ্রও লক্ষ্য করছিল। আগের মত আমি ওর সঙ্গে সময় কাটাই না। অগত্যা বীরসেন-এর সঙ্গে চন্দ্রর সখ্যতা বেড়ে গেল।

প্রথমে কাঠের উপর মূর্তি খোদাই করে খানিকটা তৈরী হয়ে নিয়ে হাতির দাঁতের খোদাই আরম্ভ করলাম, অবশেষে পাথর খোদাই শিল্পই আমার পছন্দ হল। নিজের হাতে পাথরের মূর্তিকে মোমের মত গালিয়ে কোন এক বিশেষ ঢংএর সৌন্দর্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করায় ভীষণ আনন্দ পেতাম, গর্বে বুকটা ফুলে ফুলে উঠত।

এমনি করে চার পাঁচ বৎসর সন্ধ্যার সময় কিছুক্ষণের জন্য পালিয়ে যেতাম সকলের চোখের আড়ালে। কেউ জানত না সে কথা। বছর পাঁচেকের মধ্যে মূর্তিকলায় বেশ খানিকটা পারদর্শিতা অর্জন করলাম, এমন সময় শুনলাম কয়েকজন যবন মূর্তিকারের কথা; যারা হুবহু মানুষের মূর্তি উৎকীর্ণ করতে পারে পাথর কেটে। মাথুর মূর্তিকাররা কম ছিল না, তাদের মূর্তির আকৃতি, মূর্তির পরিহিত কাপড়ের ভাঁজ এবং সূক্ষ্মতায় তারা অদ্বিতীয় ছিল, কিন্তু সে-সব মূর্তি ছিল কল্পিত। কারও হুবহু চেহারা পাষাণের বুকে খোদাই করতে পারতো না তারা। আমি একদিন যবন মূর্তিকারের কাছে গেলাম। মাথুর শিল্পাচার্য মহাশয় ছিলেন আমার সঙ্গে। সেখানে পরমভট্টারকের এক অসম্পূর্ণ মূর্তি দেখলাম। মুখাকৃতি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বাকী সবটাই বাকী রয়েছে। আশ্চর্য হলাম সেইটুকুর মধ্যে অদ্ভুত মিল দেখে। নাকের বয়ান, চিবুকের খাঁজ কপালের উঁচু নিচু জায়গাগুলি, চোখ প্রভৃতি দেখে অবাক বিস্ময়ে সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম এবং ভাবতে লাগলাম যে, যদি এই বিদ্যা আমি শিখতে পারতাম তাহলে নিশ্চয় চতুরিকাকে তাক লাগিয়ে দিতে পারতাম।

সুখের বিষয়, সে সুযোগ লাভ করতে আমাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। যবন মূর্তিকার আচার্য আমার পরিচয় না জেনেই শুধুমাত্র আমার পূর্বেকার তৈরী কয়েকটি মূর্তি দেখে আমাকে শিষ্য করে নিলেন। আমার সাধনা শুরু হল।

কয়েক মাস অবশ্য অন্যান্য কাজে কিছু কিছু বাধা পড়লো। শুধুমাত্র পাঠের সময় আচার্য বসুবন্ধুর কাছে উপস্থিত থাকতাম। তারপর বাকী সময় আর ওদিকে নজর দেবার সময় পেলাম না। যবন শিল্পাচার্য সামনে সজীব মূর্তি রেখে প্রথমে মাটি দিয়ে মূর্তি তৈরী শেখাতে লাগলেন। তারপর সেই মাটির মূর্তির আকারে পাথর খোদাই করে হুবহু নকল করতে হবে। মাটির কাজটা শিখতে অবশ্য প্রথম প্রথম আমার বেশ কষ্ট হল। তারপর একদিন এক ভিখারির মূর্তি তৈরী করে যখন শিল্পাচার্যকে দেখালাম এবং তাঁর কাছ থেকে প্রশংসা পেলাম তখন আমার যে কী আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তখন কেবলি এই ভেবে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল যে এবার নিশ্চয় চতুরিকাকে পরাজিত ও বিস্মিত করে দিতে পারব।

পরদিনই চতুরিকাকে দেখলাম আমার ঘরে একটি পটে বসন্ত এবং বিরহিণীর ছবি আঁকছে। বহুক্ষণ আমার ঘরে একলা বসে তন্ময় হয়ে নিজের কাজ করছিল চতুরিকা। সেই সুযোগে তার অলক্ষ্যে আমি মাটি দিয়ে তার মূর্তির নমুনা তৈরী করে ফেললাম। তার কিছুদিনের মধ্যেই পাথরের মূর্তি তৈরী শেষ করে ফেল্লাম এবং মূর্তিটা আমার ঘরের এককোণে এনে ঢেকে রাখলাম। মতলব আঁটতে লাগলাম, কি উপায়ে চতুরিকাকে সেটা দেখানো যায়। অবশেষে কুরভককে মনে পড়ল। তখন চাঁদনী রাত, কুরভক তার সেই পূর্বস্মৃতি এখনও ভুলতে পারেনি। এখনও চাঁদনী রাতে ক্রীড়া পর্বতে গিয়ে তার অপ্সরার জন্যে আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মাঝে মাঝে।

আমি কুরভকের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি, এখনও তোমার অপ্সরা এলো না?

আমার উপর কুরভকের ধারণা ভালই ছিল, কারণ দেখা হলেই আমি তার বিরহে সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করতাম। ওকে উদাস দেখে বললাম,—"কুরভক! আমাদের দুজনেরি অদৃষ্ট মন্দ। তুমি যার সঙ্গে প্রেম করলে সে অপ্সরা হয়ে আকাশে বিলীন হয়ে গেল,

আর আমি যাকে ভালবাসলাম সে পাষাণ হয়ে গেল। আমার কথায় কুরভকের মনটা করুণায় ভরে উঠল, আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে এলাম এবং মূর্তিটি দেখিয়ে বল্লাম, দেখ এও একজন অপ্সরা ছিল, মানুষকে ভালবাসার অপরাধে পাষাণ হয়ে গেল।

—তাহলে ভর্তৃদারক! আমার মত তোমারও নিশ্চয় রাত্রে ঘুম হয় না।

—আর বলো না ভদ্র কুরভক! একটিমাত্র আশায় এখনও বুক বেঁধে আছি, নইলে আমার জীবন তো মরুময় হয়ে গেছে।

—কী সে আশা?

—যদি কোন সুন্দরী তুলিকাধারিণী তার তুলি দিয়ে ঐ মূর্তি স্পর্শ করে তাহলে ঐ মূর্তি আবার সজীব হতে পারে। নতুবা তোমার যেমন ক্রীড়াপর্বতই জীবনের সার, তেমনি আমারও জীবনের সার হবে ঐ পাষাণ প্রতিমার পদতলে পড়ে থাকা।

কুরভকের সঙ্গে অভিনয় করলাম চমৎকার। দুঃখের কথা বলতে বলতে বিরহ বেদনায় যেন আমার কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এলো। কুরভক নানাপ্রকার সান্ত্বনা দিয়ে প্রশ্ন করল আমায়,

—ভট্টারিকার পরিজনদের মধ্যে কেউ তুলিকাধারিণী আছেন কী?

—থাকতে পারে, কিন্তু কারুর কাছে এই কথা বলে আমি তাদের পরিহাসের পাত্র হতে চাই না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুরভক বলল,—ভর্তৃদারক! আমি তোমার বেদনা অনুভব করতে পারি, আমিও একজন ভুক্তভোগী।

—ভদ্র! খুব সাবধান, এ রহস্য যেন প্রকাশ না পায়। আমার অনুপস্থিতিতে যদি কোন শ্রেষ্ঠা সুন্দরী, তরুণী, তুলিকা-ধারিণীকে দিয়ে তার তুলি দ্বারা এই মূর্তি স্পর্শ করাতে পারো তাহলে সারা জীবন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

পরদিন হঠাৎ আমার ঘরে ঢুকে দেখলাম, চতুরিকা অবাক বিস্ময়ে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ধীর পায়ে চতুরিকার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

চতুরিকা চোখ তুলে তাকাল প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে। চতুরিকার চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম, কিছু যেন বলতে চায় আমাকে। সে চাহনির তুলনা হয় না। আমিও অপলক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণের জন্য তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। যদিও আমি জানতাম যে চতুরিকা কি জানতে চাইবে, তাই ওর জিজ্ঞাসা করবার আগেই আমি বল্লাম,

—যবন মূর্তিকার এই মূর্তিটিকে সাগর পার থেকে নিয়ে এসেছে, দেখে ভালো লাগলো তাই সহস্র দীনার দিয়ে কিনে আনলাম। চতুরিকা বিশ্বাস করল না। মৃদু হাসল। বললে, যবন মূর্তিকারের হাতের মূর্তি এ নয়। এ মূর্তি কিনতে পাওয়া যায় না। চতুরিকার অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। আমি সব কথা খুলেই বললাম,

—এ তোমারই প্রসাদ চতুরিকা! তুমিই আমার মনে এই কলাপ্রেমের প্রেরণা জাগিয়েছিলে। কিন্তু এ রহস্য যেন আর কেউ জানতে না পারে।

এবার চতুরিকার পালা। আমার কথা শুনে মনটা ওর খুশীতে ভরে উঠল। আর একবার ভালো করে মূর্তিটা নিরীক্ষণ করে বললো,
—বেশ, কিন্তু কখনও যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে তোমার মূর্তি কে গড়ল, তাহলে কী বলব?

—বলো, কে তৈরী করেছে তা জানি না, তবে আমি যখন গঙ্গাতটে বসে ছিলাম, সেই সময়ই কেউ আমার মূর্তি গড়েছে।

অতঃপর চতুরিকা নিঃশব্দে মাথা নিচু করে চলে গেল। ওর চলন দেখে মনে হল ও যেন আরও কিছু বলতে চায়।

যদিও সঙ্গীত এবং মূর্তিকলার দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল কিন্তু সে শুধু শেখবার জন্যেই। বাকী সারা সময় আচার্য বসুবন্ধুর কাছে শিক্ষার জন্য ব্যয় করতাম। অজ্জুকা আমার উপর সবিশেষ প্রসন্ন ছিলেন, কারণ আচার্য তাঁর কাছে আমার প্রশংসা করতেন। অজ্জুকা সেই আনন্দের আতিশয্যে পিতার কাছে চিঠি লিখলেন, চিঠি পেয়ে পিতা উত্তরে লিখলেন, আমাকে তাঁর দেখতে ইচ্ছা করে, সম্ভবমত একবার অগ্রোদকায় যেতে।

॥ পাঁচ ॥

রাজকুল

চন্দ্র আর আমি পনের বৎসরে পদার্পণ করলাম। দুজনেরই শিক্ষা সমানে এগিয়ে চলেছে। তবে চন্দ্রগুপ্তর সখ হল সাহিত্যের উপর সবচেয়ে বেশী। একমাত্র সাহিত্য ছাড়া আর সবকিছু ওর কাছে শুষ্ক মনে হত। এই সময় আচার্য মহাকবি অশ্বঘোষ রচিত নাটক 'সারিপুত্ত প্রকরণ' এবং 'রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা' পড়ালেন। তারপর থেকেই চন্দ্রগুপ্তর ঝোঁক চাপল অভিনয় করবার দিকে। তার জন্য "রাষ্ট্রপাল পরিপৃচ্ছা" নাটক মনোনীত করল। মাসের পর মাস ধরে প্রস্তুতি চললো। দৃশ্যের পর্দা তৈরী হল, অভিনয়ের স্থান নির্বাচিত হল। ভূমিকাগুলি সকলের মধ্যে বণ্টন করে প্রতিদিন মহলা দিয়ে প্রস্তুত হয়ে নিল। অভিনয়ের দিন সকলে নিমন্ত্রিত হল, শুধু অজ্জুকাকে নিমন্ত্রণ দেওয়া হল না, কারণ চন্দ্র নিজের খেয়ালমত নাটকের বিষয়-বস্তুর কিছু কিছু বাদ দিয়ে আরও বেশী শৃঙ্গার রসাত্মক করে তুলেছে। রাষ্ট্রপালের ভূমিকায় আমি নামতে বাধ্য হলাম চন্দ্রের অনুরোধে। চন্দ্রগুপ্ত রাষ্ট্রপালের পিতা, প্রধান নায়িকা চতুরিকা।

যথাসময়ে পর্দা উঠতে দেখা গেল রাষ্ট্রপালের বাড়ীর সামনে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষাপাত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। রাষ্ট্রপালের মাতা দরজা খুলেই চীৎকার করে উঠলেন রাগে,

—যত সব! এই সকল ভিক্ষুরা আমার বাছাকে সংসার ত্যাগী করেছে, রাজসুখ থেকে বঞ্চিত করেছে, সমগ্র সংসারটিকে দুঃখের সাগরে ডুবিয়ে দিয়েছে।

রাষ্ট্রপালের মাতা দরজা বন্ধ করে ভিতরে চলে গেলেন। ভিক্ষুবেশী রাষ্ট্রপাল মুচকী হাসল। দীর্ঘ চার পাঁচ বৎসর পরে নিজের

বাড়ীর অবস্থা পরিদর্শন করতে এসেছিল, তার গর্ভধারিণী মা তাকে চিনতে পারেনি। রাষ্ট্রপাল চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতে যাবে, এমন সময় আবার দরজা খুলে গেল এবং দেখা গেল এক দাসী বাসী ডাল ফেলতে যাচ্ছে। তখন রাষ্ট্রপাল দাসীকে উদ্দেশ করে বললো,

—ভগ্নী! ওগুলি ফেলেই দেবে যদি, তাহলে আমার পাত্রে ঢেলে দাও। অগত্যা দাসী রাষ্ট্রপালের পাত্রে ডাল ঢেলে দিয়ে চলে গেল কিন্তু রাষ্ট্রপালের কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারল যে সেই ভিক্ষু তার প্রভুপুত্র। দাসী তৎক্ষণাৎ তার প্রভুকে গিয়ে সংবাদ দিল এবং রাষ্ট্রপালের পিতা এসে আদর করে রাষ্ট্রপালকে ঘরে নিয়ে গেল এবং গৃহে থাকতে অনুরোধ করল।

চন্দ্রগুপ্ত আমার চেয়ে নিঃসন্দেহ ভালো অভিনয় করছিল। আমার কেবলই ভয় করছিল যদি কোথাও ভুল করে ফেলি।

অতঃপর অন্যান্য দৃশ্যগুলি কোনপ্রকারে শেষ হল। এবার শেষ দৃশ্য শুরু হল।

পরদিন। নিমন্ত্রিত রাষ্ট্রপালের সামনে সোনার থালায় নানা-প্রকার সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সাজানো রয়েছে। তাছাড়া তার সামনে রাশি রাশি হীরা, মুক্তা, সোনা-দানা প্রভৃতি স্তূপাকার করে রাখা। মা পুত্রবধূকে ডেকে বল্লেন,

—বধূরাণী, তুমি যাও এবার ওর কাছে। ভালো করে শৃঙ্গার করে নাও। সেই সকল বস্ত্র-ভূষণাদি দিয়ে রূপসজ্জা কর, যেগুলি আগে ও পছন্দ করত।

চতুরিকা এমনিতে সুন্দরী, তার উপর আবার অত সজ্জা। রূপ যেন উপচে পড়ছে, সে রূপের দিকে তাকানো যায় না। লজ্জাবনত নেত্রে ধীরে ধীরে আমার কাছে এসে বললো,

—আর্যপুত্র! যে অপ্সরার জন্যে তুমি এই কঠিন সাধনা করছ সে দেখতে কেমন?

রাষ্ট্রপাল পূর্ণ বৈরাগ্যভাব দেখিয়ে বলল,

—ভগিনী! আমি অপ্সরার জন্য তপস্যা করছি না।

এই শব্দ উচ্চারণ করতেই আমার বুকের মধ্যে ধ্বক করে যেন একটা বিদ্যুতের শিহরণ খেলে গেল। চমকে উঠলাম আমি। কারণ চতুরিকাকে আমি ভালবাসি। সেও আমাকে ভালবাসে। যদিও এ কৈশোরের প্রথম প্রেম, তবুও দুজনের অজান্তে আমরা এক মধুর বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু চতুরিকা অতখানি খেয়াল করেনি। চতুরিকা রাজ অন্তঃপুরের পরিচারিকা, শুধু মাত্র ভট্টাকর এবং ভট্টারক পরিবারের পুরুষদেরই অধিকার আছে চতুরিকার উপর। তবুও আমার মন ক্রমশঃ চঞ্চল হয়ে উঠছিল, ভয় হচ্ছিল, হয়ত অভিনয়ে ভুল করে ফেলব।

কোনপ্রকারে নাটক শেষ হল সেদিন। কিন্তু অভিনয়ের সাফল্যের উপর চন্দ্র'র বিশেষ একটা আনন্দভাব দেখা গেল না, আলোচনা করতে করতে ও নিজের অভিমত আমাকে শোনাল,—আচ্ছা জয়!· এই সব কবিদের কি বলা যায় বলতে পারো? একদিকে অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে এই কবি, আবার দেখ অপর দিকে তাকে ধূলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছে, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে। যদি বৈরাগ্যই দেখানোর উদ্দেশ্য ছিল, তাহলে এমন মধুর সৌন্দর্য সৃষ্টির কী প্রয়োজন ছিল।

—আমিও তোমার সঙ্গে সহমত চন্দ্র! আমার মতে যেখানে যোগ-বৈরাগ্যের কথা, সেখানে সৌন্দর্য-ঐশ্বর্যের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

—আমার মনে হয় কবিদের এই রকম মনোভাব আত্মবিরোধী। তাঁদের আসল উদ্দেশ্য হল ভোগ এবং শৃঙ্গার-এর রূপ-চিত্রণ। আর ঐ যোগ-বৈরাগ্যগুলি তার একটা আবরণ।

—আসল ব্যাপারটা হল যদি কিছুটা সৌন্দর্য, শৃঙ্গার প্রভৃতি না রাখা যায়, তাহলে শুধুমাত্র নীরস বৈরাগ্য দেখবার দর্শক খুবই কম পাওয়া যায়।

এবারকার নাটক অভিনয়ে চন্দ্রের মন উঠল না। পরবর্তী অভিনয়ের জন্য এমন নাটক ঠিক করবে যার মধ্যে জীবনের মদিরা

কানায় কানায় পূর্ণ থাকবে। এবং নিজে হবে তার নায়ক। অতঃপর "ভাস" ও "সৌমিল্ল" রচিত নাটক পছন্দ করল চন্দ্রগুপ্ত। "চারুদত্ত" নামক নাটক ঠিক হল শেষ পর্যন্ত। চারুদত্তের ভূমিকায় চন্দ্র নিজেকে মনোনীত করল।

কৈশোর ছাড়িয়ে এবার আমরা যৌবনে পদার্পণ করলাম। এ বয়সে পৃথিবীর রং পাল্টায়। চিন্তাধারা রঙ্গিন হয়। ভোগবাসনা বর্দ্ধিত হয় শতগুণে। রাজান্তঃপুরে ভোগ সামগ্রীর অভাব নেই, চারিদিকে শুধু ভোগ আর বিলাস। বিশেষ করে রাজকুমারদের ত কথাই নেই। অন্যের মত বিবাহ অবধি প্রণয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। অন্তঃপুরে নারীর অভাব নেই। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদে শুধু চন্দ্রগুপ্তের সেবার জন্যই বিশজন সুন্দরী নারী ছিল। যৌবনের আলো চোখে পড়তেই চন্দ্রের মন চঞ্চল হয়ে উঠল রঙ্গীন নেশায়। অমন অপ্সরার মত সুন্দরী রমণীর প্রেমের তুলনায় আচার্য বসুবন্ধুর নীরস শিক্ষা তার আর ভালো লাগল না। চন্দ্রগুপ্ত নারী আর মদিরা নিয়ে শুরু করল নতুন জীবন। নারীর মুখের কাব্য-নাটকই তার মধুর মনে হল। মদিরা আর মদিরেক্ষণা। অবশ্য তার এ রকম হওয়ার জন্য পরম ভট্টারকই দায়ী ছিলেন সর্বতোভাবে। একদিন হাসি-ঠাট্টা করতে করতে চন্দ্র বলে উঠল,

—দেখ দিকি জয়, বুড়ো বয়সে বুড়োর কাণ্ডগুলো। অন্তঃপুর হাজার হাজার সুন্দরী রমণীতে পূর্ণ, তবুও আজকাল আবার নিত্য নতুন কিশোরীদের সংগ্রহ করা হচ্ছে। বুড়োগুলোর যেন আর আশা মিটতে চায় না।

আমি চন্দ্রগুপ্তের মনের কথা সবই জানি। তবুও কথাটা ওর নেহাৎ ফেলবার নয়। উত্তরে বল্লাম,

—পরমভট্টারক নগদ ধর্মের উপাসক। যতদিন বাঁচো, খেয়ে পরে স্ফুর্তি করে নাও, জীবনটাকে উপভোগ করো শেষ নিশ্বাস অবধি।

—কথাটা অবশ্য ঠিকই, আমারও তাই মত। কী জানি পরজন্মে

আবার রাজার ঘরে জন্ম নিতে পারবো কিনা। যদি গরীব ঘরে জন্ম নিই, যদি নিচ যোনীতে জন্ম হয় তাহলে কোথায় পাবে এ সুখ। সেদিক দিয়ে বলতে গেলে আমি কৌটিল্যকে আমার গুরু বলে মানি।

—অর্থাৎ দেবতা এবং পরলোকবাদের পিছনে যারা ছুটে বেড়ায় তারা মূর্খ?

—আমার মনে হয় তাই। কিন্তু তাই বলে এমন কিছু বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যে জীবনের সকল আনন্দটুকু একদিনেই ডুবে যায়। দেখছ না পিতার অবস্থা? আজকাল রাজকার্যের দিকে একেবারে মন দেওয়ার ফুরসত পান না। এগুলি কিন্তু আমার খুব বিসদৃশ লাগে। ভগবান কৌটিল্য এতখানি বাড়াবাড়ি পছন্দ করতেন না।

—ও, তাহলে তুমি আজকাল কৌটিল্যের দলে ভিড়েছ?

—তা বলতে পারো! আমার জীবনে ভগবান কৌটিল্যের চেয়ে বড় পথ-প্রদর্শক আর কেউ নেই। প্রথম চন্দ্রগুপ্তেরও পথ-প্রদর্শক ছিলেন তিনি। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের মত এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও কৌটিল্যের প্রদর্শিত পথে চলবে, তাঁরই মতবাদ মানবে। তাঁর সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল, দেবতা এবং পরলোক চুলোয় থাক, এ পৃথিবীতে যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ শুধু এই পৃথিবীর কথা, বাস্তব জগতের কথাই চিন্তা করবে।

কৌটিল্য বলেছেন, শুধু নিজের চিন্তা করো।

—হ্যাঁ, নিজের এবং নিজের জনের।

নিজের জনের কথায় আমি হেসে ফেল্লাম। বল্লাম,

—রাজারা তো নিজের জনের কথা খুব চিন্তা করে। দেখছই ত সদাসর্বদা চিন্তা হল কবে পিতা মরবে আর তাড়াতাড়ি সিংহাসনে গিয়ে বসবে। বাপের চিতার আগুন নিভতে না নিভতেই নিজের স্বার্থে এক ভাই এসে অপর ভাইয়ের গলা কেটে নেবে।

গম্ভীর হয়ে এবার চন্দ্রগুপ্ত জবাব দিল,

—তা সত্যি। রাজলক্ষ্মী বলি চায়। যে নিজেকে উপযুক্ত প্রমাণ করতে পারে, তারই গলায় রাজলক্ষ্মী জয়মাল্য দেন।

—ও, তাহলে পৃথিবীর পার্থিব চিন্তার আর প্রয়োজন থাকছে না এই তো ?

—জয়! তুমি বসুবন্ধুর সকল তর্ক শিখে নিতে চাও, নাও। কিন্তু একথা জেনে রেখ যে, পৃথিবীতে তর্কের দ্বারা শাসন হয় না। শাসন করে তরবারী।

—হ্যাঁ, এখন দেখছি তরবারী দিয়েই ধনী হতে চাও এবং তার জন্য পুরোপুরি চেষ্টায় আছো।

—তা বলতে পারো। তরবারীর জোরেই আমি ধনী হবো এবং ধনীর মত ধনী হব। জেনে রেখ যে চন্দ্রগুপ্ত নামের মর্যাদা হানি হবে না আমাকে দিয়ে।

—তুমি ভাবতে পারো, কিন্তু আমার সন্দেহ হয়। যখন দেখি সূর্যাস্তের আগেই তুমি সুন্দরী রমণীদের ভিড়ে হারিয়ে যাও, পাত্রের পর পাত্র নিঃশেষে খালি করো।

—সন্দেহ করো না জয়। আমি খুব ভালোরকম জানি যে সুন্দরী রমণী আর সুরার পাত্র তাদেরই ভাগ্যে জোটে যাদের হাতে তীক্ষ্ণ তরবারী ধরবার ক্ষমতা আছে। সুরা ও সুন্দরীরও একটা সময় আছে। দেখেছ কখনও যে সময়ের পরে চন্দ্রগুপ্ত সুরা আর সুন্দরী নিয়ে মেতে আছে ?

—কিন্তু চন্দ্র! এখন মাত্র পনের বৎসর বয়স তোমার। এই কাঁচা বয়সে এত অধিক ব্যসন শরীর ও মনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক।

—আচ্ছা! তাহলে বসুবন্ধুর কাছ থেকে তুমি শুধু তর্কই নয়, উপদেশ দিতেও শিখেছ ?

—আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিও না চন্দ্র। তুমি কী জানো না যে পাণ্ডু রাজা এবং আরও অনেকে অতি ভোগের জন্যে তরুণ বয়সে যক্ষ্মা রোগের শিকার হয়েছিল ?

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তের পাশে পাশেই

তরুণ সুন্দরীদের গুঞ্জন ওঠে? শোনো জয়! রাজপ্রাসাদে সংযম বলে কোনও বস্তুর স্থান নেই। এখানকার আকাশ, বাতাস, মাটি সব কিছু কামনা বাসনায় পরিপূর্ণ। নিজের কথা ভেবে দেখ। এখানকার তরুণীরা তোমার কী বলে শুনতে পাও না? তারা বলে—'জয় সুন্দর, সবল তরুণ; তবুও কোন তরুণীর সঙ্গে কখনও একবার হেসে কথা বলে না। এটা কি লজ্জার কথা নয়, যে ঐ সব তরুণীরা তোমার মত সুপুরুষকে ষণ্ড বলে আখ্যা দেয়? কেন তুমি অমন করে থাকো? ভিক্ষু হবে বলে?

—না ভাই চন্দ্র। আমি যৌধেয় হয়েই থাকতে চাই। যৌধেয়দের অন্তঃপুর হাজার রমণীর কারাগার নয়।

—একে তুমি কারাগার বলছ? সুন্দরীদের জন্য এই নিত্য নতুন আনন্দ আয়োজন, এই স্বর্গসুখ তুমি কোথায় পাবে? এই নন্দনবন, ঐ কেলী-কুঞ্জ, ঐ স্ফটিক শুভ্র মর্মর প্রাসাদ, ঐ সূক্ষ্ম মসৃণ অঙ্গাবরণ, রত্ন-সুবর্ণ জড়িত ভূষণ, সুগন্ধি অঙ্গরাগ। এসব কি ঐ বন্দিনীদের পক্ষে সুলভ? তাহলে তো তোমার কাছে ইন্দ্রের অন্তঃপুরও কারাগার।

—না! ঐ সব সুন্দরীদের প্রত্যেকের যদি এক একজন পুরুষ থাকত, তাহলে আমি একে ইন্দ্রপুর বলতাম। কিন্তু তুমি নিজে জানো যে এই কর্পূরশ্বেত সৌধের মধ্যে অহরহ কত ধোঁয়া জ্বলছে। কত মর্মবেদনা পাষাণচাপা পড়ে গুঁমরে গুঁমরে কাঁদছে? এই সকল বন্দিনীদের পালিয়ে যাবারও রাস্তা নেই আর গেলেও আশ্রয় নেই। যেখানে গিয়ে তাদের জীবন ও মান রক্ষা করবে। রাজা এবং সমাজের বজ্র-কঠিন বাহুবেষ্টনী ভেদ করে পালানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, তাই বাধ্য হয়ে বেচারীরা মুখ বুঁজে পড়ে থাকে ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

—আমার সত্যিই আশ্চর্য লাগে জয়। আমি আর তুমি একই অন্তঃপুরে একই আবহাওয়ায় আজন্ম মানুষ হয়েছি, কিন্তু তুমি এমন নিষ্ঠুর হলে কি করে? নিষ্ঠুর কেন বললাম জানো? এটা

চতুরিকার কথা। তোমাকে সে ভালবাসে, তার সব কিছু উৎসর্গ করেছে তোমার জন্য।

—চন্দ্র, আমি এমন কথা বলছি না যে নারীর উপর আমার কোনও আকর্ষণ নেই, তবে আমরা এখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। সময় আসেনি এখনও, সারা জীবন সামনে রয়েছে ওসব ভাববার!

—কিন্তু চতুরিকা কায়মনোবাক্যে তোমাকে চায়, তার জীবনের একমাত্র আশা তুমি, তাকে হতাশ করো না।

—না চন্দ্র, অন্তঃপুরিকারা কখনও হতাশ হয় না।

—তাহলে তুমি ঐ সত্তর আশী বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ কঞ্চুকীদের কথা বলছ?

—আমার মতে আশী নব্বুই বৎসরের বৃদ্ধ হয়েও অন্তঃপুরের পক্ষে ততখানি সুরক্ষিত নয় যতখানি ভাবা যায়। তবুও আমি বৃদ্ধ কঞ্চুকীদের কথা ভাবছি না।

—তাহলে বাকী রইল ঐ কুঁজো, বামন পুরুষগুলো, ছিঃ ছিঃ এমন সব সুন্দরী তরুণীরা ঐ সব কুঁজো, বামন কুরূপ পুরুষদের দিকে থুথু ফেলবে মনে কর?

—তা যদি তুমি মনে করো যে তোমার ঐ সব সুন্দরী রূপসীদের আর কোনও পুরুষ না জোটে, তাহলে বামন, কুঁজোরাও প্রশ্রয় পায়। তখন থুথুর প্রশ্নই ওঠে না, প্রয়োজনের প্রশ্নটাই বড় হয়ে দেখা দেয়।

—কেন এই রাজপ্রাসাদে তোমার মত সুন্দর পুরুষ থাকতে নিরাশ হতে যাবে তারা?

—আমি আছি বলতে পারো, কিন্তু আমার সামনে রয়েছে আমার বিশাল ভবিষ্যৎ, আশা ভরসা।

—আচ্ছা জয়, তুমি তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু ভেবেছ?

—তা যদি না ভাবতাম তাহলে ভেবে দেখ যে সময় তুমি রঙমহলে একাধিক সুন্দরীর বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ হয়ে, রঙ্গীন সুরার পাত্রে একবার আর সুন্দরীর গোলাপ অধরে একবার চুম্বন করছ, তখন

আমি প্রদীপের সামনে বসে তালপত্রের পুঁথির দিকে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করছি। আমি জ্ঞান অর্জন করছি, সাধনার আসনে বসে সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করছি। সুস্থ শরীর ও সবল মন নিয়ে সেই সাধনার পথে এগিয়ে যেতে হবে।

—তারপর ?

—পরের কথা আমিও জানি না, তবে শুধু নিজের স্বার্থের জন্যে আমি এ সাধনা করছি না এটা ঠিক।

কিছুদূরে কতকগুলি সুন্দরী তরুণীকে দেখতে পেয়ে চন্দ্রগুপ্ত তর্ক বন্ধ করে সহসা উঠে দাঁড়ালো। তরুণীদের মধ্যে অগ্রশ্রেষ্ঠী গোপালের তরুণী কন্যা ভানুমতিকে দেখলাম।

* * *

এতদিন অনেক কিছুই মনে হত নিরর্থক, শুধু অনুকরণীয় বলে ভাবতাম। কিন্তু বয়সের ও শিক্ষার সঙ্গে সে সবের অর্থ এক এক করে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। রাজ অন্তঃপুর ত কামশাস্ত্রের খোলা-পাঠশালা, অতএব এখন অন্যান্য দিকগুলি জেনে নিই, শিখে নিই, তারপর ও বিদ্যার দিকে লক্ষ্য দিলেই চলবে। তাই বলে আমার যে ওদিকে কোন আসক্তি নেই এমন নয়। কিন্তু তবুও এত সব সৌন্দর্য, প্রলোভন সব কিছুর মধ্যে যেন একটা শূন্যতা অনুভব করতাম।

থাকবার জন্য আমারও একটা ভিন্ন প্রাসাদ ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেটা চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের পাশেই। আমার প্রাসাদে দৈবাৎ কখনও হয়ত অজ্জুকার কোনও কাজে দু-একজন পরিচারিকা এসে উপস্থিত হত, কিন্তু আমার দিক থেকে কোন উৎসাহ না পেয়ে কাজ সেরেই তারা পালিয়ে আসত। চতুরিকা মাঝে মাঝে এখনও আসে, ওর সঙ্গে আমি কখনও শুষ্ক ব্যবহার করিনি। তবুও চতুরিকা আমাকে নিষ্ঠুর ভাবে কেন, এ প্রশ্ন সদাই আমার মনকে পীড়া দিত। একদিন সামনে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, চতুরিকার উত্তরে আমি অবাক হলাম।

—আগে তোমার ঘরে বসে নিরালায় যখন আমি তন্ময় হয়ে চিত্রাঙ্কন করতাম, তখন সারাক্ষণ তুমি আমার পাশে বসে থাকতে, তোমার মধুর স্পর্শ দিয়ে আমার দেহকে পুলকিত করতে, কিন্তু এখন দৈবাৎ ভাগ্যবশে দু-একবার যদিবা চোখের দেখা দেখতে পাই, তুমি দূর থেকে হেসে সরে যাও। তবুও তোমার ঐ হাসিটুকুকে আমার সৌভাগ্য বলে মনে করি। কিন্তু কখন যে দ্বিতীয়ার চাঁদের মত সেটুকু লুপ্ত হয়ে যাবে তাই ভাবি। তাহলে আমার জীবনে আর কিছুই থাকবে না একেবারে শূন্য হয়ে যাবে।

আমি স্নেহভরে চতুরিকার কাঁধে হাত রেখে বললাম,

—চতুরিকা! তোমার জন্যে আমার হাসি কোনদিনও লুপ্ত হবে না। তোমার দেহকে পুলকিত করতে সব সময় আমি প্রস্তুত চতুরিকা, কিন্তু তুমি ত জান আজকাল সব সময় আমি পড়াশুনো নিয়ে ব্যস্ত থাকি। আচার্য বসুবন্ধুর কাছে জ্ঞানের অকুল ভাণ্ডার রয়েছে, তাঁর সেই ভাণ্ডার থেকে কিছু আহরণ করে নিতে চাই। দানে তাঁর কার্পণ্য নেই।

আমার স্নেহস্পর্শে চতুরিকার দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল, সে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। চোখের ভাষায় যথাসর্বস্ব নিবেদনের ইঙ্গিত। অনুনয় ভরা সে দৃষ্টি দেখলে পাষাণ গলে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো চতুরিকা,

—বিদ্যার্জন ত তুমি আগেও করতে, তখন ত এমন ছিলে না। তুমি নিশ্চয় আমার উপর কোন কারণে বিরক্ত হয়েছ।

—না চতুরিকা, এর মধ্যে বিরক্তের কথাই ওঠে না। তুমি আমার চেয়ে বয়সে বড়, তোমার কথা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্রে যতই এগিয়ে চলেছি ততই ক্ষেত্র প্রসারিত হচ্ছে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল চতুরিকা। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে মনের ভাব গোপন করতে চেষ্টা করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো,

—তাহলে তুমি আমাকে এখন বুড়ী ভাবো? তাই বলছ না কেন স্পষ্ট করে? কিন্তু কিছুদিন আগে আমি বুড়ী ছিলাম না, যখন দিন রাত তুমি ছেনী হাতুড়ী দিয়ে পাথর খোদাই করে আমার মূর্তি তৈরী করতে।

আমার হাসি পেল চতুরিকার অভিমানভরা মন্তব্য শুনে। ওর হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে এনে মৃদু চাপ দিয়ে বল্লাম—

—সুন্দরী, একমাত্র অন্ধ ব্যক্তিই তোমাকে বুড়ী বলবে। নবীন যৌবন, অনুপম সৌন্দর্য আর নানা গুণের অধিকারিণী তুমি। চতুরিকা, তোমার সঙ্গে প্রেম করে, তোমার প্রণয়-প্রার্থী হয়ে যদি সারাজীবন তোমাকে কাছে, একান্ত আপনার করে রাখতে পারতাম, তাহলে নিজেকে আমি ভাগ্যবান ভাবতাম। কিন্তু তা হবার নয়, হতে পারে না। কিছুদিন পর আমার পালক শক্ত হলে আমি নিশ্চয় উড়ে যাব আমার নিজের আলয়ে। তুমি কি রাজান্তঃপুরে সচরাচর যেমন প্রেমের লীলা অভিনয় হয় আমার সঙ্গেও তেমনি মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করতে চাও?

—তাই বা মন্দ কি? আমি রাজান্তঃপুরে জন্মেছি আর এইখানেই মানুষ হয়েছি।—চতুরিকার কাছে এমন কথা আশা করিনি আমি, অন্যান্য পরিচারিকার চেয়ে আমি ওকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখতাম। ওর মন্তব্যে মনে একটু আঘাত অনুভব করলাম, কিন্তু ওর মনের দিকে তাকিয়ে হেসে উত্তর দিলাম—

—বেশ, তাই হবে, কিন্তু এখন এত ব্যস্ত হবার কি আছে? যতক্ষণ পারি আচার্যের কাছ থেকে কিছু বিদ্যা সংগ্রহ করে নিই তারপর এসব কথা ভাবব।

—হুঁ, ততদিন তোমার পালক শক্ত হয়ে যাক আর তুমি আকাশের পাখী আকাশের বুকে পাড়ি জমাও। আর আমি অভাগিনী আকাশপানে চেয়ে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হই।

—একটা কথা মনে রেখ চতুরিকা, রাজান্তঃপুরের অন্যান্য পরিচারিকাদের চেয়ে তোমাকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখি, এবং

তোমার উপরই আমি একমাত্র অনুরক্ত। এখনও কয়েক বৎসর আমি নিশ্চয় পাটলিপুত্রেই থাকব কাজেই হতাশ হবার কোন কারণ নেই।

চতুরিকা নিঃশব্দে তার অধর যুগল আমার মুখের কাছে তুলে ধরে ধীরে ধীরে বললো,

—তাহলে তোমার একটি চুম্বনের প্রত্যাশা করতে পারি ?

আমি দ্বিধাশূন্য হয়ে মাথা নিচু করে দিলাম।

চতুরিকা প্রসন্নচিত্তে চলে গেল। কিন্তু আমার কুমার মনের অতল সমুদ্রে চিন্তার ঝড় উঠল। চুপ করে আসন্দীর (চেয়ার) উপর বসে ভাবতে লাগলাম। এমন সময় কুলুপা এসে আমাকে চিন্তান্বিত দেখে প্রশ্ন করল—শরীর ভালো আছে তো ?

জোর করে মনোভাব গোপন করবার চেষ্টা করে বল্লাম,

—না মা, শরীর ভালই আছে। কুলুপার মৃদু স্বভাবের জন্য ওকে আমি মা বলে ডাকতাম। তারপর যখন আমি ভিন্ন প্রাসাদ পেলাম, তখন অজ্জুকার কাছ থেকে কুলুপাকে চেয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু কুলুপার চেহারায় বিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে না পেয়ে আমি আলোচনার প্রসঙ্গ বদল করলাম।

—আচ্ছা মা! তোমাদের দেশেও কি এমনি রাজান্তঃপুর আছে ?

কুলুপা ধীরে ধীরে দীর্ঘশ্বাস চেপে বললো,

—ভতৃদারক! আমার দেশে কোনও রাজা নেই।

—তাহলে যৌধেয়দের মত তোমাদের কি গণশাসিত দেশ ?

—আগে তাই ছিল বটে। তারপর রাজার শাসন হল, এখন আর তাও নেই। এখন আমাদের দেশ রোম রাজার অধীন।

কুলুপার কথা শুনে আমার আগ্রহ আরও বেড়ে গেল। কারণ ভারতবর্ষে একমাত্র যৌধেয় জাতি ছাড়া আর কোথাও গণশাসন আছে বলে শুনিনি। তাই অপর দেশের গণতান্ত্রিক কাহিনী শুনতে ইচ্ছা হল খুব। বললাম, বলবে তোমার দেশের কথা ?

—সে আজ বহুদিনের কথা, নিজে চোখে কিছু দেখিনি, তবে শুনেছি অলসন্দরের (আলেকজাণ্ডার) পিতা আমাদের দেশের স্বাধীনতা হরণ করে নিজের রাজত্ব স্থাপন করে।

—অলসন্দর আলিকসুন্দর? যে ভারতের সীমা অবধি এসেছিল?

—হ্যাঁ, শুনেছি তার রাজত্বের সীমা নাকি উদয়-অস্ত পর্যন্ত ছিল।

—আচার্যের কাছে শুনেছি অশোকের দাদা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজা হবার কিছু আগে আলিকসুন্দর পুরুষপুর, তক্ষশিলা এবং আরও ভিতরে এসেছিল। কিন্তু তার সৈনিকদের মনোবল ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য উদয়াচল ত দূরের কথা, মথুরা পাটলিপুত্র পর্যন্ত পোঁছতে পরেনি! রাজা হিসেবে তিনি বড় ছিলেন নিঃসন্দেহ। তারপরেও অনেক যবন রাজা ভারতে এসেছে শাসনও করেছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত অতবড় রাজার বংশ একেবারে লোপ পেয়ে গেল?

—এ জগতে কার রাজত্ব চিরকাল স্থায়ী? আলিকসুন্দরের পরেও বহুদিন যাবত আমাদের দেশে অন্য রাজা রাজত্ব করেছে। তাদের সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা শুনিনি। আমাদের ভাষায় ইতিহাসের বহু গ্রন্থ আছে। কিন্তু সে সব কাহিনী আমি জানি না।

—গণরাজ্যের কোনও কাহিনী তোমার মনে নেই?

—আছে, কিন্তু সে সব স্ত্রীদের কাহিনী। আমি সে সব কথা একমাত্র স্ত্রীদেরই বলেছি।

—আমার কাছে বলতে যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বল, আমি শুনি।

—শোন বলছি। যদিও এটা আমার এক বন্ধুর কাছে শোনা। কোন এক সময় এক যবন কবি একখানি নাটক লিখেছিলেন। সেই বিচিত্র কাহিনী আমি বহুবার বহুলোককে শুনিয়েছি।

—আমাকে কখনও শোনাওনি। যত গল্প আমাকে শুনিয়েছ, সব পিশাচ-রাক্ষুসীর গল্প।

—শোনো। সে সময় এথেন্স মহানগরী ছিল যবন গণ-রাজ্যের রাজধানী। এথেন্স এখনও সমৃদ্ধশালী নগরী। সেখানকার নগর-

দেবীর নাম ছিল অথনা। আমার মেয়েও সেখানে জন্মগ্রহণ করেছিল বলে আমি তার নাম রেখেছিলাম অথনা।

—তাহলে তোমাদের দেশেও দেবীপূজা হয়?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে বহুদিন পূর্বে হত। এখন ত যবন, রোমক সকল জাতি ইশাই ধর্ম মানে (খৃষ্টান)। কিন্তু যীশু খৃষ্টের ধর্ম সেখানে পৌঁছুবার আগেই যবন জাতির ভাগ্যসূর্য মধ্যাহ্নে ঢলে পড়েছিল। সেই জন্যেই আজকালের যবন তখনকার এতটুকু স্মৃতি বড়ই যত্নের সঙ্গে সংগ্রহ করে এবং খুব সম্মানের চোখে দেখে।

—তোমার আসল গল্প কিন্তু বলা হচ্ছে না।

—হ্যাঁ এইবার বলছি। তখন এথেন্সের রাজ্য, প্রতি ঘরের মুখ্যদের নিয়ে সভা করত।

—আমাদের দেশেও হয়। এমনি করে যৌধেয়রাও রাজত্ব করে।

কুলুপা বিস্মিতা হয় আমার কথায়।

—তাহলে এখনও এমন রাজ্য আছে? আমি ত মনে করেছিলাম যে ভট্টিনী কোনও মহারাজপুত্রী হবেন।

—মহারাজ পুত্রীই বটে। তবে আমার পিতা এই রাজার মত রাজা নন। অথচ সম্মানে তিনি মহারাজা এবং মহাসেনাপতি অর্থাৎ গণের প্রধান ব্যক্তি পদবী হল পুরস্কর্তা।

—তাই বুঝি আমাদের ভট্টিনীর অমন মৃদু এবং কোমল স্বভাব। তাঁর চরিত্রে অহঙ্কার বলে কোনও বস্তুই দেখতে পাইনি আজ পর্যন্ত। তুমিও ঠিক তেমনি স্বভাবের হয়েছ।

—তোমার আসল গল্পের কি হল মা?

—হ্যাঁ এবার বলছি। এথেন্সের রাজ-কাজ সব গণ-সভা কর্তৃক পরিচালিত হত। সভার সকল সদস্য পুরুষ ছিল। তারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে লড়াই করত এবং বাইরের লড়াইতেও অংশ গ্রহণ করতো। এক সময় এথেন্সের স্ত্রীরা মনে করল পুরুষদের দিয়ে রাজত্ব করা সম্ভব নয়। রাজত্ব করবার যোগ্যতা নেই তাদের মধ্যে। তাদের মধ্যে স্ত্রীদের মত সহানুভূতি নেই, হৃদয়ে দয়া মায়া নেই।

অতএব যতদিন স্ত্রীদের হাতে শাসনভার না আসবে ততদিন দেশে সুখ-শান্তি আসবে না। চুপি চুপি রাজ্যের সকল স্ত্রীরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করল যে তারা স্বয়ং রাজ্যভার হাতে নেবে।

একদিন সে সুযোগও এলো। পুরুষরা সুরার নেশায় জ্ঞানহারা। সকলেই নাচ-গান আর সুরা নিয়ে ভুলে গেছে তাদের কর্তব্যের কথা। একে একে সকলেই ঘুমিয়ে পড়ল অলস দেহে। এমন সময় সকল স্ত্রীরা পুরুষদের দরবারী পোষাক পরে পুরুষের বেশে গণসভা-ভবনে উপস্থিত হল। দ্বাররক্ষী পোষাক দেখে তাদের সদস্য মনে করে দ্বার ছেড়ে দিল। ভবন-রক্ষক সভাভবনে সভার আয়োজন করলো। অতঃপর সকল স্ত্রীরা সভা করে নিজেদের মধ্যে গণপতি নির্বাচিত করল এবং প্রস্তাব গ্রহণ করল যে পুরুষেরা রাজ্যশাসনের অযোগ্য এবং আজ থেকে গণ শাসনের ভার স্ত্রীদের সমর্পণ করা হল। ব্যবস্থাপত্রে সকল ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হল এবং নগরের প্রতি চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং মুখ্য মুখ্য স্থানে সেই ব্যবস্থা পত্র সকল টাঙ্গিয়ে দেওয়া হল, তারপর স্ত্রীরা যে যার ঘরে ফিরে এল। পুরুষরা তখন পোষাক খুঁজছে। যাই হোক পোষাক তারা পেল, এবং সেগুলি পরে সভা-ভবনে এল, কিন্তু ভবন-রক্ষক তাদের সভা-ভবনে প্রবেশ করতে দিল না। ভবন-রক্ষক ঘোষণাপত্র পড়ে শুনিয়ে দিল। সে ঘোষণায় পুরুষদের শুধু রাজ্যশাসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়নি এমন কি রাজ্যের সকল খেত, খামার, জঙ্গল, বাড়ী সব কিছুর মালিক এখন থেকে সংযুক্ত গণ-পরিষদ। সারা এথেন্স এক পরিবার বলে গণ্য করা হবে এবং প্রত্যেক ঘরের উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের নিজের কাজ করতে বাধ্য করা হবে। সকলের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা গণ-পরিষদ করবে।

গল্প শুনে আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। এ এক অদ্ভুত গল্প। যৌধেয়গণের মধ্যেও গণ-পরিষদ শাসন করে। খেত খামারের মালিক গণ-পরিষদ কিন্তু প্রতি পরিবার পিছু যে সব জমিজমা ভাগ করে দেওয়া আছে তার সকল ফসল এবং নিজ নিজ ব্যবসা

বাণিজ্যের লাভ-লোকসান ব্যক্তি বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এমন আইন এই প্রথম শুনলাম যে খেত-খামারের সঙ্গে তার ফসলের মালিকও গণ-পরিষদ। ব্যবসা-বাণিজ্যের লাভালাভেরও মালিক গণ-পরিষদ। জনসাধারণের খাওয়া-পরবারও ব্যবস্থাপক গণ-পরিষদ। সাধারণ মানুষ শুধু শ্রমদান করেই খালাস।

এ চিন্তার একদিনে অবসান হওয়া সম্ভব নয়। পরে সময় মত ভেবে দেখব বলে ঠিক করলাম।

চতুরিকার ব্যবহারে মনের মধ্যে যে অবসাদটুকু এসেছিল, কুলুপার গল্প মনটাকে চাঙ্গা করে তুলল। কিন্তু রাজান্তঃপুরের বিষয়ে যে প্রশ্ন কুলুপাকে করেছিলাম তার উত্তর পেলাম না।

—মা তোমার গল্প সত্যিই খুব মনোরঞ্জক। কিন্তু স্ত্রীদের সে রাজত্ব কতদিন চলেছিল ?

—তা তো জানিনে বাছা। আমার শোনা কথা, এ কথার আদৌ কোন সত্যতা আছে কিনা তাও জানি না।

—সেখানকার রাজাদের কি এখানকার রাজার মত অন্তঃপুরে হাজার রাণী থাকত।

—অন্তঃপুর নিশ্চয় ছিল, কিন্তু হাজার রাণী ছিল না। একজনই রাণী থাকত রাজার। একের বেশী বিবাহ করবার নিয়ম ছিল না রাজার। যবন অথবা রোমকদের এই নিয়মকে ধর্মই বলো আর নীতিই বলো সেখানকার অতি সাধারণ মানুষরাও একাধিক বিবাহের কথা শুনলে চমকে উঠত, যেমন কোন স্ত্রী একাধিক পুরুষের সঙ্গে বিবাহের কথা শুনলে বিস্মিত হয়।

—খুব সুন্দর ব্যবস্থা ছিল তোমার দেশে। আমাদের দেশের রাজান্তঃপুর ত হাজার হাজার নারীর কারাগৃহ।

—কিন্তু নারী সেখানকার রাজ অন্তঃপুরেও হাজার হাজার থাকত, কিন্তু রাণী হিসেবে সম্মান পেত একজনই।

—তবুও সেখানকার জনসাধারণ রাজার উপর এতখানি অধিকার বিস্তার করেছিল যে রাজা ইচ্ছে করলেও একাধিক রাণী গ্রহণ করতে

পারতো না। হাজার স্ত্রী পরিচারিকা হিসেবে রাখা ত জন বৈভবের ক্ষমতার উপরই সম্ভব। যতক্ষণ কোন একজনের কাছে সকল ধন-বৈভব থাকবে ততক্ষণ নর-নারী বিক্রি হতে থাকবে। আমাদের দাস-দাসীদের মত তোমাদের দেশেও কি হাটে বাজারে মানুষ বিক্রি হয়?

—হ্যাঁ, ভত্তৃদারক। সেখানেও মানুষকে মনুষ্য শরীরধারী পশু মনে করে কেনা বেচা হয়। রাজান্তঃপুরের পরিচারক-পরিচারিকা ক্রীতদাস নয়, তারা অকৃতদাস। পরম ভট্টারক যদি এই সব খেয়াল না করেন তাহলে তারা রাজান্তঃপুর ছেড়ে বাইরে যেতে পারে এবং নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

—তাহলে সেখানকার রাজান্তঃপুরেও দিনরাত শুধু কামচর্চাই হয়ে থাকে? রাজা রাণী পরিচারিকা সকলেই কামালোচনা, কামুকতার প্রতিই সদা সর্বদা আকৃষ্ট হয়ে থাকেন?

—হ্যাঁ প্রায় তাই। তবে একজন মাত্র রাণী বলে রাজকুমার এবং রাজার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা কম, একেবারে নেই বললেই চলে, তাছাড়া আর সকল বিষয়ে এখানকার ওখানকার রাজান্তঃপুর একই।

—আচ্ছা মা। যদি কিছু মনে না করো তাহলে সেখানকার রাজান্তঃপুরের স্ত্রীদের সম্বন্ধে কিছু বলো।

—না বাবা মনে করবার কী আছে। এখানে বলো আর রোম দেশে বলো তরুণ বয়সে আমাকে এবং সকলকে প্রভুর ইচ্ছা পূরণ করতে হয়েছে এবং হয়। আর বয়স চলে গেলে দূতীর কাজ করতে হয় সকলকে, তা সে পুরুষের দিক থেকে হোক অথবা স্ত্রীদের দিক থেকে হোক। যদিও তুমি আমাকে কখনও কোন অনুরোধ বা আদেশ করনি, কিন্তু আমি জানি তোমার উপর রাজান্তঃপুরের বহু নারী আসক্তা। সাধারণ পরিচারিকা থেকে রাণী পর্যন্ত একাধিক সুন্দরী নারী তোমাকে পেতে চায়। তারা আমার কাছে তাদের মনের কথা প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। তাছাড়া রাজপ্রাসাদে লজ্জা সঙ্কোচের ত বালাই নেই।

—কী বললে, রাণীরা পর্যন্ত আমাকে দিয়ে তাদের কামবাসনা চরিতার্থ করতে চায়? আমার দিদির সতীন যারা এবং আমি যাদের আজ পর্যন্ত নিজের বোনের মত দেখে আসছি?

—তাতে কী হয়েছে। রাজঅন্তঃপুরে শুধু রক্তের সম্বন্ধটুকু মান্য করা হয়। এতে কোনও অন্যায় নেই! তুমিই বলো ভর্তৃদারক! সুন্দর, সবল যৌবন আর তার সামনে ভোগের বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে। কামদেবের পূজা কী শুধু বসন্তোৎসবের দিনই হয়? না, প্রতিদিন নিয়ত নৃত্য-গীত ও প্রেম সঙ্কীর্তন দ্বারা কামদেবের আরাধনা করা হয়। এই ভোগ মন্দিরের মধ্যে বাস করছে হাজার হাজার তরুণী নারী আর তাদের ভোগ বাসনা মেটাবার জন্য মাত্র একজন পুরুষ। পরম ভট্টারক যদি সকলের প্রতি সমদর্শিতা দেখান তাহলে তিন বৎসরে একদিন একজনের ভাগ্যে পুরুষ সমাগম সম্ভব হয় তারপর অন্তঃপুরিকাদের কথা বাদ দিলাম। এবার তুমিই ভেবে দেখ।

—তুমি ঠিক বলেছ মা। অন্তঃপুরিকাদের উপর রুষ্ট হওয়া আমার পক্ষে উচিত হয় না। ও বেচারীদের একমাত্র অপরাধ যে তারা স্ত্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। হয়তো আশ্রয় এবং নিশ্চিন্ততা পেয়েছে কিন্তু তার বদলে সারাজীবন এই বন্দীশালায় অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে থাকতে হল। আমি ভাবছি যে এথেন্সের পুরুষদের মাত্র এক পত্নী থাকা সত্ত্বেও তাদের যে কারণে অর্থাৎ যে অযোগ্যতার জন্যে পুরনো ব্যবস্থা বদল করবার দরকার হয়েছিল, আজ আমাদের ব্যবস্থা বদল করবার প্রয়োজন তার চেয়ে অনেক গুণ বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

—কিন্তু তা কী সম্ভব ভর্তৃদারক?

—তাই ত ভাবছি মা। আজ হয়ত অসম্ভব হতে পারে কিন্তু সময় অসীম, কিছুদিন পরে সম্ভব হতেও পারে।

—ভর্তৃদারক! আমি লক্ষ্য করেছি যে তুমি নিজের বয়সের যোগ্যতা বা শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী মুল্যবান কথা বলো।

—অর্থাৎ দুগ্ধপোষ্য শিশুর মুখে এসব কথা শোভা পায় না, এই ত ?

—না ভত্তৃদারক ! আমি নিন্দার কথা বলছি না। আমি প্রশংসা করছি তোমার। যৌবনের মদিরা পান করে মাতাল হয়ে যখন কোন সুন্দরী নারী আমার কাছে এসে নির্লজ্জ প্রস্তাব জানায় তোমার কাছে দূতীপনা করতে হাতে পায়ে ধরে, তখন জানো তাদের আমি কী বলি ?

—কী ?

—তাদের দূর দূর করে তাড়িয়ে দিই, আর বলে দিই, আমার ভত্তৃদারককে তোমরা যা মনে কর সে তা নয়। হাজার পুরুষসিংহের মধ্যে সে অসাধারণ। কালামুখীরা, তোমরা অন্য কোথাও গিয়ে তোমাদের মুখে কালী মাখাও। তবুও তারা শুনতে চায় না। কিন্তু বাছা, চতুরিকা সে জাতের মেয়ে নয়। অন্তঃপুরিকাদের সকলের ব্যতিক্রম সে।

—তাহলে মা, তুমি এখন চতুরিকার জন্যে আমাকে অনুরোধ করছ ?

—না ঠিক অনুরোধ করছি না, তার গুণের কথাই বলছি। কোনও সময়ও সে তোমার প্রতি কটাক্ষ করে না। তবে হ্যাঁ, তোমাকে নিষ্ঠুর বলে।

—এতে নিষ্ঠুরতার কী আছে মা ? সকলের যদি প্রিয়পাত্র সাজতে হয় আমাকে, তাহলে রাজপ্রাসাদের মধ্যেই আমি একদিন কর্পূরের মত উবে যাব। তবে তোমার চতুরিকা আজ আমার চুম্বন পেয়েছে, আশা করি আর সে নিষ্ঠুর বলবে না আমাকে। প্রেমের জন্যে আমার মনে যথেষ্ট সম্মান আছে, কিন্তু এই সমাজে তার স্থান কোথায় মা ? অবশ্য অল্প কিছুদিন হল আমি একটু একটু বুঝতে শিখেছি যে প্রেম কী। কিন্তু যতই ভাবছি ততই দেখছি যে মানবতা আর পশুতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই বর্ত্তমান সমাজে।

—ঠিক বলেছ ভত্তৃদারক। আমাদের মত পরিচারিকাই বলো

আর পরিচারকই বলো, তা সে রোম হোক অথবা পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদই হোক, সকল স্থানেই পশুর মত গণ্য করা হয়। আমাদের সামনে পুরুষরা নিঃসঙ্কোচে এমন সব কাজ করে যা মানবতা বিরোধী। এতটুকু খেয়াল নেই যে সামনে আর একজন মানুষ দেখছে তার সেই নগ্ন নির্লজ্জতা।

কুলুপা হয়ত আমাকে অতিমানব বলে ভাবে, তাই আমি আবার ওকে বল্লাম,

—আমি অতিমানব নই মা। আর অতিমানব হওয়া পছন্দ করি না। কিন্তু মানুষ বটে, তাই পশুর দলে মানুষকে গণ্য করতে আমার প্রাণে ব্যথা লাগে এবং তা যারা করে আমি তাদের ঘৃণা করি। এবং এই তথাকথিত সদাচারকে আমি আরও বেশী ঘৃণা করি। এরা, যাদের লীলার কথা তুমি আমাকে শোনালে, তারাই আবার মন্দিরে গিয়ে সতী সাধ্বী সেজে পূজা দেয়। নিজেদের সতী বলে জাহির করে। এই লুকোচুরি খেলার কোন মানে হয় না।

—হয়ত তাই, কিন্তু সকলেই পরলোককে ভয় করে, পাপাচারকে ঘৃণা করে এবং নরকের অগ্নিকে ভয় করে। তবুও সমাজের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে পাপ করতে বাধ্য হয় তারা। পরে তাই নিজেদের পাপস্খালনের আশায় ব্রত করে, পূজা পাঠ করে। হয়ত এ সব সদাচার করলে তাদের ধূলি কালী ধুয়ে যেতেও পারে।

—নরক এবং পরলোকের ভয়ে মানুষ সদাচারী হয়? আমি ত কখনও কাউকে দেখিনি। তোমার বিচার অনেক উচ্চমার্গের মা। তুমি রোম দেখেছ, যবন দেশ দেখেছ এবং আমাদের দেশে এক যুগের উপর বাস করছ। তুমিই বলো আজ পর্যন্ত কোন রাজা-সামন্ত বা কোন ধনী-শ্রেষ্ঠীকে নরক বা পরলোকের ভয়ে সদাচারী হতে দেখেছ?

—না ভর্তৃদারক, আমি কখনও দেখিনি। শ্রেষ্ঠী স্বার্থবাহী বা রাজা-সামন্তদের কথা ছাড়ো। আমি তাদের কথা বলছি, যারা সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণী মানী এবং নরক ও পরলোকবাদের জ্ঞাতা, মহান ধার্মিক বলে পরিচিত। ধর্ম সম্বন্ধে অন্যকে লম্বা লম্বা উপদেশ দেয়,

আর নিজেরা হাজার হাজার নারীর অশ্রুপাত করায়। তাদেরও আমি দেখেছি। এমনি একজন ধর্মাত্মা, যিনি রোমনগরীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধার্মিক পুরুষ ছিলেন, তিনিই আমার কৌমার্য নষ্ট করেছিলেন। তিনি প্রথমে আমার সঙ্গে প্রেম করেছিলেন, ভালবাসার বড় বড় কথা শুনিয়ে এবং আমিই ছিলাম নাকি তাঁর জীবন-মরণের একমাত্র আশা ভরসা। কিন্তু যখন আমি গর্ভিনী হলাম, তখন তিনি সমাজের ভয়ে আমাকে রোম থেকে এথেন্স নিয়ে এলেন এবং সেখান থেকে তীর্থ করবার নাম করে ভারতবর্ষে এনে আমাকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

—এখানেও সেই একই অবস্থা মা। এখানে যার কাছে অর্থ আছে তাকেই সকলে মানে, সেই সবচেয়ে উচ্চস্থান পায়। তাদের কাছে কিন্তু ঐ নরক পরলোকের কথা, রূপকথার মত। তাই এই দ্বিচারিণী মনোভাবকে আমি ঘৃণা করি। সদাচারী তাকেই বলা যায় যে ভিতরে বাইরে সমদর্শী, সত্যবাদী এবং মানব-ক্ষমতার অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

আচার্য বসুবন্ধুর কাছে যবন দর্শনের অনেক প্রশংসা শুনেছি আমি। যখন থেকে যবনরা ভারতে এসেছে তখন থেকে তাদের নানা কাহিনী আচার্য আমাকে সুন্দরভাবে বোঝাতেন। "মিলিন্দ প্রশ্ন" পড়বার সময় জানতে পারলাম আচার্য নাগসেনকে যবনরাজ মিলিন্দ (মিনান্দর) কি কি প্রশ্ন করেছিলেন। সেই সময় জানতে পারলাম যে শাকলা (শিয়ালকোট) মিলিন্দরাজের রাজধানী ছিল। কিন্তু যবনদের দেশে গণ-রাজ্য ছিল এবং তাদের দেবদেবী ছিল। পরে যীশুখ্রীষ্টের প্রবর্তিত ধর্মকে তারা মানতে লাগল।

পরে যখনই সময় পেতাম কূলুপার কাছে যবন ও রোমদেশীয় নানা কথা জিজ্ঞাসা করতাম। আমার সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে কূলুপাও নিঃসঙ্কোচে সব কথা বলত আমাকে। কিন্তু আমার বুকের মধ্যে বারবার মোচড় দিয়ে উঠত, যখন মনে হত যে এই যবন জাতি এককালে গণ-রাজ্যের অধীন ছিল এবং কোন একজন রাজা এসে তাদের ধ্বংস করেছে এবং আজ যবন জাতি বিদেশী রাজার অধীনে বাস করছে।

॥ ছয় ॥

পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ

পর পর কয়েকখানা পত্র এসেছে পিতার কাছ থেকে। বার বার তিনি অজ্জুকাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রোদকায় যেতে লিখেছেন। আমাদের দেখবার জন্য ভীষণ উৎসুক হয়ে আছেন তিনি।

হেমন্তের শেষ হয়েছে, আমি চন্দ্রগুপ্ত এবং অজ্জুকা অগ্রোদকায় পৌঁছলাম। যদিও এখন আমার বয়স মাত্র ষোল বৎসর, কিন্তু পৈতৃক রক্তের গুণে এবং নিত্য ব্যায়ামাভ্যাসের ফলে আমাকে বিশ বৎসরের হৃষ্টপুষ্ট যুবক মনে হত।

গত দু-বছরে পিতাকে অনেকখানি বৃদ্ধ মনে হচ্ছে। তার অন্যতম কারণ চিন্তা। আমার বা তাঁর নিজের জন্যে তিনি কখনও চিন্তা করতেন না। যৌধেয়গণের চিন্তাই তাঁকে শেষ বয়সে অত্যন্ত বিপর্যস্ত করেছিল। যদিও পরম ভট্টারক সমুদ্রগুপ্ত যৌধেয়গণের আভ্যন্তরিক কোন ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করেন নি বা নামমাত্র কর নিতেন, কিন্তু সে করের শতগুণ তখনি উপায়ণ এবং পারিতোষিক হিসেবে ফিরিয়ে দিতেন। তবুও যৌধেয় জাতির মধ্যে ক্রমশঃ গণচিন্তা যেন লোপ পেতে বসেছে। খেত খামারের ব্যাপারে যদিও খেয়াল মত চলবার উপায় ছিল না, কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যে বিস্তর ধন সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছে তারা। অর্থ সঞ্চয় আর বিশাল প্রাসাদ তৈরীই এখন প্রধান চিন্তা বা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ-বিদ্যার কথা প্রায় ভুলেই গেছে তারা। সময় পেলেই তারা মথুরা যেত। মহাদেবীর কুল বলে মথুরার উপরিক মহারাজ প্রত্যেক যৌধেয়কে খুব সম্মান করতেন। সোনার পাত্রে উদুম্বরবর্ণা (লাল) দ্রাক্ষী সুরা দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন তাদের। বহু রত্ন-সজ্জিতা গণিকারা নাচ দেখাতো এবং সেখানকার রাজ অমাত্যদের বহুমূল্য

বসন-ভূষণ অনুকরণ করতে লাগলো। পিতা এই সব লক্ষ্য করে যৌধেয় জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হয়ে পড়লেন। অজ্জুকা পিতাকে প্রসন্ন করবার জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন।

চন্দ্রগুপ্তের সকল সময়টুকু আনন্দে এবং মামীদের সঙ্গে নাচ-গানে কাটত। আমার বৌদিরা আমাকেও ডাকত কিন্তু আমি প্রায় সব সময় পিতার সঙ্গে থাকতাম। যৌধেয়দের অতীত ইতিহাস, তাদের ধর্মের এবং বীরত্বের কাহিনী শুনতাম। এক এক দিন অর্ধরাত্রি পর্যন্ত আমাদের গল্প হত।

আমি একদিন প্রশ্ন করলাম,—পিতা! এদের যৌধেয় বলে আবার আগ্রেয় বলে, কেন?

পিতা বল্লেন—যৌধেয় গণের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট উপগণ আছে। যেমন আগ্রেয়, রোহিতকী, খাণ্ডিল্য প্রভৃতি। কয়েকশত বৎসর আগে এরা সকলেই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। তাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্ষাপণ (মুদ্রা) হতো এবং গণসভাও ভিন্ন ছিল। কিন্তু নিজেদের মধ্যে কখনও বিরোধ বিবাদ ছিল না। তারপর এক সময়ে যখন আমাদের পূর্বে ও পশ্চিমে ক্রমশঃ রাজতন্ত্র কায়েম হতে লাগল এবং সেই রাজারা আমাদের দুধ-ঘী-র নদী আর শস্য-শ্যামল ভূমির উপর লোভের হাত বাড়ালো অর্থাৎ আক্রমণ করলো তখন সকলের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তারা একত্র না হলে আক্রমণকারীর সঙ্গে পেরে উঠবে না। তখন সকল গণের পুরস্কর্তারা মিলে আলোচনা করল যে, সকলে মিলিত হয়ে এক বিরাট যৌধেয় মহাগণসঙ্ঘ স্থাপিত করতে হবে। যুদ্ধে আমরা দুর্ধর্ষ ছিলাম বলেই আমাদের জাতির নাম "যৌধেয়"। এ ঘটনা চারশ বৎসর আগের কথা। মালবগণ মহাসঙ্ঘে যোগ না দিয়ে একলা লড়াই করেছিল কিন্তু প্রায় অর্ধমহাদ্বীপাধিপতির বিশাল সেনার সঙ্গে কতক্ষণ লড়াই করবে। অবশেষে পরাজিত হয়ে নিজের জন্মভূমি ছেড়ে স্ত্রী-পুত্র পরিবার সহ পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করল। নইলে মালবীয়দের শৌর্য, বীর্য ও দেশাত্মবোধ কম ছিল না। আজ তারা আমাদের

যৌধেয় ভূমির সীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণে নতুন ভূমিতে আশ্রয় নিয়েছে। আমাদের পশ্চিমে শতদ্রু তীরে যে ভূমি আজ আমাদের শাসনাধীন, এক সময় সেইখানে মালবদের বাস ছিল।

—আমাদের হাতে কী করে এল মালবভূমি ?

—ক্রমশঃ জানতে পারবে। মৌর্যরাজ পুরুষপুরেরও আগে পর্যন্ত বিজয়লাভ করেছিলেন কিন্তু খুব কম গণকে উচ্ছেদ করেছেন তিনি। সমুদ্রগুপ্তের মত মৌর্য চন্দ্রগুপ্তও বলতেন গণ নিজেরা স্বতন্ত্র থাকুক এবং আমি অধিকারের পরিবর্তে শুধুমাত্র স্বীকৃতি চাই যে বিদেশী শত্রুর সঙ্গে লড়াইতে ভারতবর্ষের সকল তরবারী এক হয়ে আক্রমণ প্রতিরোধ করবে। তক্ষশিলার আশপাশের কিছু গণকে তিনি উচ্ছেদ করেছিলেন সে শুধু তাদের বিরুদ্ধ মনোভাবের জন্য। যবন মিলিন্দ এবং তার বংশধরদের সময়ে উত্তরাপথের গণের উপর এক বিপদ এসে উপস্থিত হল। পশ্চিমের গণ আক্রমণকারীর সঙ্গে খুব বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছিল। কিন্তু কেউ কেউ মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছিল। যারা পালিয়ে এসেছিল তাদের বেশীর ভাগ আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়েছিল এবং আজ তারা যৌধেয় নামে পরিচিত। কুষাণের সময় আবার সঙ্কট উপস্থিত হল। কিন্তু ততদিন সকল গণকে একত্রিত করে আমরা মহাবলশালী হয়ে উঠেছিলাম। যৌধেয়দের অন্তর্বর্তী সকল ছোট গণদের ছাড়াও শতদ্রু বিপাশা-এর মধ্যবর্তী কুনিন্দ এবং দক্ষিণের আর্জুনায়ন সকলে আমাদের সঙ্ঘে মিলে এক বিশাল গণসঙ্ঘের রূপ ধারণ করেছিল।

—তাহলে সকলের মত মালবরা সঙ্ঘে স্থান পেল না কেন ? তারাও ত বীর ছিল।

—ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে কিছু ধনী মুখ্য ছিল। তারাই আমাদের সঙ্গে মিশতে দেয়নি মালবগণকে। মালবগণ বীর ছিল এতে সন্দেহের কারণ নেই। কারণ আজ থেকে ৩০৯ বৎসর পূর্বে ঐ মালবগণ কুষাণরাজকে গো-হারান হারিয়েছিল। সেই উপলক্ষে তারা মালব সম্বত (বিক্রম সম্বত) চালু করেছিল।

—আমাদের কি এখনও ততখানি পরিমাণ ভূমি আছে যতখানি ভূমিতে আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রথম বসবাস শুরু করেছিল ?

—এখন তার চেয়েও কিছু বেশী পরিমাণ ভূমি আমাদের হস্তগত হয়েছে। পড়সী রাজারা যখনই দুর্বল হয়ে পড়েছে তখনই আমরা আশ-পাশের পতিত জমিগুলি দখল করে নিয়েছি।

—কিন্তু পিতা ! সমুদ্রগুপ্তের মাতুল কুল লিচ্ছবিরাই মগধ থেকে কুষাণদের শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। পঞ্চাশ বৎসর আগেও পাটলিপুত্রে কুষাণ ক্ষত্রপ বাস করত। আর এখন ত আমাদের ভূমি হিমালয়ের পাদদেশ হয়ে খলতিকা (কালসী) এবং তারও ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। তাহলে কুষাণরা কেমন করে ঐ রাস্তা দিয়ে মগধে এসেছিল ?

—তোমাকে ত আগেই বলেছি যে, বলবান শত্রুর সামনে আমরা বেতসী বৃত্তি স্বীকার করে গেছি। স্রুঘ্ন (আম্বালা) এবং উত্তর ভাগের দিক দিয়ে আমরা তাদের যাওয়া আসার রাস্তা ছেড়ে দিয়েছি। কুষাণদের মধ্যদেশ ছাড়বার মূলে সমুদ্রগুপ্তের পিতা অথবা লিচ্ছবিদের কোন বাহাদুরী ছিল না। আমরা অর্থাৎ যৌধেয়রাই তাদের মধ্যদেশ থেকে তাড়িয়েছিলাম। রাজাদের মত একটি পরিবারের সুখের ও ভোগবিলাসের জন্য হাজার হাজার দেশবাসীর জীবনহানি ঘটিয়ে অন্য রাজার রাজত্ব দখল করতে চায় না যৌধেয়রা। আর সেই জন্যেই আমরা কুষাণদের শতদ্রু, বিপাশা নদীর পার করেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কুষাণরা তাতেও নিজেদের নিরাপদ মনে করতে পারলো না এবং তখন দেবপুত্র শাহী গিয়ে পারসীক শাহনশাহর চরণে নিজের মুকুট রেখে বশ্যতা স্বীকার করলেন। কুষাণ অথবা ক্ষত্রপদের আমরা বিদেশী বলে ভাবতাম না। অবশ্য পাঁচশত বৎসর আগে তারা বিদেশ থেকেই আমাদের দেশে এসেছিল, কিন্তু এতদিন আমাদের দেশে বাস করে আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি নিয়ে তারা একপ্রকার আমাদের দেশবাসীর মতই হয়ে

গেছে। তবে পারসীকদের ছায়ায় থেকে দেবপুত্র শাহী কুষাণ খুবই নিন্দনীয় কাজ করেছেন।

যৌধেয়দের পূর্ব ইতিহাস শুনে আমি আমার ভবিষ্যতের চিন্তাধারা সম্বন্ধে পিতার কাছে ব্যক্ত করলাম। সব শুনে পিতা খুশীমনে বল্লেন, ঠিক কথা, রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নীতি। গণতন্ত্র নিজের দেশের সকল ব্যক্তির মনে আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মান-এর প্রেরণা জোগায়, আর রাজতন্ত্র মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে।

—মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করা বা তা থেকে বঞ্চিত করা সমাজের অকল্যাণের কথা। তবুও দেখছি এই নিয়মই চলে আসছে যুগ যুগ ধরে—কেন?

—কারণ বলবান দুর্বলকে দাস করে রাখতে চায়। তারা অর্থের জোরে একদল লোককে বাধ্য করে আর একদলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে। তারপর সেই দলকে কাবু করে তাদের হাতে অস্ত্র দেয় অন্যকে শাসন করতে অপরের ধন লুঠ করতে।

—তাহলে এ পৃথিবীতে অন্যায়ের পাল্লাই বেশী ভারী?

—হ্যাঁ। এ পৃথিবীতে দুর্বলতা পাপ, আর সেই পাপের জন্যেই আজ দেশের মানুষ দাস হয়ে আছে।

—পিতা! আমি এক যবনীর মুখে শুনেছি যে যবন দেশেও কোন এক সময় গণতন্ত্র ছিল এবং তাদের রাজধানী ছিল এথেন্স। যবনরা সেখানে আমাদের মতই গণসংস্থা দ্বারা শাসন কার্য পরিচালনা করত। তারপর অলিকসুন্দরের পিতা গণশাসন উচ্ছেদ করে রাজশাসন কায়েম করে, সেই থেকে যবন জাতি রোম রাজার অধীন। এই কথা শুনে মাঝে মাঝে আমার খুবই দুশ্চিন্তা হয়।

—স্বাভাবিক। তবে যতক্ষণ যৌধেয়দের হাতে খড়গ ধারণ করবার শক্তি আছে ততক্ষণ আমরা জন্মভূমির মর্যাদা রক্ষায় নিজেদের প্রাণ তৃণবৎ জ্ঞান করি। আর যতক্ষণ আমাদের একতা অটুট থাকবে ততক্ষণ চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু আজকাল আমাদের সংগঠনে,

একতায় ও মিলিত মনোশক্তিতে যেন ভাঙ্গন ধরেছে। একথা সত্যিই খুব চিন্তার বিষয়।

—কি রকম ?

—দীনার উপার্জনের পিছনে ছুটছে আজকাল যৌধেয়। আর সেই কারণে নিজেদের মধ্যে ভেদভাব দেখা দিয়েছে। অপরের দেখে, অনুকরণ করে মূল্যবান বস্ত্রভূষণ পরিধান করে অনেক যৌধেয় আজকাল অন্যান্য যৌধেয়দের থেকে নিজেদের বড় বলে ভাবছে। ফলে অন্য যৌধেয়রা তাদের ঈর্ষার চোখে দেখছে। মাত্র বিশ বৎসর হল সমুদ্রগুপ্তের সঙ্গে যৌধেয়দের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। ইতিমধ্যে এই পরিবর্তন, আগামী ভবিষ্যতের পক্ষে খুবই চিন্তার কারণ। বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

—এ কথা আমিও ভেবেছি। রাজার বিলাস-ভোগ প্রতিদিন বেড়ে চলেছে। বিলাসিতার জন্য চাই অর্থ। আর সেই অর্থ সংগ্রহ করতে প্রজাকে লুঠ করতে হয়, প্রতিবেশীকে লুঠ করতে হয়। তাই ভাবছি যৌধেয়দের সমৃদ্ধ ভূমির বিপদাশঙ্কা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। রামগুপ্ত খুব সরল লোক তার রাজত্বকালে আশা করি সমুদ্রগুপ্তের আইন চলবে। কিন্তু পাটলিপুত্রের সিংহাসনে তার পক্ষে টিকে থাকা দুরূহ।

—কেন বৎস ?

—চন্দ্রগুপ্ত ভয়ানক কুট এবং ধূর্ত। নিজের মনে মনে অনেক কিছু ফন্দি আঁটছে দিনরাত। যদিও সে সব কথা সে প্রকাশ করে না কারও কাছে, তবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, বিষ্ণুগুপ্ত, এবং চাণক্যকে সে নিজের পথপ্রদর্শক বলে মানে। তাদের নীতি অনুসরণ করবে সে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

—তাহলে যৌধেয়গণের ভবিষ্যত খুবই আশঙ্কাপূর্ণ। চন্দ্রগুপ্তকে রাস্তা দেখানো আমাদের শক্তির বাইরে। গণতন্ত্রের সমর্থক হওয়া চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে অসম্ভব। তবে গণ যদি দৃঢ় থাকে তাহলে চন্দ্রগুপ্তকে বাধা দেওয়া যেতে পারে।

—আমিও তাই ভাবছি পিতা! নিজের গণকে কেমন করে সুদৃঢ়, শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে প্রায়ই চিন্তা করি। আচার্য বসুবন্ধু লিচ্ছবিদের বিষয় অনেক কিছু আমাকে বলেছেন। তার কাছে শুনেছি যে ভগবান তথাগত লিচ্ছবিদের অনুকরণ করে ভিক্ষু সঙ্ঘের নির্মাণ করেছিলেন। রাজতন্ত্রের চেয়ে গণতন্ত্রকে বেশী ভালবাসতেন তিনি, কারণ, যে বংশে তিনি নিজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সেই শাক্য বংশ গণতান্ত্রিক সঙ্ঘ ছিল। একটা ইচ্ছা সদাই আমার মনে জাগে, কিন্তু—

—কী সে ?

—বুদ্ধ দর্শন শিক্ষা করবার জন্য আমাকে ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে।

আমার কথায় পিতা চমকে উঠলেন।

—না জয়, তোমার ভিক্ষু ধর্ম গ্রহণ সাজে না। তুমি আমার একমাত্র সন্তান এবং সমগ্র যৌধেয় জাতির ভবিষ্যত।

—আপনি ভয় করবেন না পিতা। বৈরাগ্য বা নির্বাণের লোভে আমি ভিক্ষু হব না এটা নিশ্চয় জানবেন। তবে যদি কখনও কিছু সময়ের জন্য ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করি ত জানবেন যৌধেয়গণের সেবা করবার জন্য এবং নিজেকে উন্নত করে গড়ে তোলবার জন্য।

—তাহলে আমার কোনও আপত্তি নেই পুত্র।

—আমি বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে দেখেছি তিনি সকল প্রকার ভেদ ভাব দূর করে সঙ্ঘকে এবং সকলকে এক করে তুলতে চেয়েছিলেন। আজও অশোকারাম বিহারে যবন, পারসীক, শক, মাগধ, বৈদর্ভ, সিংহলী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র, ব্রাহ্মণ, সকল দেশের সকল জাতির ভিক্ষু বাস করছে কিন্তু তবুও তাদের মধ্যে আমি ভেদভাব লক্ষ্য করেছি। আমাদের জাতির মধ্যে কিন্তু তেমন নেই।

—বৌদ্ধ এবং জৈনরা উভয়েই সঙ্ঘকে সর্বোচ্চ মান্য করে। এরাও গুপ্তবংশের বিষ্ণুর মত বিশ্বাস করে না যে সংসারের হর্তা কর্তা কোন এক ঈশ্বরের অধীন। সেই জন্যেই আমি ব্রাহ্মণ ধর্মের চেয়ে

শ্রমণ (বৌদ্ধ-জৈন)-দের গণতন্ত্রের প্রতি অধিক আস্থাবান আমাদের গণ-সংস্থায় যদি যৌধেয় ছাড়া অন্য জাতির অংশ গ্রহণ করবার অধিকার থাকত তাহলে আমাদের সৈনিকশক্তি অনেক বেশী শক্তিশালী হত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

—তার জন্যে আমরা চেষ্টা করতে পারি ত ?

—কিন্তু এখন সে চেষ্টা সফল হবে না। চলতি ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা খুবই কষ্টসাধ্য। আমাদের দেশের মধ্যে এখন কিছু সংখ্যক ধনী আছে, যাদের কাছে কেনা দাস দাসী আছে। তারা শিল্পিদের পর্যন্ত চাকরের সামিল মনে করে। এরা প্রায় সবই অযৌধেয়, এবং এদের সংখ্যা যৌধেয়দের প্রায় অর্ধেক পরিমাণ। এখন থেকেই দেখতে পাচ্ছি এরা অন্যের হাতে রাজ্য তুলে দেবার পক্ষপাতী। তাই আপাততঃ আরও অযৌধেয়দের যৌধেয় ভূমিতে স্থান দেওয়া সমীচীন হবে না। হয়ত রাজ্যক্ষমতা অযৌধেয়দের হাতে চলে যেতে পারে। স্বার্থান্বেষী লোকেরা যৌধেয়দের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাবার চেষ্টা করবে। তুমি নিশ্চয় স্বীকার করবে যে, এ সময় এমন কোনও কাজ করা উচিত হবে না যাতে যৌধেয়দের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে।

—যৌধেয়দের রক্ত শুচিতা খুব বেশী। একাজে অনেক বাধার সৃষ্টি হতে পারে কিন্তু যৌধেয়গণকে আরও অনেক বেশী শক্তিশালী করে গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন।

—প্রয়োজন আছে স্বীকার করছি, কিন্তু অন্য উপায়ে চেষ্টা করা যেতে পারে, বিশেষ করে অ-যৌধেয়দের এখন আর স্থান দেওয়া একেবারেই উচিত হবে না। ভবিষ্যতে এ উপায়টা সম্ভব মত কাজে লাগানো যেতে পারে।

পিতার সঙ্গে সেদিনকার মত আলোচনা শেষ হল, কিন্তু আমার চিন্তার অবসান হল না। সর্বদাই ঐ এক চিন্তা আমার মনের মধ্যে জেগে রইল। তারপর থেকে সময় মত আমি গণরাজ্য বা গণ-সংস্থার বিষয়ে নানাপ্রকার জ্ঞানলাভ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

অজ্জুকা এবার ভদ্রা, খণ্ডিলা, পৃথুদকা, রোহিতকী প্রভৃতি নগরীতে বেড়াতে গেলেন। আমার যদিও খুব ইচ্ছা ছিল না, তবুও অজ্জুকাকে সঙ্গ দেবার জন্য আমিও সঙ্গে গেলাম। চন্দ্রগুপ্ত তার স্বভাবানুযায়ী শিকার আর নাচ-গান নিয়ে মেতে রইল।

সকল জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম, অগ্রোদকার মত অন্যান্য যৌধেয় নগরীতেও বিলাসিতা খুব বেড়ে চলেছে।

কোন স্থানেই আমাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি হয় নি। রোহিতকী নগরীতে আমার খুড়তুত ভাইয়ের শ্বশুর বাড়ী। সুনন্দা বৌদি সেখানে ছিলেন। সুনন্দা বৌদি আমাকে খুব ভালবাসতেন। অগ্রোদকাতে থাকা কালে যখনই কোন নাচ গানের আসরে আমরা যেতাম, তখন সুনন্দা বৌদি সব সময় আমার সঙ্গে নাচতেন। আর এখানে ত কথাই নেই, ছ-দিনের সফরের প্রতিদিন কমপক্ষে ছয়-সাত ঘণ্টা একাধিক তরুণীর সঙ্গে আমাকে নাচতে হয়েছে।

কখনও কখনও আমরা রাসনৃত্যানুষ্ঠান করতাম, যে অনুষ্ঠানে এক সঙ্গে দশ-পনের জন তরুণ-তরুণী মণ্ডলাকারে নাচত।

সুনন্দা বৌদির ছোট বোন নন্দা বয়সে প্রায় আমার সমবয়সী। বলিষ্ঠা এবং সুন্দরী। নাচে আমাকে কখনও হারাতে পারে নি নন্দা, কিন্তু সুযোগের অপেক্ষায় থাকত আমাকে হারিয়ে দেবার জন্য। একেবারে এক ঘড়া দুধ খেয়ে ফেলা যে কোন যৌধেয় তরুণীর খেলার মত ছিল; যদিও পাটলিপুত্রের রাজপ্রাসাদে একথা কেউ ভাবতেও পারত না। আমি যতবার যৌধেয় ভূমিতে এসেছি, প্রতিবারই পুরোপুরি যৌধেয়ের মত করে নিজেকে গড়ে তুলবার চেষ্টা করেছি।

একদিন আমার শক্তি ও বুদ্ধির পরীক্ষা করবার জন্য সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে রান্নাঘর থেকে আমাকে দুধ আনতে বলল। আমি আনতে গিয়ে দেখি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্বয়ং নন্দা। দুহাত দিয়ে দরজার দুদিকের বাজু ধরে দাঁড়িয়ে নন্দা বললে,

—ঘরে যেতে হলে তোমাকে দুটির মধ্যে একটি পন্থা বেছে নিতে হবে। পারো আমাকে বাহুবলে সরিয়ে দিয়ে ভেতরে যাও। নতুবা

মাথা নিচু করে আমার পায়ের নিচে দিয়ে যাও। আমি পথ ছাড়বার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করলাম। কিন্তু নন্দার নিজের শক্তির উপর যেমন অভিমান ছিল, তেমনি আমিও নিজেকে কম মনে করতাম না। তবুও স্ত্রী লোকের সঙ্গে শক্তির লড়াই করতে দ্বিধাবোধ করলাম। অথচ মাথা কিছু করে যাওয়াতেও আত্মসম্মানে লাগে। আমাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে নন্দা বললো,

—দেবর, আমাকে নারী বলে তুমি অবলা মনে কর ?

—কই না তো ! নারীকে আমি কখনই হীন বা দুর্বল ভাবি না।

নন্দা আমার কথা শুনে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো,

—আমি জানি যে নারীর জন্য তোমার হৃদয়ে কোনও স্থান নেই।

অতঃপর আমি হাতজোড় করে অনুনয়ের সুরে বললাম,

—দেবী ! আমি তোমাকে হৃদয়ে বসাতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে দৈহিক শক্তির পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত নই।

—দেবর জয় ! আমার সঙ্গে ছলনা করো না। আমি দিদির কাছে শুনেছি যে নারীদের প্রতি তুমি নিষ্ঠুর।

এবার আমি আশ্চর্য ভাব দেখিয়ে বললাম,

—অধীনের সম্বন্ধে সুনন্দা বৌদির এই মত নাকি ? কিন্তু তুমিই বলো না, কখনও কোনও নাচের আসরে কোন তরুণী বা তোমাদের সঙ্গে কি অকরুণ ব্যবহার করেছি ? তুমি ইচ্ছে করে রাতভর নাচিয়ে আমাকে আধমরা করেছ, তবু কখনও 'না' বলতে শুনেছ ?

—সে তো তোমার অহঙ্কারের কথা। তুমি কারও কাছে পরাজয় স্বীকার করতে চাও না।

—ও, তাহলে তুমি আমাকে হারাতে চাও ? তা, আমি এমনিতেই তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করছি।

—বেশ নাকে খত দিয়ে আমার পায়ের তলা দিয়ে যাও।

—নাকে খত আমি একবার ছেড়ে একশোবার দিতে রাজী আছি, কিন্তু দ্বিতীয় সর্ত তোমার বা আমার কারও পক্ষে শোভন নয়। গম্ভীর স্বরে এবার নন্দা আমাকে তার শেষ কথা শুনিয়ে দিল,

—শোভন বা অশোভন হোক হয় আমার সর্ত মানো, নতুবা খালি হাতে ফিরে গিয়ে ওদের বলো যে দুধ পাওয়া গেল না।

—তাহলে তুমি মল্লযুদ্ধ না করে ছাড়বে না। কিন্তু মল্লযুদ্ধের উপযুক্ত স্থান ত এটা নয়। তাছাড়া তোমার ঐ বেশভূষায় মল্লযুদ্ধ করাও যায় না।

—স্থান অস্থানের কথা কেন বলছ। মল্লযুদ্ধ যে কোনও স্থানেই হতে পারে। আর বেশভূষা বদল করতেও আমি চাই না, কারণ সেই সুযোগে তুমি দুধ নিয়ে পালিয়ে যাবে।

—না পালাব না, আমি কথা দিচ্ছি। তুমি যৌধেয়ের কথাকে বিশ্বাস করো না ?

—এখন অন্তত বিশ্বাসের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

কোনও দিকেই রাজী নয় নন্দা। ওদিকে পিছনের দরজার কাছে নারীকণ্ঠের চাপা হাসি আর ফিসফিসানীর আওয়াজ আসছে কানে। কিছুক্ষণ চিন্তা করে আমি বল্লাম,

—এক কাজ করো। এসো দুজনে মিলে ঐখানে কোন একটা ভারী জিনিষ ওঠাবার বাজী রাখি। যে না পারবে সে পরাজয় স্বীকার করবে। তবুও নাছোড়বান্দা নন্দা।

—ছিঃ বোঝা ত গাধায়ও তুলতে পারে।

—তাহলে আমার হাতের মুষ্ঠি খোলো। যদি পারো তাহলে আমি হার স্বীকার করব।

—হ্যাঁ, এটা একটা যুক্তিসঙ্গত কথা।

আমি হাত মুঠো করে নন্দার সামনে বাড়িয়ে দিলাম। এবার নন্দার গোলাপী রংয়ের মুখখানা আরও বেশী লাল হয়ে গেল।

—দিদি ঠিকই বলেছে জয়! তুমি নারীকে সত্যিই খুব হীন মনে কর, নইলে ডান হাত না দিয়ে বাঁ হাত মুঠো করলে কেন ?

আমি অগত্যা ডান হাত বাড়িয়ে দিলাম। নন্দা দুই হাত দিয়ে নিজের সকল শক্তি প্রয়োগ করে আমার মুঠো খুলতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু অসম্ভব। নন্দার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে

উঠল। চূর্ণ কুন্তল কপালে ও মুখে এসে ছড়িয়ে পড়ল। তবুও চেষ্টার অন্ত নেই। বাইরে আঙিনায় কয়েকটি তরুণ তরুণী তামাসা দেখতে জড়ো হয়েছে। আমি নন্দাকে উদ্দেশ করে বল্লাম,

—দেখ, এরা আমাদের দুজনকে আপোষে লড়িয়ে দিয়ে মজা লুঠছে। আর আমরা পরিশ্রম করে মরছি। আসলে কিন্তু আমাদের দুজনেরই হার হচ্ছে। তার চেয়ে এসো আমরা দুজনে সমঝদার-এর মতো কাজ করি। অবশ্য আমি এমনিই পরাজয় স্বীকার করতে রাজী আছি। বেচারী নন্দা তবুও হাত ছাড়তে রাজী নয়। তবে ও বেশ বুঝতে পারছে যে লোহার চেয়ে শক্ত আমার মুষ্ঠি। ওর হাত ঘেমে উঠল এবং বারবার চেষ্টা করতে গিয়ে হাত পিছলে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠলো। হাজার হলেও রোহিতকী নগরীতে জন্ম নিয়েছে সে। ইতিমধ্যে সুনন্দা বৌদি এসে হাজির। তিনি নন্দার ঘর্মাক্ত কলেবর দেখে হেসে বল্লেন,

—নন্দা, হাত ছেড়ে দে। তুই এখনও ওদের ষড়যন্ত্র বুঝতে পারিস নি। আসল ব্যাপার হল, তুই জয়ের সঙ্গেই সব সময় নাচিস, ওরা সুযোগ পায় না। তাই তোদের দুজনকে বেকুফ বানাতে চায় ওরা। নে, ছেড়ে দে। এবার ত বুঝতে পারছিস যে জয় পুরোপুরি যৌধেয়। বলিস তো জয়মালা এনে দিই, তুই জয়ের গলায় পরিয়ে দে।

জয়মাল্যের প্রস্তাবে নন্দা লজ্জায় মাথা নিচু করল। হাত ছেড়ে এবার ও নিজের চুল ঠিক করে আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে লাগল। আমি বৌদিকে বল্লাম,

—এবার আমাকে দুধ নিয়ে যাওয়ার আজ্ঞা দেওয়া হোক।

—তার মানে বিজয় ঘোষণা করছ? বল্লেন সুনন্দা বৌদি।

—না, বিজয় তোমাদের, আমার শুধু দুধ চাই।

—হুঁ! তুমি হয়ত মনে করছ যে রোহিতকী'র কুল কুমারীরা সকলে ফুল মঞ্জুরী?

—কখনও নয় বৌদি। যে কোনদিন রোহিতকী কুমারীদের পাল্লায় পড়েনি, সেই মনে করতে পারে, আমি নয়।

বৌদি মুচকী হেসে বল্লেন,

—দত্তা ননদের কাছে থেকে কথা খুব শিখেছ দেখছি। যাই হোক দুধ নিয়ে যাও, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা রোহিতকী কুমারীদের সঙ্গে পান-গোষ্ঠীতে যোগ দেবার কথা মনে থাকে যেন।

—তোমাদের পানগোষ্ঠী থেকে কবে পালিয়ে গেছি বলতে পার!

—না তা যাওনি কিন্তু আজ মাধবীর পেয়ালা শুধু ঠোঁটে ছুঁইয়ে ছেড়ে দিলে ছাড়ব না বলে রাখছি।

—তা আজ তোমরা আমাকে ভূত বানিয়ে ছাড়তে চাও?

—যাই বানাই না কেন, রোহিতকী কুমারীদের সঙ্গ আর এমন মধুমাখা বুলি আর কোথায় পাবে শুনি? তাছাড়া শ্বশুরবাড়ী এলে একটু আধটু বেচাল হওয়াটা অপরাধের কিছু নয়।

তখনকার মত দুধ খাওয়া শেষ হল। সন্ধ্যাবেলা একলাই যেতে হল পানগোষ্ঠীতে। যদিও আমি খুব সাবধান ছিলাম কিন্তু নন্দার নারী বাহিনীও খুব সজাগ ছিল। বার বার পাত্র ভর্তি খাঁটি দ্রাক্ষামাধবী আমাকে দিতে লাগল। অগত্যা আমাকে কিছু কিছু পান করতে হল। অতঃপর আমি মাধবীর পাত্র পাশের তরুণীর হাতে দিয়ে বল্লাম,

—সখী! নারী অধরের স্পর্শ বিনা মদিরা শুদ্ধ হয় না এবং মধুর লাগে না। অতএব তুমি দয়া করে তোমার রক্তাধর লাগিয়ে একে পবিত্র করে দাও। আমার প্রার্থনা কেউ অস্বীকার করল না। কারও কারও রঙ্গীন নেশা ধরেছে ততক্ষণে হাতে পাত্র গেলে আর ফিরে আসে না। কিন্তু চারিদিক থেকে "আবার দাও আবার দাও" রব উঠতে লাগল। এবার আমি প্রমাদ গুনলাম। অতঃপর প্রাণ-রক্ষার শেষ চেষ্টায় আমি গান ধরলাম। কবি সৌমিল্লের শৃঙ্গারপূর্ণ পদ। সেই গানই শেষ পর্যন্ত আমাকে রক্ষা করল। যদিও মদিরার পাত্র একের পর এক আমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পালা করে,

কিন্তু আমি চালাকী করে কোনটাতে শুধু মুখ দিয়ে পাশের তরুণীর হাতে দিয়ে গান গাইতে লাগলাম আবার কখনও যেন গানের খেয়ালে পাত্রটা পাশে নামিয়ে রেখে গানের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম। মাঝে মাঝে অন্য দু-একজন তরুণী গান শোনাল আর আমি সেই সুযোগে "যেন খুব নেশা হয়েছে" এমনি অভিনয় করতে লাগলাম। নেশায় যেন আমার গলার স্বর বিকৃত হয়ে গেছে এমন ভাব দেখাতে লাগলাম। আশপাশে বিজয়ধ্বনি উঠতে লাগল। সবাই তখন বিজয়ানন্দে হাসিতে ফেটে পড়ল।

তারপর যখন পানগোষ্ঠী শেষ হল তখন আমি ভালোমানুষের মত উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে বন্দনা করে বল্লাম,

—দেবী, এই দেখ আমার নেশা শেষ হয়ে গেছে। আর গলাও আমার ঠিক আছে এই দেখ দু-কলি গান গাইছি। এই বলে আমি দু-কলি গান শুনিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আসর থেকে। সকলের চোখ তখন লাল! সকলেরই ঠোঁট কাঁপছে থরথর করে, পা টলছে। আমার শেষ কথার দিকে বিশেষ খেয়াল করবার মত অবস্থা কারো নেই তখন।

॥ সাত ॥

হিমালয় এবং উৎসবসঙ্কেত

হিমালয়কে দূর থেকে আমি দেখেছি, কিন্তু আচার্য বসুবন্ধুর কাছে হিমালয়ের দেবদারু বন এবং সেখানকার সরলপ্রাণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে নানাপ্রকার চমকপ্রদ গল্প শুনে বার বার মনে হত হিমালয়ে যাওয়ার কথা। একদিন চন্দ্রগুপ্তকে বল্লাম। এসব ব্যাপারে চন্দ্রগুপ্ত সব সময় একপায়ে তৈরী। অজ্জুকা মত দিলেন এবং পিতা এই যাত্রার কথা শুনে খুশী হয়েই অনুমতি দিলেন।

দিনক্ষণ দেখে একদিন রওয়ানা হলাম। ইন্দ্রপ্রস্থ পর্যন্ত এসে অজ্জুকাকে নৌকায় তুলে দিয়ে আমরা ঘোড়ায় চেপে যাত্রা করলাম। যমুনার তটবর্তী পথ ধরে উত্তরের দিকে এগুতে লাগলাম। পথে একদল স্বার্থ (বণিকদল) পেয়ে তাদের সঙ্গ নিলাম। স্রুঘ্ন থেকে আরও আগে পর্যন্ত যমুনার পশ্চিম তট বরাবর গেলাম এবং জঙ্গলের রাস্তা পেলাম। জঙ্গলে বাঘ, হাতী, গণ্ডার প্রভৃতি নানারকম জন্তু জানোয়ার দেখতে দেখতে এগুতে লাগলাম। কতদিন বাদে হিমালয়ের পাদদেশে ছোট ছোট পাহাড়শ্রেণী পার হয়ে হিমালয়ের চরণে অবস্থিত খলতিকা (কালন্বী) নগরীতে পৌঁছলাম। এ সময়ে খলতিকা নগরীতে লোকজনের খুবই ভীড়। শুধু পাঞ্চাল অন্তর্বেদী, স্রুঘ্ন, যৌধেয়রাই নয় অন্যান্য বহু দূর থেকে আগত নানা ভাষার, নানা বর্ণের নানাজাতির লোকেরা বহু দূর দূর থেকে ঘোড়া, খচ্চর, গরু, মহিষ প্রভৃতি নিয়ে এসেছে বিক্রি করতে। এ ছাড়া হিমালয়ের নানা দুর্গম অঞ্চল থেকে মেষ, ছাগল প্রভৃতি নিয়ে এসেছে নানারকম পার্বত্য জাতি। পার্বত্যদের উলের পোষাকগুলি নানা ঢং-এর তৈরী। কোনও পোষাক শকদের মত, কোনটা

আবার অন্যদের মত। কেউ আবার মোটা মোটা গোটা কম্বল লোহার কাঁটা লাগিয়ে পরেছে। মেয়েরা উলের শাড়ী পরেছে। ঠিক শাড়ী বললে ভুল হবে। চাদরের মত গায়ে জড়িয়ে ডান কাঁধের উপর লোহার কাঁটা দিয়ে গাঁথা। পার্বতীয়রা স্নান করে না। পোষাক পরিচ্ছদ অত্যধিক ময়লা এবং দুর্গন্ধ। এখানকার ব্যাপারীরা এই সকল সরল প্রকৃতির লোকগুলিকে নানা উপায়ে ঠকিয়ে নেয়! কিন্তু খলতিকা যখন যৌধেয়গণের অধিকারে ছিল তখন এখানকার আইন-কানুন খুব কড়া ছিল। তারপর দেবপুত্র শাহী এবং সমুদ্রগুপ্তের হাতে শাসনক্ষমতা যাওয়ার পর এই সকল কুটবণিকদের আবার সুযোগ মিলেছে। আবার তারা যথেচ্ছ ব্যবহার করছে ব্যবসার নাম করে। বেচারী পার্বতীয়রা হিসাব জানে না, তারপর আবার কুষাণ এবং গুপ্তরাজার নানা মূল্যের দীনার ও মুদ্রা গুণতে ও মূল্যকষে হিসাব করতে পারে না! ব্যবসায়ীরাও সেই সুযোগে যা খুশী তাই বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় করে তাদের। পার্বতীয়দের ঠকাবার আর এক ফন্দি বার করেছে কূটবণিকগণ। তারা কোনও জিনিষ বিক্রি করতে এলেই আগে তাদের উগ্র লাল মদিরা দিয়ে অভ্যর্থনা করে তারপর নেশার ঘোরে ইচ্ছামত দাম দিয়ে রেখে দেয় সওদা করে।

খলতিকা যমুনা নদীর দক্ষিণতটে অবস্থিত। এইখানেই যমুনা পাহাড় থেকে মাটীতে এসে পড়ছে তাই এখানকার আর এক নাম যমুনাদ্বার। যমুনা-তট থেকে কিছুটা উপরে আশোকের এক শিলালিপি রয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় খলতিকা বহুদিন থেকে ব্যবসা কেন্দ্র বলে প্রসিদ্ধি পেয়ে আসছে। খলতিকার কুমারামাত্য (জিলাধীশ) যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং তার মামাকে খুব সম্মানের সঙ্গে আদর আপ্যায়ন করল। যুবরাজের জন্য ছোটখাটো এক দরবার বসিয়ে দিল সেখানে। প্রজারা এসে আভূমি প্রণত হয়ে বন্দনা করে ভেট দিয়ে যেতে লাগল। আমরা কুমারামাত্যকে হিমালয় ভ্রমণের ইচ্ছার কথা জানালাম। কুমারামাত্য বল্লেন—আমি নিজে খুব বেশী দূর যাইনি, তবে পার্বতীয়রা খুব সরল প্রকৃতির মানুষ। ছল-কপট,

চুরি-বদমায়েসী তারা জানে না। তবে পথ খুবই দুর্গম। সব জায়গায় অজপথ। উঁচু-নিচু, আঁকা-বাঁকা বিপদসঙ্কুল পথ। একমাত্র ছাগল ভেড়াই এসব পথের উপযুক্ত। অবশ্য ওখানকার অধিবাসীরা আজন্ম ঐ সকল রাস্তায় চলে ফিরে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তবে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় বিশেষ নেই। চার-পাঁচ দিনের রাস্তা উপরে উঠলেই গ্রীষ্মের তাপ একেবারে শেষ হয়ে যায়। তারপর শীতের আনন্দ উপভোগ করা যায় যত উপরে চড়া যায়। কিন্তু ভট্টা (যুবরাজ) আপনি ত অনেকদূর যেতে চাইছেন। দু-তিন দিনের রাস্তা পর্যন্ত খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ভালই পাবেন। তারপর খুব কষ্ট হবে।

আমি কুমারামাত্যের কথার উত্তর দিলাম,

—তা ঐ সব পার্বতীয়রা ত নিশ্চয় কিছু না কিছু খেয়ে জীবন ধারণ করে ?

—তাদের কথা ছেড়ে দিন। জোয়ারের ছাতু, জঙ্গলের শাক আর ঝলসানো মাংস। এমন কী নূনটুকুরও দরকার হয় না তাদের।

চন্দ্রগুপ্ত হাসিমুখে বললো,

—অমাত্য, আমাদের পক্ষে ঐ খাবারই যথেষ্ট, আপনি কিছু ভাববেন না। মাংস যখন পাওয়া যায়, তখন আবার ভাবনা কিসের। কখনও আগুনে ঝলসে নেব কখনও সুযোগ মত ঝোল তৈরী করব। এখান থেকে কিছু সৈন্ধব বেশী করে নিয়ে নিচ্ছি, তাহলেই চলবে। আর দীনার ত সব জায়গায় চলবেই।

—দীনার দিয়ে কিনবার মত কোনও সামগ্রীই পাবেন না সে সকল জায়গায়। সেখানে অধিকাংশ পণ (তামার পয়সা) পাদক (¼পয়সা) আর মাষক (এক মাষা ওজনের তামার সিক্কা) প্রভৃতি নিয়ে গেলেই কাজ চলে। আর তার জন্য আপনার চিন্তা নেই। আমি সকল গ্রামের মুখ্যদের এবং সামন্তদের কাছে সকল রকম ব্যবস্থার জন্য লিখে দিচ্ছি। আপনার সেবার ত্রুটি হবে না। আমি চন্দ্রকে বল্লাম,

—আমাদের রাজকীয় ভাবে খাওয়া ঠিক হবে না চন্দ্র। তাহলে পুরোপুরি একটা সেনাদল হয়ত আমাদের পিছনে পিছনে চলতে আরম্ভ করবে। তাতে যেখানেই আমরা যাব, সেই সব গ্রামবাসীদের অনর্থক কষ্ট দেওয়া হবে এবং ভ্রমণের আনন্দও কমে যাবে।

আমার কথায় চন্দ্র সায় দিতে আমি অমাত্যকে বল্লাম, আমাদের চার-পাঁচজন লোক দিন তাহলেই আমাদের চলবে। তার মধ্যে একজন অবশ্য ভাল পথপ্রদর্শক হওয়া চাই। আর সকল গ্রামের মুখ্যকে অথবা সামন্তকে এক একটা চিঠি লিখে দিন।

—আপনারা কোন দিক দিয়ে যাত্রা সুরু করবেন ?

—আমরা উৎসব সঙ্কেত-এ যেতে চাই এবং হিমালয়ের সম্ভাব্য অঞ্চলসমূহের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলি সবই দেখব।

—উৎসব সঙ্কেত এখান থেকে একটা গ্রামের পর থেকে আরম্ভ হয়েছে, আগে পনের বিশ দিনের রাস্তা সবই উৎসব-সঙ্কেত। ওদিকে সমতল ভূমির মত ঘন বসতি পাবেন না। বহুদূরে গিয়ে এক একটা গ্রাম পাবেন। তবে সামন্তদের গ্রামগুলি বেশ বড়।

খলতিকা ছেড়ে যাবার জন্য আমরা খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এখানে আমাদের দেখবার মত কিছুই নেই। অতএব সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কুমারামাত্য বিজ্জক নামে একজন পার্বতীয়কে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসেবে সঙ্গে দিলেন।

বিজ্জক পার্বত্য অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছে, পর্বতের ছায়ায় বড় হয়েছে, তাই এ অঞ্চলের সব কিছু তার নখদর্পণে। তাছাড়া গত তিন-চার বৎসর যাবত কুমারামাত্যের কাছে থেকে আমাদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছুই শিখেছে। এমন কি দাঁত মেজে হাত মুখ ধোওয়া অবধি। বিজ্জককে যাত্রার কথা জিজ্ঞাসা করতে ও বললো,

—ভেড়া বা ছাগলের পিঠে মালপত্র নিয়ে যাওয়াতে সুবিধা আছে বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে ওরা তাল রেখে চলতে পারবে না। ভেড়া ছাগল সঙ্গে নিলে দিনে মাত্র এক যোজন পথ এগুতে পারব আমরা।

অগত্যা শেষ পর্যন্ত পাঁচজন ভারবাহক সঙ্গে নেওয়াই ঠিক হল। বিজ্ঞকের কাছে জানতে পারলাম খানিকটা গেলেই শীত লাগবে, এবং যতই আগে যাব ততই ঠাণ্ডার প্রচণ্ডতা বাড়তে থাকবে। অতএব উপযুক্ত গরম পোষাকের প্রবন্ধ করতেই হল। কঞ্চুক, সুথন (পায়জামা) কানটোপ, মজবুত উপানহ (প্রায় হাঁটু অবধি ঢাকা জুতা) প্রভৃতি এখান থেকে তৈরী করে নিলাম।

সব গোছগাছ হয়ে গেলে একবার ভাল করে দেখেশুনে নিয়ে আমরা সাতজন যাত্রা করলাম অজানা হিমালয়ের উদ্দেশ্যে। থলতিকা আসার সময় যদিও দু-একটা পাহাড় ডিঙ্গিয়ে আসতে হয়েছিল, কিন্তু এখানকার পাহাড়গুলির কাছে সে সব কিছু নয়। প্রথম দিন ঘণ্টা তিনেক চলবার পরেই আমার পা ধরে গেল। তালু শুকিয়ে যেতে লাগল। পা যেন আর এগোতে চায় না। আমি এবং চন্দ্র দুজনেই পাকা ব্যায়ামবীর এবং নিত্য কঠিন কঠিন নাচের কসরত করা অভ্যাস ছিল আমাদের। তবুও সারাদিন চলবার পর সন্ধ্যেবেলা যখন একটা গ্রামে গিয়ে বিশ্রামের জন্য বসলাম, তখন মনে হতে লাগল যে এ দেহের সকল জোড়াগুলি বুঝি খুলে গেছে। সেদিন আমরা মাত্র দুই যোজন রাস্তা চলেছিলাম, তাছাড়া খানিকদূর গিয়ে বার বার বিশ্রাম করবার জন্য বসে পড়েছি। পর্বতের গা বেয়ে নিচে থেকে উপর পর্যন্ত শ্যামল বনানী এমন সুন্দর ভাবে সাজিয়ে উঠেছে যে, দেখে নয়ন সার্থক হয়। সেই সকল গাছগুলির মাথা একরকম লতা দিয়ে ঢাকা। তার নিচে দিয়ে যাওয়ার সময় আকাশ দেখা যায় না প্রায়ই। শুধু নানাপ্রকার পাখীর কলরবে চারিদিক মুখরিত। একটানা ঝিল্লির বিলাপধ্বনি। মাঝে মাঝে কোথাও ঝরনার জলের কলধ্বনি। ঝরনার শীতল জল দেখে কয়েকবার এগিয়ে গেছি কিন্তু বিজ্ঞক বাধা দিয়ে বলেছে,—"চলতে চলতে জলপান করা বিষপানের সমান"। অগত্যা শুষ্ক মুখে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ে আবার এগিয়ে গেছি।

এখানকার রাস্তাঘাট বিজ্ঞকের সবই জানা। সেজন্য রাস্তাঘাট সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত ছিলাম। বিজ্ঞকের উপর আজ্ঞা ছিল যে

আমরা যেখানেই যাই না কেন ও আমাদের কুমারামাত্যের আত্মীয় বলে পরিচয় দেবে। শুধু সেই মাত্র জানে যে আমরা কে।

দুই যোজন রাস্তা একদিনের অর্দ্ধেক সময়েরও আগে যাওয়া উচিত কিন্তু আমরা পৌঁছলাম সন্ধ্যেবেলা। বুদ্ধি করে বিজ্জক আগে থেকে চারজন ভারবাহককে আমাদের বিশ্রামস্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম যে গ্রামে আমরা গেলাম, সেটা সওয়া শ' ঘরের একটা বেশ সমৃদ্ধ গ্রাম। এই মানুষগুলি নদীতট থেকে উঠে এসে কিছুটা সমতল অধিত্যকার মধ্যে বসবাস শুরু করে সেইখানেই থেকে গেছে।

সমতলভূমির দিকে হলে গ্রামজ্যেষ্ঠকে আমরা গ্রামের মুখ্য বলতাম কিন্তু এখানে তিনি রাজা। মাগধরাজকে নানাবিধ উপায়ন দিতে হয়। তার বদলে এই বড়গ্রাম এবং উপরে আরও পাঁচ যোজন দূর পর্যন্ত তার শাসনে রয়েছে। ভারবাহকদের কাছে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে, প্রধান দরজায় আমাদের স্বাগত জানালেন। খুবই আদর আপ্যায়ন করলেন আমাদের। রাজার পোষাক অন্যান্য পার্বতীয়দের মত নয়। বেশীরভাগ শকদের মত। কিন্তু এখন আবার মধ্যদেশীয় প্রভাব বাড়তে আরম্ভ করেছে।

বাড়ীকে ঠিক বাড়ী বললে ভুল হয়। বাড়ী এবং দুর্গ একসঙ্গে। বিরাট চৌহদ্দি নিয়ে বাড়ীর দেয়ালগুলি বড় বড় পাথর দিয়ে তৈরী, ঘরের ছাদ কাঠের। ঘরের মধ্যকার নানাবিধ আসবাবপত্র কাঠের তৈরী এবং সেগুলি সুন্দর কারুকার্য করা। আমাদের দুজনকে সম্মানিত অতিথির মত দুটি ঘর দেওয়া হল।

পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্জক গরম জল জোগাড় করে এনে আমাদের পা ধুইয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে বল্ল। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে আমাদের আর খিদে ছিল না, তাই খেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে শুয়ে পরলাম। আপ্যায়নে কোনও ত্রুটি পেলাম না। শুয়ে শুয়ে ভাবছি যে এতখানি আদর নিশ্চয় কুমারামাত্যের চিঠির ফল।

কখনও কখনও ছাদের কড়ি কাঠের দিকে তাকিয়ে আছি আবার কখনও বা চোখ বুজে চিন্তা করছি, এমন সময় কাঠের পাত্রে তেল নিয়ে এক ষোড়শী তরুণী আমার ঘরে প্রবেশ করল। প্রথমটা আমার অবশ্য চমকে ওঠবারই কথা। তরুণীটির হাত-পা, মুখ বেশ ধোয়া মোছা পরিষ্কার। গায়ের কাপড়টিও খুব পরিষ্কার, পিঠের দুপাশে বেণী ঝোলানো। এক নজরে তার দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারলাম যে তার চেহারার মধ্যে সৌন্দর্য ও তারুণ্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ রয়েছে। মাথা নিচু করে তরুণী আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো এবং নিঃশব্দে আমার পায়ে তেল মালিশ করতে আরম্ভ করল।

ঘটনাটি এমন অপ্রত্যাশিত যে আমি কিছু বলবার অবসর পেলাম না। অথচ সে যখন পরিশ্রান্ত পদযুগলকে ধীরে ধীরে টিপে দিতে লাগল তখন আমার এমন আরাম হতে লাগল যে তাকে মানা করতেও ইচ্ছে হল না। কতক্ষণ এমনি করে যে সংবাহন করেছিল তা আমার মনে নেই, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে বিজ্জকের ডাকে ঘুম ভাঙ্গলো। বিজ্জক বললো,

—ভতৃদারক, ভোজন প্রস্তুত।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম ষোড়শী ঘরে নেই, ঘরের এককোণে একটি পিতলের দীপদানের উপর চতুর্মুখ প্রদীপ জ্বলছে। আন্দাজে বুঝলাম রাত্রি অনেক হয়েছে। অগত্যা বিজ্জকের পিছনে পিছনে ভোজন গৃহের দিকে রওয়ানা হলাম। চন্দ্র আমার আগে থেকেই হাজির হয়েছে ভোজন গৃহে। রাজা আমাদের পরিতৃপ্তির জন্য কয়েক রকমের মাংস, ব্যঞ্জন, গন্ধশালীর ভাত নানাপ্রকার সুস্বাদু বস্তুর সমাবেশ করতে ত্রুটি করেনি। রাজাকে কার্যোদ্দেশে প্রায়ই কুমারামাত্যের কাছে যেতে হয়, তাই গুপ্তদের পাচকখানার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। খাওয়ার সঙ্গে সুরার ব্যবস্থাও রয়েছে। চন্দ্রগুপ্তের অবস্থা দেখে মনে হল ওর সব ক্লান্তি দূর হয়েছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ঘরে এসে চন্দ্রগুপ্ত বসল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—কি খবর বলো ?

—তোমার খবর নিতে এলাম। আমার ক্লান্তি অবসাদ দূর হয়ে গেছে।

—আমার এখনও পথশ্রমের ক্লান্তি কাটেনি চন্দ্র!

—সে কি, তুমি তাহলে ক্লান্তিহরা ওষুধ প্রয়োগ করনি।

—হ্যাঁ, তেল মালিশ করে দিয়েছে, তাতে অবশ্য খাদিকটা উপশম হয়েছে। আমার কথা শুনে চন্দ্র ব্যঙ্গ করে বললে,

—তুমি সেই বোকাই রয়ে গেলে জয়। আমি আশ্চর্য হলাম।

—কেন?

—আবার কেন জিজ্ঞাসা করছ? ষোড়শী আমার সকল ক্লান্তি দূর করে দিয়েছে।

—বাঃ চন্দ্র! তাহলে এখানেও তুমি পাটলিপুত্রের অন্তঃপুর পেয়ে গেছ?

—হ্যাঁ জয়, এরই নাম ভাগ্য, আর সত্যিই তুমি অভাগা।

—অভাগা কেন?

—ষোড়শীর সঙ্গে কিছু প্রেমালাপ করোনি?

—না। তার মৃদু মৃদু সংবাহনের গুণে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙ্গতেই দেখি বিজ্জক খেতে ডাকছে।

—বুঝেছি, তোমাকে সব নতুন করে শেখাতে হবে। শোন! ষোড়শীকে আমাদের সেবার জন্য পাঠিয়েছিল। এখানকার নাম উৎসব সঙ্কেত। এখানে মাননীয় অতিথি ঘরে এলে কুমারী কন্যাকে অর্পণ করা হয় অতিথির সেবার জন্য। যেমন পান এবং ভোজন তেমনি কন্যা দিয়ে ওরা অতিথির মনোরঞ্জন করে। ষোড়শী কুমারী যার ঘরে নেই, সে অন্য কোন তরুণীকে দিয়ে কৃতার্থ হবে, এবং এটা অতিথি সৎকারের অভিন্ন অংশ বলে বিবেচিত হয় এখানে।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—নিচের বড় বড় রাজভবনেও এ প্রথা আছে। তবে পার্থক্য হল, সেখানে নিজের কন্যার বদলে দাসী বা পরিচারিকা দিয়ে অতিথি সৎকার করা হয়।

—কিন্তু তুমি এ সব কি করে জানলে ?

—বুদ্ধি করে জানতে হয়। এখানকার নিয়মকানুন জানলাম বিজ্জকের কাছে। এইভাবে অতিথির সেবা করা এদের ধর্ম।

—বুঝলাম, তারপর ?

—তারপর আবার কী ? ষোড়শীর স্পর্শ সুখে শরীরের সকল অবসাদ দূর হলো।

—চন্দ্রগুপ্ত তুমি সত্যই…

—কি জয় ? বড় নীচ নয় ? তুমি ভুল করছ জয়! উৎসব সঙ্কেতে এটা অতিথিদের অধিকার।

—অধিকার কথাটা মন্দ নয় কিন্তু কেবলমাত্র এখানকার অতিথিদেরই এ অধিকার থাকা উচিত।

—আমরা কেন বঞ্চিত হব ?

—কারণ আমরা বা আমাদের হৃদয় এদের চেয়ে বেশী কুটিল, বেশী সঙ্কীর্ণ। এই পর্বতবাসীরা এত বেশী সরল যে পান-ভোজনের মত এরা স্ত্রী সংসর্গকে পবিত্র মনে করে ; কিন্তু আমরা সেটাকে নিছক বেশ্যাপনার দৃষ্টিতে দেখি। বেশ্যারা দেহ বিক্রি করে অর্থের লোভে। কিন্তু এখানে অর্থের কোনও প্রশ্নই নেই। এই দেশের সর্বত্র এই প্রথা চালু থাকার জন্য এখানে উপকার বা কৃতজ্ঞতার কোনও প্রশ্ন নেই। এদের কথা শুনে আজ আমার এক পুরানো কথা মনে পড়ছে।

এবার চন্দ্র হো হো করে হেসে উঠল।

—এমন নগদ নারায়ণের পূজা ছেড়ে তোমার পুরোনো স্মৃতি মনে পড়লো ? তোমার লীলা বোঝাও শক্ত, কখনও মাটীর ধরণীতে বিচরণ করছ আবার কখনও বা শূন্যাকাশে। আমি ত ভেবেই পাই না যে সৃষ্টিকর্তা তোমাকে পুরুষ করে গড়েছিলেন কেন ?

—মানুষ হবার জন্য, চন্দ্র। বিচার করবার জন্য পুরানো গ্রন্থগুলি পড়লে দেখা যায় যে, একই দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচার ভিন্ন নিয়ম পালন করা হতো। যেমন শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে

বলা হয় যে "পিতা আপন পুত্র কন্যাদের জঙ্গলে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারা বর্ণচ্যুত হবার ভয়ে নিজ নিজ ভগিনীদের বিবাহ করে।" এমনি কথা দেবকন্যাদের সম্বন্ধেও বলা যায়। তাদের স্থায়ী বিবাহ হত না। নিজের খেয়াল খুশী মত এক এক দিনের জন্য এক একজনের পত্নীত্ব স্বীকার করত। এখানেও দেখছি প্রায় তেমনি প্রথা। এর মধ্যে বেশ্যাবৃত্তি অথবা অর্থ রোজগারের কোনও প্রশ্ন নেই, কিন্তু আমাদের সমাজ এর অন্য রকম অর্থ করে নেবে। কোনমতেই শুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে পারবে না।

—বেশ! এবার বুঝলাম যে তোমার মত বুদ্ধি নিয়ে গঙ্গার পাড়ে বসেও পিপাসা মেটাতে পারবে না কেউ। সৌভাগ্য যে তুমি যতই চেষ্টা করো উৎসব সঙ্কেতবাসীকে তোমার দর্শনতত্ত্ব বোঝাতে পারবে না।

চন্দ্র চলে গেলে আমি খাটের উপর শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে বাইরে কার যেন পায়ের শব্দ শুনে কান পেতে রইলাম। এমন সময় আমার ঘরে ষোড়শী আবার প্রবেশ করল। ষোড়শীর এবার আগমনের কারণ আর আমার অজ্ঞাত নয়, অতএব কর্ত্তব্য ঠিক করতে হবে। যে সদাচারী ধর্মের অনুপ্রেরণায় ও এসেছে, হঠাৎ একটা কিছু করলে বা বিরোধিতা করলে অন্যায় হবে। ষোড়শী আমার চৌকীর উপর উঠে বসতে আমি পা বাড়িয়ে দিলাম, ষোড়শী নিঃশব্দে আমার পা টিপতে লাগল, আমিও একটু ভাববার অবসর পেলাম কিন্তু কোন কিছু সিদ্ধান্ত করতে পারলাম না। গ্রীষ্মকালের পরিধান পরে ভীষণ শীতের দেশে হাজির হওয়ার মতই আমার মনের অবস্থা। ষোড়শী মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। হয়ত আমাকে বুঝতে চেষ্টা করছিল।

ভালো করে এবার আমিও দেখলাম। প্রথম দর্শনে যা দেখেছিলাম তার চেয়ে এখন তাকে অধিক সুন্দরী মনে হল। মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু আমিও পুরুষ, যৌবনের

উত্তেজনা আছে। ষোড়শীর কোমল স্পর্শে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তবু আমি চিন্তার দোলায় দুলতে লাগলাম। চিন্তা করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি তা আর মনে নেই।

সকাল হতেই দেখি ষোড়শী আমার পাশে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। চন্দ্র তখনও বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রাতঃরাশের আসরে চন্দ্র হাজির হতে পারলো না। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় তার সঙ্গে আবার দেখা হতে আমি বল্লাম—

—কি এখানেই থাকবে না যেতে হবে? মুচকী হেসে উত্তর দিল চন্দ্র,

—যেতে ইচ্ছে করছে না। কারণ এখনও সম্পূর্ণ ক্লান্তি দূর হয়নি।

—উৎসব সঙ্কেতের অতিথি সৎকারের এই রকমই ফল হয়। যাই হোক এখন আমরা উৎসব সঙ্কেতের সীমানায় এসেছি মাত্র। এখনও পূরা দেশটা বাকী রয়েছে! এ রকম আতিথেয়তা রোজই পাবে। আমাদের এখানে আসার একমাত্র উদ্দেশ্য হিমালয়ের বৈভব দেখা। তার কাজ কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।

—ঠিক বলেছো জয়। এক ফুলে বেশীক্ষণ বসে থাকা ভ্রমরের উচিত নয়। তাহলে আজই রওয়ানা হওয়া যাক।

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে আবার আমরা রওয়ানা হলাম। যাত্রার আগে বিজ্জক বললো পরবর্তী গামড়া (বিশ্রামের স্থান) প্রায় দেড় যোজন দূর। কিন্তু আমার আর এখানে থাকতে মন চাইছে না। হোক দেড় যোজন, হোক যত কষ্ট তবুও জোর করেই রওয়ানা হলাম। ব্যায়ামের অভ্যাস যখন আছে তখন খুব বেশী কষ্ট হবে না তা আমরা জানতাম। আমাদের চারজন ভারবাহক মালপত্র কাঁধে করে লাফাতে লাফাতে চলতে লাগল। বিজ্জক সামান্য কিছু খাবার নিয়ে আমাদের আগে চলছে। এবার আর রাস্তা নিচু নয়। ক্রমশ উপরে উঠছি। যতই উঠছি

ততই দেখছি আমাদের সামনের আকাশকে নতুন নতুন রূপে। আজ আমরা চলেছি এক সুন্দর উপত্যকার মধ্য দিয়ে। তার নয়ন মনোহর দৃশ্য দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়, চলার ক্লান্তির কথা মনেই হয় না। পাহাড়ী রাস্তায় চলা অভ্যাস না থাকার জন্য ভয় করছিল প্রথমটা। কোথাও কোথাও মাত্র চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা পা রাখবার মত, বাঁদিকে খাড়া পাহাড় আর ডানদিকে হাজার ফুট গভীর খাদ। একবার একটু হিসেবে ভুল হলেই সব শেষ। কিন্তু ক্রমশ ভয় কেটে গেল। বিজ্ভক অতবড় একটা বোঝা নিয়ে দিব্যি নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছে, আর আমরা পারব না কেন? বিজ্ভকের কোমরে একটা বাঁশরী লক্ষ্য করলাম। অতঃপর কিছুদূর গিয়ে ওকে বাজাতে বললাম। বিজ্ভক আমার কথামত কিছুক্ষণ বাঁশী বাজিয়ে শোনাল। পার্বত্য সুর পর্বতরন্ধ্রে অনুরণিত হয়ে এত মধুর লাগল যে আমাদের চলবার উদ্যম দ্বিগুণ বেড়ে গেল। বাঁশী বাজানোও কিছু কিছু আমার অভ্যাস ছিল তাই আমি বিজ্ভকের বাঁশীটা নিয়ে একটা রাগ বাজালাম। আমার বাজনা শুনে সমধর্মী হিসেবে বিজ্ভকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় আমরা পরবর্তী গ্রামের মুখ্যের বাড়ী পৌঁছলাম। আমাদের ভার বাহকরা আগেই এসে রাজার পরিচয় পত্র দেখিয়ে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছে। পরিবারে পাঁচজন পুরুষ, দুজন স্ত্রী। তার মধ্যে একজন মুখ্যের বোন। বিবাহিতা। ঘর মাত্র চারটি। একটিতে ছাগল, গরু-ভেড়া প্রভৃতি থাকে, বাকী তিনটি থাকবার জন্য। অতএব আমরা একঘরেই আশ্রয় পেলাম। ভারবাহকরা মুখ্যকে রাজার লেখা পরিচয়পত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু বাড়িয়ে বলেছে। আমাদের একজনকে মধ্যদেশের রাজকুমার প্রভৃতি বলতে মুখ্যমশায় আমাদের আত্মীয়ের মত আদর যত্ন করতে লাগলো। আমরা পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গেই দুজন স্ত্রী গরমজল দিয়ে পা ধুইয়ে দিয়ে গেল। চন্দ্র এদের দেখে খুশী হলনা বুঝলাম। কারণ এদের দুজনের কেউই তেমন সুন্দরী নয়, বয়স বেশী এবং অত্যন্ত অপরিষ্কার।

বিজ্ঞকের কাছে শুনলাম ঐ স্ত্রীলোকটি এই পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের স্ত্রী। উৎসব সঙ্কেতে এক পরিবারে চার পাঁচ ভাইয়ের একটী বিবাহের প্রচলন আছে।

মুখ্যমশায় আমাদের সামনে যবের তৈরী কাঁচা সুরা দিয়ে যেতে আমরা দু এক পাত্র পান করলাম। এখানকার খাবার রাজার বাড়ীর খাবারের তুলনায় নিকৃষ্ট হলেও মন্দ লাগল না। আগুনে ঝলসানো মাংসের সঙ্গে লবণ পাওয়া গেল; এবং শোবার সময় এক পাত্র করে গরম সুপ। খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম। আমার বার বার ভয় হচ্ছিল আবার কালকের মত বিপদে না পড়ি। কিছুক্ষণ পরেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসতে হল। একমুহূর্তে কামড়ে সমস্ত পিঠটাকে চাকা চাকা করে ফেলেছে। চন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বল্লাম,

—ঘুম পাচ্ছেনা নাকি? চিন্তা করো না। ঘরের কাজকর্ম শেষ করে একজন পাদ সম্বাহিকা আসবেই। চন্দ্র ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো,

—রাখো তোবার পাদ সংবাহিকা। এখানে সমস্ত শরীরে আগুন জ্বলছে।

—আবার বিরহ-জ্বর হল নাকি?

—কেন জয়? তোমার শরীরে কিছু মনে হচ্ছে না?

—তা হচ্ছে। সারা দেহে যেন হাজার হাজার সূঁচ ফুটিয়ে দিচ্ছে। এখানে শোয়া অসম্ভব চন্দ্র, চলো বাইরে যাই।

বাইরে এসে বিজ্ঞককে ডেকে বল্লাম। বিজ্ঞক বললো,

—এখন আমরা পিস্‌সুর দেশে এসে পৌঁছেচি। এখানে তবুও থাকবার মত ঘর একটা পেলেন, কিন্তু এর পর কোথাও এই জানোয়ার ছাড়া ঘর আর পাবেন না।

—তোমার কি মত চন্দ্র?

—মতামত আবার কী। পিস্‌সুর ভয়ে কি আমাদের ফিরে যেতে হবে নাকি?

—কখখনো নয়। রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া বাহাদুরের জন্য ঘরের দরজাও বন্ধ। তার চেয়ে এসো আমরা বাইরে গিয়ে শুই। বিজ্ভক বাইরে একটা চবুতরা পরিষ্কার করে দিতে আমরা সেখানে গিয়ে শুলাম। চন্দ্র বিজ্ভককে ডেকে বলে দিল যে, আজ আর অতিথি সৎকারের প্রয়োজন নেই।

তৃতীয় দিন পাহাড়ী রাস্তায় আরও অভ্যস্ত হলাম এবং সপ্তাহ শেষ না হতেই নিজেকে পাহাড়ী সিংহ বলে মনে হতে লাগল। প্রতিদিন চার-পাঁচ যোজন রাস্তা চলা আর তেমন কষ্টকর মনে হল না। যতই উপরে উঠছি ততই ঠাণ্ডা বেশী অনুভব করছি, কিন্তু আমাদের সঙ্গে উপযুক্ত পোষাক পরিচ্ছদ থাকায় বিশেষ বেগ পেতে হল না। পাহাড়ীদের সাদা-সিধে রান্না এবং ঝলসানো মাংসে এখন চন্দ্রগুপ্তের আর অরুচি নেই। দিব্যি আনন্দে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে লাগলাম আমরা। পিস্‌সুদের ভয়ও ক্রমশ কেটে গেল। চলার পথে যদি কোথাও বহুদিনের পরিত্যক্ত খালি ঘর পেতাম তাহলে আমরা সেইখানেই আশ্রয় নিতাম। তাছাড়া যেখানে যেখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, প্রায় সব জায়গায়ই ঘরের বাইরে রাত কাটিয়েছি। চড়াই, উৎরাইতে এখন আর কষ্ট হয় না।

যে সকল গ্রামে অধিক সংখ্যক লোক বাস করে, সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষে মেরয়-পানের আসরে জমা হয় সকলে। স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলে নাচে। দু-চার দিনের মধ্যে আমরা তাদের নাচের পদ্ধতি শিখে নিলাম এবং আমরাও যোগ দিতে লাগলাম তাদের সঙ্গে। বিজ্ভক আমার জন্য একটা বাঁশের বাঁশী তৈরী করে দিল এবং আমিও পার্বত্য সুর কিছু কিছু আয়ত্ত করে ফেললাম। তারপর আমরা উৎসব সঙ্কেতের উৎসবপূর্ণ জীবনের পুরোপুরি আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম।

আমরা মাত্র পনের কুড়ি দিনের মধ্যে ফিরে আসবার সঙ্কল্প নিয়ে রওয়ানা হয়েছিলাম। কিন্তু এখন যতই হিমালয়কে কাছ থেকে দেখছি ততই যেন চুম্বকের মত তার দিকে ছুটে চলেছি। দিন সময়ের

কথা মনেই থাকে না। এই যাত্রার মধ্যে মাত্র দুটি ঘটনা চিরকাল মনে থাকবার মত। তার মধ্যে একটি ঘটনার কথা মনে পড়লে এখনও আমার সমস্ত শরীর ভয়ে কণ্টকিত হয়ে ওঠে। আর একটির কথা মনে পড়লে অদ্ভুত আনন্দ রোমাঞ্চ জাগে।

হিমালয়ের নদীগুলি বড়ই চঞ্চল এবং প্রগলভ। নদীর জলকে জলের মত প্রায়ই কোথাও মনে হয় না। ক্রমাগত পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে বিকট চীৎকার করতে করতে ছুটে চলেছে, একদিকে তার ফুটন্ত দুধের মত সাদা ফেনা জমছে, আবার স্রোতের সঙ্গে ছুটে চলেছে। এক জায়গায় আমরা এমনি এক দুরন্ত নদী পার হবার জন্য এসে দাঁড়ালাম। এর আগে অবশ্য আরও কয়েকবার পার হয়েছি, কিন্তু কোথাও দড়ির, কোথাও কাঠের সেতু ছিল সে সব জায়গায়। এখানে তার কোন ব্যবস্থা নেই, উপরন্তু সে সব নদীর চেয়ে এ নদীর মূর্তি আরও ভয়ঙ্কর। পার হবার জন্য একটা দড়ি, অও গাছের ছাল দিয়ে তৈরী, এপার ওপার দুটি গাছের সঙ্গে লম্বালম্বি বাঁধা। প্রথমটা দেখে ভয়ে আমার বুক শুকিয়ে গেল। কিন্তু আমাদের ভারবাহকদের চোখে মুখে কোন পরিবর্তন না দেখে দেখতে লাগলাম ওরা কি করে পার হয়। পিঠের টুকরী থেকে প্রায় আট আঙ্গুল একখানি কাঠের টুকরো বার করে দড়ির উপর রাখল। কাঠের টুকরোটার দুদিকে একটু খাঁজ কাটা, তার মধ্যে একগাছি লম্বা দড়ির দু-দিকটা বেঁধে নিচের দিকে একটা ফাঁদের মত তৈরী করে তার মধ্যে নিজেদের পা ঢুকিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তারপর টাঙ্গানো দড়িটাকে দুহাতে টানতে লাগলো। এমনি করে ওরা এক একজন করে ওপারে গিয়ে পৌঁছল। আমি চন্দ্রকে বল্লাম ভয়ে ভয়ে,

—চন্দ্র এবার কি হবে? চন্দ্র নির্বিকার ভাবে জবাব দিল,

—কি আর হবে। যেমন করে ওরা পার হল, অমনি করে আমরাও যাব। যা থাকে কপালে। প্রথম প্রথম এমনি একটু ভয় করবেই।

খিজ্জক আমাদের জন্য সব ঠিক করে দিল, এবং নিজে খানিক দূর গিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিল। আমি দড়ির ফাঁদে পা ঢুকিয়ে দিয়ে যেই উপরের দড়িটা ধরে টান দিয়েছি অমনি সড়াক করে দশ হাত আগে গিয়ে ঝুলতে লাগলাম। নিচের দিকে তাকালে চোখ বুজে আসে আপনা থেকে। মনে হয় যেন প্রলয় কোলাহল হাত বাড়িয়ে ডাকছে, একবার পড়লে চোখের পলক ফেলবার আগেই সব শেষ। চিন্তা করবার সময় নেই। ভয়ে ভয়ে দড়ি ধরে টানতে লাগলাম এবং অপর পারে পৌঁছে শান্তির নিশ্বাস ফেললাম। চন্দ্র আর আমি ওপারে গিয়ে আমাদের কিছুক্ষণ আগের মনের অবস্থার কথা চিন্তা করে খুব খানিকটা হেসে নিলাম।

দ্বিতীয় ঘটনাটি হল যখন আমরা প্রথমবার দেবদারু বনে প্রবেশ করলাম। এ দৃশ্য দেখলে মনে হবে যে পৃথিবীর সুন্দরতম দৃশ্য, প্রকৃতি লক্ষ্মীর জয়স্তম্ভ যেন। সোজা ও সরল হাজার হাজার হাত বাড়িয়ে রয়েছে চারিদিকে। সুন্দর সাজানো একই রকমের সমস্ত গাছগুলির নিচের দিকটা মোটা এবং ক্রমশ সরু হয়ে হয়ে উপরের দিকে একেবারে সূঁচের ডগার মত সরু হয়ে গেছে। এই ঘন হরিৎ পাতাপূর্ণ বৃক্ষরাজি চির বসন্তের মধ্যে বাস করে। পাতা ঝরাতে যেন জানে না এরা। নিচের দিকে তাকালে মনে হবে যেন প্রকৃতি দেবী তাঁর পরিমল বাসিত কলসীর জল দিয়ে সমস্ত বনানীকে ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রেখেছে। এদিকে কোন লোকালয় নেই। কচিৎ দু-একটি ঘর দৃষ্টিগোচর হল কিন্তু সেগুলি পশুপালকদের অস্থায়ী বাসগৃহ। যেদিন আমরা দেবদারু বনে প্রবেশ করলাম, সেইদিন আমার জীবনে প্রথম চমরী দেখলাম। রাজ দরবারে শ্বেত চামর দেখেছি এবং লোকের কাছে শুনতাম যে এগুলি শ্বেত চমরী মৃগের পুচ্ছ। আসলে কিন্তু চমরীরা প্রায়ই কালো হয়, কারো কারো শুধু পুচ্ছটাই সাদা রংয়ের হয়, তাই কেটে নিয়ে মানব সমাজ রাজ্যলক্ষ্মীর চিহ্ন করে রাখে। এই চমরীগুলি আকারে বড় বড় মহিষের মত, কিন্তু গায়ের লোমগুলি এত বড় যে মাটি ছুঁয়ে চলে। এরা জাতে

ঠিক মৃগ নয় গরু মোষের মত পশুপালকেরা এদের পালন করে। একজন পশুপালক আমাদের হিমক্ষেত্র যাওয়ার রাস্তার নিশানা বলে দিল। খুব দুর্গম পথে গেলে মাত্র দু-দিনে হিমক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যাবে নইলে এক সপ্তাহ লাগবে। দু-মাস আগে এখানেও হিম জমে ছিল প্রায় আট নয় মাস যাবত।

আমরা দু-দিনের রাস্তা ধরলাম। সঙ্গে দু-জন পশুপালককে নিলাম পথপ্রদর্শক হিসেবে। তারা তাদের দুটি চমরীকে সঙ্গে নিল। পশুপালকের কাছে শুনলাম যে এই রাস্তা ধরে সোজা উত্তর দিকে গেলে আমরা হিমক্ষেত্র থেকে গঙ্গার উপত্যকায় যেতে পারবো এবং সেখান দিয়ে নিচে যেতে বিশেষ অসুবিধা হবে না। বাহাদুরী দেখাবার জন্যে আমরা দু-দিনের রাস্তা বেছে নিলাম। কিন্তু যাত্রা সুরু করবার পরেই নিজেদের ভুল বুঝতে পারলাম। দশ পা এগুই আর একবার দাঁড়িয়ে দম নিতে হয়। মনে হতে লাগল আর বোধ হয় পৌঁছনো হল না, এইবার মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব। পশুপালক বলল, এই বনে অনেক বিষাক্ত গাছপালা আছে, তার জন্য এই অঞ্চলের হাওয়া বিষাক্ত হয়ে থাকে, দম ফেলতেও কষ্ট হয়। তবে ভয়ের কিছুই নেই। এমনি করে প্রথম দিন কাটল, তাতেই আমাদের অবস্থা অবর্ণনীয়। দ্বিতীয় দিনে আমাদের দুজনকে চমরীর পিঠে বসিয়ে দিল। তখন আর নিশ্বাস ফেলতে অসুবিধা হয় না। চন্দ্র ব্যঙ্গ করে বললো,—যতসব মিথ্যেবাদীর দল। বিষাক্ত গাছ না ছাই। চমরীর পিঠে উঠতে বিষাক্ত হাওয়া বুঝি পালিয়ে গেল?

হিমক্ষেত্রে পৌঁছানোর অনেক আগেই দেবদারু বন শেষ হয়ে গেছে। এবার মাঝে মাঝে ভোজপত্র বৃক্ষ এবং ছোট দেবদারু গাছের মত দেখতে অন্য এক জাতের গাছ দেখতে পাওয়া গেল। এই সব গাছের পাতা দেবদারুর মত সরু নয়, অনেকখানি চওড়া। গাছগুলির ছাল হিমের মত সাদা। ভোজপাত্রে অনেক লিখেছি, তাই এতদিন জানতাম যে ভোজপত্র বোধ হয় কোন গাছের পাতা। এখন বিজ্ঞক আমার সামনে একটি গাছের ছাল খানিকটা কেটে এনে হাতে দিতে

বুঝলাম যে আমার এতদিনের ধারণা ভুল। আসলে গাছের ছাল। আধ আঙ্গুল মোটা ছালের মধ্যে কমপক্ষে পঁচিশখানি ভোজপত্র পাওয়া যায়, এমন সুন্দর স্তরে স্তরে সাজানো। এখান থেকে ভোজপত্র সংগ্রহ করে লোকেরা নিচেয় নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে এবং নিজেদের অন্যান্য কাজে লাগায়। বৃষ্টিতে ভোজপত্র নষ্ট হয় না। যদিও আমাদের দেশে পুঁথিপত্রের প্রচলন বেশীর ভাগ তালপত্র দিয়ে তৈরী। কিন্তু এখনও উত্তরাপথ, মধ্যদেশ প্রভৃতি জায়গায় চিঠিপত্র, পুঁথি-পুস্তকাদিতে ভোজপত্র ব্যবহার করা হয়।

দক্ষিণাপথ এবং সিংহলের অধিবাসীরা পার্বত্য এলাকা থেকে দূর হওয়ায় এবং দুষ্প্রাপ্য বলে ভোজপত্রের ব্যবহার বিশেষ একটা করে না। এই সকল পার্বত্য জাতিরা গ্রীষ্মকালে ভোজপত্র সংগ্রহ করে এবং সেগুলিকে চালান দিয়ে বিনিময়ে অনেক দীনার রোজগার করে। ভোজপত্রের জঙ্গলের মধ্যে কোথাও কোথাও হিম দেখতে পেলাম আমরা। আরও কিছুদূর গেলে হিমক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যাবে। এবার দূর থেকে হিমক্ষেত্র দেখা যেতে লাগল। পেঁজা তুলোর মত হিম জমে আছে পর্বতের গাছে স্তূপীকৃত অবস্থায়। আরও কিছুদূরে শুধু হিম ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। আমাদের সাথী পশুপালক ভোজপত্রের ঠোঙা করে মাথায় টুপির মত করে পরল এবং আর একটা পত্র চোখের উপর খানিকটা উঁচু করে বেঁধে নিল। আমাদের সকলকেও ওদের অনুকরণ করতে বললো। কারণ খোলা চোখে চারিদিকে শুধু হিম দেখতে দেখতে চোখ ব্যথা করে, কখনও কখনও দু-একদিনের জন্য অন্ধ হয়েও যায় কেউ কেউ। আমি টিপ্পনী কেটে চন্দ্রকে বল্লাম,—"এটাও বিষাক্ত পাতার মত কথা" কিন্তু চন্দ্র নিজেই চোখের উপর সবুজ পাতার ঢাকনা বেঁধেছে। আমার কথা শুনে চন্দ্র বল্লে—যাই বলো, এ সময় দু-চার দিনের জন্য অন্ধ হয়ে থাকাটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

পর্বতের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে আমাদের চলা থামল। আমরা চমরীর পিঠ থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের মাথার উপরে পূব

থেকে পশ্চিম দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু হিমাচ্ছাদিত পর্বতচূড়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। পিছন দিকে সবুজ গাছে ঘেরা পর্বতশ্রেণী ক্রমশ নিচের দিকে ছোট হয়ে নেমে গেছে।

পাটলিপুত্রে এ সময় গরম হাওয়া বইছে। লোকে ঘামে ভিজে পাতাল ঘরে আশ্রয় নিচ্ছে। আর এখানে আমরা একটার পর একটা গরম কাপড় গায়ে জড়িয়েও একটু গরম হতে পারছি না। কুমারামাত্যের দেওয়া লম্বা জুতো জোড়ার উপকারিতা অনুভব করতে লাগলাম। মাথা থেকে পা অবধি ঢাকা শুধুমাত্র নাক ও চোখ দুটো একটু খোলা। তবুও ঠাণ্ডায় যেন জমে যাচ্ছি। বিজ্জক বললো, ভাগ্যিস এ সময়ে হাওয়া নেই, নইলে আমাদের দুর্দশার সীমা থাকত না। আমি ভাবছিলাম, পাটলিপুত্র, খলতিকার তুলনায় এখানে আবহাওয়ার এমন অস্বাভাবিক পার্থক্য কেন। একই ভূমির উপর কোথাও ভীষণ গরম কোথাও অসহ্য ঠাণ্ডা।

ফেরবার সময় লক্ষ্য করলাম, আমরা যতই নিচেয় নামছি ততই গরম বাড়ছে। তখন বুঝলাম ওখানে একমাত্র উচ্চতার জন্যই অত ঠাণ্ডা। মনের মধ্যে নানাপ্রকার প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। তাই যদি হয় তাহলে উঁচুতে উঠতে উঠতে যদি সূর্যের কাছে যাওয়া যায় সেখানে আরও বেশী ঠাণ্ডা হবে। কিন্তু তাহলে সূর্যের আলো এত গরম হয় কেন?

আমরা এবার উল্টো দিক দিয়ে নিচেয় নামছি। এবার আর নামবার জন্য সওয়ারী বা বিষাক্ত বনের ঝামেলা নেই। চলতে চলতে চন্দ্র বললো,

—ওপরে উঠতে মেহনত হয় আর হাওয়ার খরচও বেশী। ওপরে বোধ হয় হাওয়াও কম। বিজ্জক চন্দ্র'র কথার রেশ টেনে বললো,

—আমাদের সৌভাগ্য যে আজ ওপরে হাওয়া একেবারেই ছিল না। নইলে ওপরে এমন হাওয়া বয় যে মানুষ গরু পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বিষাক্ত বন সম্বন্ধে আমাদের দুজনেরই সন্দেহ রয়ে গেল। হিমক্ষেত্র পার হয়ে এসে আমরা দাঁড়িয়ে আর একবার

পিছন ফিরে সূর্যের আলোয় প্রদীপ্ত রৌপ্যরাশিকে দেখে নিলাম। নামবার সময় রাস্তা কোথাও কোথাও খুবই দুর্গম। রাস্তা অবশ্য নামে মাত্র, গরু ভেড়ার ক্ষুর চিহ্ন দেখেই অনুমান করে নিতে হয় যে এটা রাস্তা। বিশেষ করে এ সকল অঞ্চলে একমাত্র পশুপালন বা ভোজপত্র সংগ্রহের জন্যই মানুষের পদচিহ্ন পড়ে। এক জায়গায় একজন শিকারীকে দেখলাম একটি কস্তুরী মৃগ শিকার করেছে। শিকারী মৃগটির নাভিদেশ থেকে উগ্র গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের একটি গুটলী বার করে নিয়ে আমাদের মাংসের ভাগ দিল। হরিণের মাংসের মতই স্বাদ লাগল সে মাংসের। কস্তুরী মৃগের গায়ে দুই রকমের লোম দেখতে পেলাম। এক রকম দেখলাম দেবদারু পাতার মত এবড়ো থেবড়ো সূঁচলো। তার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে খুব সূক্ষ্ম মোলায়েম লোমরাশি। শিকারীর কাছে শুনলাম যে, আজকাল এই জাতীয় কোমল ঊর্ণা (পশম) খুব কম দেখা যায়। শীতের সময় ঐ বড় বড় লোমগুলির মধ্যে এই রকম মোলায়েম সূক্ষ্ম লোমে ভরে যায়। তাতেই এদের শীত রক্ষা পায়। যেমন বর্ষাকালে বড় বড় গাছের নিচে কোমল তৃণরাজি দেখা যায়। এবার আমি বুঝতে পারলাম যে গান্ধার দেশীয় পাণ্ডু কম্বল অত মোলায়েম কেমন করে হয়। কারণ ভেড়ার লোম অত মোলায়েম হয় না! সেগুলি এই জাতীয় মৃগলোম দিয়ে তৈরী হয়।

সেদিন আমরা দেবদারু বনে পশুপালকের তাঁবুর মধ্যে রাত কাটালাম। এইখানেই কস্তুরী মৃগের মাংসের সদ্ব্যবহার করলাম আমরা। পরদিন প্রত্যেক পশুপালককে তিন দীনার বখশিস দিয়ে বিদায় দিলাম। তারা মহানন্দে তাদের রাস্তা ধরে চলে গেল। আমরা গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে নিচের দিকে এগুতে লাগলাম। এদিকে কেবলমাত্র ভেড়া-ছাগলের যাওয়া আসার পথ ধরেই চলতে হবে। আমাদের ভারবাহকদের মধ্যে একজন ভোজপত্র সংগ্রহ করতে এই রাস্তায় কয়েকবার যাতায়াত করেছে বলে এবার থেকে তাকেই পথ নির্দেশক হিসেবে নিযুক্ত করলাম।

এমনি কয়েকদিন পথ চলার পর গরম অনুভব করতে লাগলাম। দেবদারু বনও ক্রমশ পিছনে ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। এখান থেকে কনখল যাবার রাস্তা কিছুটা সুগম কিন্তু খলতিকা পৌঁছুতে আরও একটা বড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। আমরা কনখলের রাস্তায় পা বাড়ালাম। গঙ্গার জল এখানেও বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু এখান থেকে আরও কিছুটা গেলে সাধারণ জলের মতই মনে হয়। এখান থেকে গঙ্গা পিতৃভূমি ছেড়ে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করছে। কনখলের শাসনকর্তা যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং আমাদের খুব সমাদর করে স্বাগত জানাল। এতদিন পরে আবার রাজভোগের স্বাদ পেলাম। উডুম্বর বর্ণা দ্রাক্ষী সুরা ভর্তি কাঁচ কুতুপ (বোতল) হাতে পেয়ে চন্দ্র গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করল। পরিচারিকা চন্দ্রকে কুতুপ মুখে লাগিয়ে সুরাপান করতে দেখে হেসে ফেলতে চন্দ্র কুতুপ থেকে মুখ নামিয়ে বললো,

—সুন্দরী জানো কতদিন বাদে আজ এই অরুণ বর্ণা দ্রাক্ষা সুন্দরীর দর্শন পেলাম? এতদিন যবের মেরয় খেতে খেতে মুখ বিস্বাদে ভরে গেছে।

আমি বল্লাম,

—এ-যাত্রা তাহলে তোমার পছন্দ মত হয় নি চন্দ্র?

—পছন্দ? জয়, আজীবন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এই যাত্রার জন্যে। যাত্রার সময়ও আমার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তোমার জন্য একান্ত অনিচ্ছায় আমি রওয়ানা হয়েছিলাম, কিন্তু হিমালয় চিরকালের জন্য আমাকে তার ভক্ত করে নিয়েছে।

কনখল থেকে কিছুদূর ঘোড়ায় গিয়ে আমরা পাটলিপুত্রের উদ্দেশ্যে নৌকায় চাপলাম। কুমারামাত্যের নামে একটি চিঠি ও পুরস্কার দিয়ে এখান থেকে বিজ্জককে বিদায় দিলাম। একই নৌকায় আমরা কান্যকুব্জ পর্যন্ত গেলাম, সেখান থেকে অন্য নৌকায় চাপলাম। বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিন মাস দীর্ঘ ভ্রমনের পর আমরা পাটলিপুত্র পৌঁছে অজ্জুকাকে অভিবাদন জানালাম।

পিছন ফিরে সূর্যের আলোয় প্রদীপ্ত রৌপ্যরাশিকে দেখে নিলাম। নামবার সময় রাস্তা কোথাও কোথাও খুবই দুর্গম। রাস্তা অবশ্য নামে মাত্র, গরু ভেড়ার ক্ষুর চিহ্ন দেখেই অনুমান করে নিতে হয় যে এটা রাস্তা। বিশেষ করে এ সকল অঞ্চলে একমাত্র পশুপালন বা ভোজপত্র সংগ্রহের জন্যই মানুষের পদচিহ্ন পড়ে। এক জায়গায় একজন শিকারীকে দেখলাম একটি কস্তুরী মৃগ শিকার করেছে। শিকারী মৃগটির নাভিদেশ থেকে উগ্র গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের একটি গুটলী বার করে নিয়ে আমাদের মাংসের ভাগ দিল। হরিণের মাংসের মতই স্বাদ লাগল সে মাংসের। কস্তুরী মৃগের গায়ে দুই রকমের লোম দেখতে পেলাম। এক রকম দেখলাম দেবদারু পাতার মত এবড়ো থেবড়ো সূঁচলো। তার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে খুব সূক্ষ্ম মোলায়েম লোমরাশি। শিকারীর কাছে শুনলাম যে, আজকাল এই জাতীয় কোমল ঊর্ণা (পশম) খুব কম দেখা যায়। শীতের সময় ঐ বড় বড় লোমগুলির মধ্যে এই রকম মোলায়েম সূক্ষ্ম লোমে ভরে যায়। তাতেই এদের শীত রক্ষা পায়। যেমন বর্ষাকালে বড় বড় গাছের নিচে কোমল তৃণরাজি দেখা যায়। এবার আমি বুঝতে পারলাম যে গান্ধার দেশীয় পাণ্ডু কম্বল অত মোলায়েম কেমন করে হয়। কারণ ভেড়ার লোম অত মোলায়েম হয় না! সেগুলি এই জাতীয় মৃগলোম দিয়ে তৈরী হয়।

সেদিন আমরা দেবদারু বনে পশুপালকের তাঁবুর মধ্যে রাত কাটালাম। এইখানেই কস্তুরী মৃগের মাংসের সদ্ব্যবহার করলাম আমরা। পরদিন প্রত্যেক পশুপালককে তিন দীনার বখশিস দিয়ে বিদায় দিলাম। তারা মহানন্দে তাদের রাস্তা ধরে চলে গেল। আমরা গঙ্গার উপত্যকা দিয়ে নিচের দিকে এগুতে লাগলাম। এদিকে কেবলমাত্র ভেড়া-ছাগলের যাওয়া আসার পথ ধরেই চলতে হবে। আমাদের ভারবাহকদের মধ্যে একজন ভোজপত্র সংগ্রহ করতে এই রাস্তায় কয়েকবার যাতায়াত করেছে বলে এবার থেকে তাকেই পথ নির্দেশক হিসেবে নিযুক্ত করলাম!

এমনি কয়েকদিন পথ চলার পর গরম অনুভব করতে লাগলাম। দেবদারু বনও ক্রমশ পিছনে ক্ষীণ হয়ে যেতে লাগল। এখান থেকে কনখল যাবার রাস্তা কিছুটা সুগম কিন্তু খলতিকা পৌঁছুতে আরও একটা বড় পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়। আমরা কনখলের রাস্তায় পা বাড়ালাম। গঙ্গার জল এখানেও বেশ ঠাণ্ডা, কিন্তু এখান থেকে আরও কিছুটা গেলে সাধারণ জলের মতই মনে হয়। এখান থেকে গঙ্গা পিতৃভূমি ছেড়ে সমতল ভূমিতে প্রবেশ করছে। কনখলের শাসনকর্তা যুবরাজ চন্দ্রগুপ্ত এবং আমাদের খুব সমাদর করে স্বাগত জানাল। এতদিন পরে আবার রাজভোগের স্বাদ পেলাম। উদুম্বর বর্ণা দ্রাক্ষী সুরা ভর্তি কাঁচ কুতুপ (বোতল) হাতে পেয়ে চন্দ্র গভীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে পান করল। পরিচারিকা চন্দ্রকে কুতুপ মুখে লাগিয়ে সুরাপান করতে দেখে হেসে ফেলতে চন্দ্র কুতুপ থেকে মুখ নামিয়ে বললো,

—সুন্দরী জানো কতদিন বাদে আজ এই অরুণ বর্ণা দ্রাক্ষা সুন্দরীর দর্শন পেলাম? এতদিন যবের মেরয় খেতে খেতে মুখ বিস্বাদে ভরে গেছে।

আমি বল্লাম,

—এ-যাত্রা তাহলে তোমার পছন্দ মত হয় নি চন্দ্র?

—পছন্দ? জয়, আজীবন আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব এই যাত্রার জন্যে। যাত্রার সময়ও আমার ইচ্ছে ছিল না। শুধু তোমার জন্য একান্ত অনিচ্ছায় আমি রওয়ানা হয়েছিলাম, কিন্তু হিমালয় চিরকালের জন্য আমাকে তার ভক্ত করে নিয়েছে।

কনখল থেকে কিছুদূর ঘোড়ায় গিয়ে আমরা পাটলিপুত্রের উদ্দেশ্যে নৌকায় চাপলাম। কুমারামাত্যের নামে একটি চিঠি ও পুরস্কার দিয়ে এখান থেকে বিজ্জককে বিদায় দিলাম। একই নৌকায় আমরা কান্যকুব্জ পর্যন্ত গেলাম, সেখান থেকে অন্য নৌকায় চাপলাম। বর্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তিন মাস দীর্ঘ ভ্রমনের পর আমরা পাটলিপুত্র পৌঁছে অজ্জুকাকে অভিবাদন জানালাম।

॥ আট ॥

পাটলিপুত্রে অন্তিম বৎসর

আচার্য বসুবন্ধু বর্ষা বাসের জন্য সাকেত গেছেন, কিন্তু প্রবারণা (আশ্বিন-পূর্ণিমা) শেষ হলেই আবার পাটলিপুত্রের অশোকারামে ফিরে আসছেন। গত কয়েক মাস পুঁথিপত্রে হাত পড়ে নি। অবশ্য এই সময় পিতার কাছে এবং তারপর হিমালয়ের কোলের দিনগুলি বাজে নষ্ট হয় নি। এখন নিজেকে অন্য মানুষ বলে মনে হচ্ছে। ছয় মাস আগে যখন পাটলিপুত্র ছেড়েছিলাম, তখন শৈশব সীমার মধ্যে ছিলাম। এখন সব দিক দিয়ে নিজেকে তরুণ মনে হচ্ছে। অজ্জুকা আমাদের হিমালয় যাত্রার কথা কয়েকদিন যাবত বারবার জিজ্ঞাসা করতেন। আমি অবশ্য উৎসব সঙ্কেতের সব কীর্তি বলিনি তবে যা যা বলেছি তার মধ্যে প্রধান হল তারা বৌদ্ধধর্ম মানে এবং কয়েক জায়গায় দু একজন করে বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখেছি। অজ্জুকা উৎসাহিত হয়ে বল্লেন,

—তাহলে আমি সঙ্ঘের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলব, যেন উৎসব সঙ্কেতে একটা বিহার নির্মাণ করে দেওয়া হয়। সেখানে এক-দেড়শ জন ভিক্ষু থাকবে, তারা লোকদের উপদেশ দেবে।

পরে এই কাজের জন্য অজ্জুকা একসহস্র দীনার দান করলেন। তাই দিয়ে উৎসব সঙ্কেতের এক রমণীয় স্থানে এক সুন্দর সুগতালয় এবং ভিক্ষু আবাস তৈরী হল। এই কাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর করবার জন্য পাটলিপুত্র এবং মথুরা থেকে শত শত প্রস্তর শিল্পী এবং মূর্তিকার পাঠানো হল। কিন্তু আমার মনে এক সন্দেহ রইল, যে ভিক্ষুরা উৎসব সঙ্কেতে গিয়ে নিজ ধর্ম প্রচারের বদলে সেখানকার ধর্মে প্রভাবান্বিত হয়ে যাবে।

কার্তিক পূর্ণিমায় আচার্য অশোকারামে এসে পৌঁছলেন। আবার আমার পড়াশুনো আরম্ভ হল। আচার্যের কাছে মাত্র আড়াই বৎসরে যতখানি বিদ্যা অর্জন করেছি, তারপরে আমার সম্পূর্ণ শিক্ষাজীবনে ততখানি শিখতে পারিনি। বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্রে আমার অধিক রুচি ছিল। পূর্বে কিছু কিছু দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধীয় পুঁথিপত্র পড়েছি কিন্তু বিশাল দর্শন জ্ঞান এখন কিছু কিছু অনুভব করতে পারছি। আচার্যও আমাকে তাঁর দর্শনবিদ্যা দান করবার উপযুক্ত পাত্র বলে ঠিক করলেন। সে জন্য তিনি বিশেষ করে দর্শনশাস্ত্র খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াতেন। তাঁর মুখে যবন দার্শনিকদের সুখ্যাতির কথা শুনে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম,

—যবন জাতির মধ্যে কি খুব বড় দার্শনিক ছিলেন কেউ ?

—নিশ্চয়। অনেক বড় বড় দার্শনিক ছিলেন যবন জাতির মধ্যে। যেমন হেরাকিলতু (খৃঃ পূঃ ৫৩৫—৪২৫) দেমোক্রেতু (খৃঃ পূঃ ৪৬০—৩৭০), সুক্রাত (খৃঃ পূঃ ৪৯৯—৩৯৯), প্লাঁতো (অফলাতো খৃঃ পূঃ ৪২৭—৩৪৭), অরিস্তাঁত (৩৮৪—২২ খৃঃ পূঃ) এদের মত বড় বড় দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

—আমাদের দেশে যে সকল বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিক জন্মেছেন, যবন দার্শনিকেরা কি তাঁদের চেয়েও বড় ?

—তুলনা করে কারো সম্বন্ধে ঠিক বলা যায় না। কতকগুলি বিষয়ে আমাদের দেশের দার্শনিকেরা অনেক বড়, আবার কতকগুলি বিষয়ে যবন দার্শনিকেরা বড়।

—অর্থাৎ আমরা যবন দর্শনের কাছে ঋণী ?

—নিঃসন্দেহ। তবে আজকালকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা সে কথা মানতে চায় না।

—তবুও এরা যবনদের কাছ থেকে বহু কিছু তথ্য ধার করেছেন।

—নিশ্চয়। প্রায় তিন শ' বৎসর হল সাকেত নিবাসী ব্রাহ্মণী সুবর্ণাক্ষীপুত্র ভদন্ত অশ্বঘোষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন কণিষ্ক সেনাপতি মগধের ভিক্ষু সঙ্ঘের কাছে একজন মহাবিদ্বান পণ্ডিত

চেয়েছিলেন গান্ধার নিয়ে যাওয়ার জন্য। তখন ভদন্ত অশ্বঘোষই এমন একজনমাত্র ছিলেন যিনি প্রথম গান্ধার দেশে গিয়ে যবন দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি অবশ্য ঋণের কথা স্বীকার করেছেন।

—অশ্বঘোষ কোন কোন দার্শনিককে অধিক পছন্দ করতেন ?

—একটু আগে আমি যাদের নাম করলাম। হেরাক্লিতু যবন দেশে যে সিদ্ধান্ত প্রচার করেছিলেন এখন আমাদের বুদ্ধ দর্শনের মধ্যে সেই সকল সিদ্ধান্তই দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলতেন এ পৃথিবীতে কোন জিনিষই স্থির নয়। পরিবর্তনই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র নিয়ম। ধারা পরিবর্তনশীল। একই ধারায় আমরা দুবার নামতে পারি না। দ্বিতীয় ধারাতে যখন নামি তখন প্রথম ধারা সে স্থান ত্যাগ করেছে। অথবা পরমুহূর্তেই একই ধারার সমস্ত স্পর্শটুকু বিলীন হয়ে গেছে। দেমোক্রাতু ধারার এই পরিবর্তনকে স্বীকার করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে বিন্দুগুলি স্থির।

—এই বিন্দু কি জিনিষ ?

—বিন্দু শব্দটা উপমা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। জড় বস্তুর মধ্যে দেখ, যেমন, ইট, পাথর, কাঁচ, মণি প্রভৃতি সবটাতেই অনবরতঃ পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু এই সকল জিনিষ যে সকল সূক্ষ্ম পরমাণু দ্বারা তৈরী হয়েছে, সেগুলি একই রসের সদা স্থির রূপ।

—তিনি তাহলে স্থির ও অস্থির দুটিতেই বিশ্বাস করতেন ?

—হ্যাঁ, কিন্তু প্লাতো এই জড় পরমাণুগুলিকে বিশ্বের সূক্ষ্মতম ইট বলে স্বীকার করেন না। তাঁর মতে সর্বশেষ সূক্ষ্মতম ইট হল বিজ্ঞান-চেতনা।

—তাহলে বিজ্ঞানকে তিনি নিত্য মানতেন ?

—হ্যাঁ। আমার অগ্রজ অসঙ্গ প্লাতোর এই সিদ্ধান্তে বিশ্বাস রাখেন যে বিশ্বের মূল কারণ বিজ্ঞান। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বুদ্ধের "সর্ব অনিত্য" সিদ্ধান্তকেও বিশ্বাস করেন।

—তাহলে বিশ্বের অন্তস্থলে বিজ্ঞানধারা প্রবাহিত হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, ঐ বিজ্ঞানধারাই বিশ্বের রূপে ব্যক্ত হয়ে চলেছে। এই সিদ্ধান্তকে আর্য অসঙ্গ খুব জোর গলায় প্রচার করেছেন। ভদন্ত অশ্বঘোষ পরমাণু সিদ্ধান্তকে ব্যবহারিকরূপে স্বীকার করেছেন বটে কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে ঐ বিজ্ঞান প্রবাহকেই আসল তত্ত্ব বলে মেনে নিয়েছিলেন। অসঙ্গ সেই বিজ্ঞান দর্শনকেই স্পষ্ট করে প্রচার করছেন এখন।

—আর সুক্রাত, অরিস্তাঁত এরা ?

—সুক্রাতের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমরা তার শিষ্য প্লাতোর গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। তিনি কোন পুস্তক রচনা করে যান নি। তথাগতও কোন পুস্তক লেখেন নি। শত শত বৎসর যাবত তাঁর উপদেশ, তাঁর বাণী, কাহিনী লোকের মুখে মুখে কণ্ঠস্থ হয়ে আসছে।

—ও, তাহলে দীর্ঘ আগম, মধ্যম সংযুক্ত আগম আদি যে সকল গ্রন্থ এখন দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি তাহলে বুদ্ধদেবের রচনা নয় ?

—না, তথাগত কোন পুস্তক লিখে যান নি।

—তাহলে ত অনেক কিছুই বাইরের কথা এবং মনগড়া সিদ্ধান্তও এখন এই পুস্তকের মধ্যে এসেছে।

—তা এসেছে বৈ কি। এখনও বিনয় ভিক্ষু ভিক্ষুনীয়াদের আচার প্রভৃতি মৌখিক পড়া হয়, কোনও পুস্তক নেই।

—বুদ্ধদেবের জীবিতাবস্থায় কোন পুস্তক রচনা হয় নি কেন ?

—তার কারণ, তখন পুস্তকের প্রচলন খুবই কম ছিল। তাছাড়া বুদ্ধদেব যথার্থ দৃষ্টি (দর্শন) দিতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি বলতেন, আমার কথা তোমরা গৌরব বলে অন্ধভাবে গ্রহণ করো না, তোমাদের বুদ্ধি দিয়ে অনুভব শক্তি দিয়ে যেটাকে ভালো বলে বিবেচনা করবে সেইটাকে গ্রহণ করো। তাছাড়া তাঁর জীবনে ৪৪ বৎসর বয়স অবধি তিনি যৌধেয় ভূমি থেকে অঙ্গভূমি পর্যন্ত বিচরণ করে বেড়িয়েছেন শুধু লোকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, লোকের সন্দেহের সমাধান করে, ভুল ভেঙ্গে দিতে। এ সময় ত কোন পুস্তক রচনা সম্ভব নয়।

—তথাগতের জীবনই তাহলে তাঁর গ্রন্থ।

—হ্যাঁ, তাঁর এই চুয়াল্লিশ বৎসর জীবন গ্রন্থই এখন আমরা সূত্র-বিষয়, এবং অভিধর্ম পিটক'এর রূপে দেখতে পাচ্ছি।

—যা সব শতাব্দীরও বেশী কোন তালপত্র বা ভোজপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয় নি ?

—ঠিক তাই। সেই জন্যেই এখন আমাদের সামনে যে পিটক রয়েছে, তার সম্বন্ধে জোর করে বলতে পারি না যে এইগুলি সবই বুদ্ধদেবের শ্রীমুখ নিস্থত বাণী। অথচ এ ছাড়া আমাদের আর কোন উপায়ও নেই।

—সে সময় বোধ হয় ভাষাও অন্য রকম ছিল ?

—অশোকের লিপির ভাষা তুমি পড়েছ। সেগুলি আজ থেকে পাঁচ শত বৎসর আগের কথা, তারও আড়াই শ' বৎসর আগে ভগবান বুদ্ধ জন্মেছিলেন। সেইগুলির ক্রমবিবর্তন দেখেই অনুমান করা যায় যে, তখন নিশ্চয় ভাষার অন্য কোন রূপ ছিল।

—কিন্তু ভন্তে! আজ যে পিটক আমাদের সামনে রয়েছে, সেগুলি ত ভাঙ্গা ভাঙ্গা সংস্কৃত ভাষায় লেখা।

—হ্যাঁ, সর্বাস্তিবাদীদের পিটকের ভাষা সংস্কৃত। আরো অনেক বৌদ্ধ সম্প্রদায় আছে যাদের ভাষা সংস্কৃত। কিন্তু সিংহলী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পিটকের ভাষা পুরানো কৌশলী (পালী) ভাষা।

—তাহলে বুদ্ধ যে ভাষায় উপদেশ দিয়েছিলেন, সিংহলীরা সেই ভাষা আজও সুরক্ষিত রেখেছে ?

—ঠিক সুরক্ষিত বলা যায় না। কারণ সেখানেও কয়েক শ' বৎসর যাবত পিটক কণ্ঠাগ্রে চলে আসছে। তবুও আমার মতে তাদের ভাষা বুদ্ধ-বচনের খুব কাছাকাছি।

—তাহলে কি এমনি করেই সুক্রাতের উপদেশ সমূহ সংগ্রহ করা হয়েছে ?

—প্রায়। সুক্রাতকে বিষপান করিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। সে সময় সমস্ত রাজ্য তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

—তখন কোন রাজা ছিল ?

—রাজা তখনও কেউ ছিল না। সুক্রাতের মৃত্যুরও অর্ধশতাব্দী পরে এথেন্সে রাজতন্ত্র প্রবর্তন হয়।

—তাহলে গণতান্ত্রিকরা তাঁকে হত্যা করেছিল?

—দোষ ঠিক গণতান্ত্রিকদের ছিল না। গণতন্ত্রের ধনী সত্ত্বাধারীদের দোষ ছিল।

—তা আমি জানি, গণতন্ত্রের ধনিক সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি তার পক্ষে খুবই বিপদের কথা।

—তখন দেব-দেবী এবং ধর্মের নামে যে সকল শত শত কাহিনী এবং মিথ্যা বিশ্বাস প্রচার করা হচ্ছিল, সুক্রাত সে সবের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে 'ও সব ছেলেমানুষী উপকথা' এবং জনগণের ভুল শুধরে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। তখন এথেন্সের ধনী সম্প্রদায়ের অর্থের দাস সদস্যেরা সুক্রাতের সিদ্ধান্তকে এবং সুক্রাতকে বিষবৎ দেখতে লাগলেন এবং তারা ভয় পেলেন। কারণ এথেন্সে তখন ধনী গরীবদের ভেদাভেদ দেবতাদের দোহাই দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল।

—তার মানে তারা ভেবেছিল যদি জনগণের বিশ্বাস হয়ে যায় যে দেব-দেবীদের ঐ সব কাহিনী অমূলক, তাহলে শীত-গ্রীষ্মে গায়ের রক্ত জল করে ধনীদের জন্য অর্থ সঞ্চয়কারী দাস—কিষাণ শিল্পী রাজপ্রাসাদ, পুরোহিত প্রাসাদ, শ্রেষ্ঠী প্রাসাদ সকল ধূলোয় মিশিয়ে দেবে।

—অনেকটা তাই, তবে রাজ্যের লোকের মনে দেব-দেবীদের সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাস ছিল বলে ধনীরা তাদের মনে বিশ্বাস জাগাতে পেরেছিল যে, সুক্রাত আমাদের দেবতাদের অপমান করেছে, সে অধর্মী এবং আমাদের তরুণদেরও অধর্মী করে তুলতে প্ররোচনা দিচ্ছে।

—আর অমনি সুক্রাতকে বিষের পেয়ালা দেওয়া হল?

—হ্যাঁ, সুক্রাত সব জেনে শুনে আনন্দের সঙ্গেই সে পেয়ালা হাতে করে নিয়েছিলেন।

—কিন্তু সুক্রাতের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি এটা খুবই লজ্জার কথা।

—হ্যাঁ, এখনও প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি, বাকী আছে।

—এখন আর বাকী থাকলেই বা লাভ কি? যারা বিষ দিয়েছিল, তারা ত আর কেউ বেঁচে নেই।

—হলই বা, তার জন্য যুগধর্ম রয়েছে, যে কাউকে ক্ষমা করে না। সুক্রাতের মত আমাদের দেশেও যদি কেউ প্রচার করতে আরম্ভ করে বলতো—যে এই দেবদেবী সব মিথ্যে, তাদের দোহাই দিয়ে মেহনতকারীদের রোজগার ঠকিয়ে লুঠ করে ধনী হওয়া অন্যায়। তার বদলে আমাদের এমন গণ-সংস্থা স্থাপন করতে হবে যেখানে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ থাকবে না। সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতা অনুসারে কাজ করবে এবং তার প্রয়োজন মত খাওয়া-পরা এবং অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রী তাকে দেওয়া হবে। তাহলে কি হত বলতো?

—বুঝতে পেরেছি আচার্য। সুক্রাত কি ঐ সকল সিদ্ধান্তই প্রচার করতে চেয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু তিনি কোনও পুস্তক রচনা করে যান নি। পরে তাঁর শিষ্য প্লাতো "গণ" নামক পুস্তক লিখেছিলেন এবং তার মধ্যে নিজ গুরুর এই মতবাদ এবং উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

—গণের দোষ সকল সুক্রাত যেমন অনুভব করেছিলেন, আমিও দেখছি যৌধেয় গণের মধ্যে সেই একই দোষ ক্রমশ বেড়ে উঠছে। আমি যদি অগ্রোদকার সুক্রাত হতে চাই তাহলে আমার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার নিশ্চয় হবে, যেমন এথেন্সবাসী সুক্রাতের সঙ্গে করেছিল।

—এ ত সাধারণ কথা। অর্থ এমনি জিনিষ যার জন্য মানুষ সব কিছু করতে পারে। অনায়াসে জঘন্যতম কাজ করতে পারে। তাছাড়া গণসঙ্ঘের মধ্যে এমন সব দোষ রয়ে গেছে যা শোধরাবার মত কেউ জন্মায়নি। গণসঙ্ঘও গরীব কিষাণ মজুরদের মেহনত লুঠ করাকে ধর্ম বলে মানে। সেই জন্যেই সুক্রাত বলেছিলেন —গণসঙ্ঘের সদস্য এবং রাষ্ট্রপরিচালনার ভার তাদেরই দেওয়া উচিত যাদের নিজের কোন সম্পত্তি নেই, এমন কি নিজের স্ত্রীও নেই।

—স্ত্রী না থাকবার কি কারণ ভন্তে? তাহলে সুক্রাত কি চাইতেন যে রাষ্ট্র পরিচালনার ভার ভিক্ষুদের হাতে দিতে?

—না। তিনি ভিক্ষুবৃত্তির ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি বলেছেন যে গণ-সঞ্চালকদের যদি পৃথক পৃথক স্ত্রী থাকে তাহলে তাদের পৃথক পুত্র-কন্যা জন্মাবে, তাদের জন্য পিতা পক্ষপাত করবে এবং ক্ষমতার দুরুপযোগ করবে। অতএব গণসঞ্চালকদের স্ত্রী, ঘর-দুয়ার সব কিছু যৌথ প্রথায় হওয়া উচিত।

—ও হো! সুক্রাত তাহলে সে কথাও ভেবেছিলেন? মাত্র কয়েকদিন আগে আমি উৎসব সঙ্কেতে যৌথ পত্নী দেখে এসেছি।

—উৎসব সঙ্কেতবাসী এখনও অনেক পিছনে পড়ে আছে তাই অমন দেখতে পেয়েছ। যৌধেয়গণ অথবা পাটলিপুত্রের জনগণের মত তারা যদি অর্থ সঞ্চয় করবার সুযোগ পায়, তাহলে এ প্রথা আর বেশী দিন সেখানেও চলবে না।

—তাহলে এ পৃথিবীতে কারও ভালো করতে চাইলে স্বার্থপরেরা সেটাকে মন্দ চোখে দেখে। যেমন সুক্রাতকে একেবারে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেওয়া হল।

—হ্যাঁ, শুধু নিজের পরলোক তৈরী করো। পরজন্ম সুখময় করতে চেষ্টা করো। গণের ধনী সদস্য, রাজ্যের পরম ভট্টারক এবং ব্রাহ্মণরা তোমার উপর প্রসন্ন থাকবেন আর তোমার মাথায় দীনার বর্ষণ হবে। আর যদি দুনিয়ার ভালো করবার কথা চিন্তা করেছ তাহলে সুক্রাতের মত অবস্থা হবে।

—কিন্তু ভন্তে! এই শ্রেণীর লোকেরা যত অর্থ দান-পূণ্যের পিছনে ব্যয় করে, সেটা সমাজের মঙ্গলের জন্য ব্যয় করে না কেন?

—না, তাতে দুনিয়ার বা রাজ্যের কোন উপকারই হয় না। যেমন মনে করো পরম ভট্টারকের তিন কোটি প্রজা আছে। পরম ভট্টারক তাদের মঙ্গলের জন্য তিন কোটি দীনার দান করলেন। ফলে মাথাপিছু এক দীনার হিসেবে প্রজারা পেল। তাতে প্রজাদের কারুরই দুঃখ মিটবে না বরং ঐ তিন কোটির জন্য রাজার রাজকোষ

শূন্য হয়ে যাবে। রাজার বিলাস-ব্যসন হ্রাস করতে হবে। অন্তঃপুরে রাণী পরিচারিকার সংখ্যা কমে যাবে এমন কি রাজাকে কিছুদিন পরে নাম বজায় রাখতে সিংহাসন ছেড়ে চাটাইয়ের উপর বসতে হতে পারে। তিন কোটি দীনার জমা করতে কত কষ্টই করতে হয় কিন্তু তিন কোটি দান করলে কারো কোনও উপকার হল না। তার চেয়ে দুই কোটি নিরানব্বুই লক্ষ নিজের জন্য খরচ করুক আর বাকী এক লক্ষ দীনার দিয়ে দেশের মাঝে দুটি দেবালয়, একটি চৈত্য নির্মাণ করে দিক, একটা যজ্ঞ করে ব্রাহ্মণদের কিছু দানধ্যান করুক, তখন দেখবে দেশের লোক রাজার জয়-জয়কারে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করবে। হরিসেন গিয়ে পাথরের গায়ে রাজার গুণকাহিনী খোদাই করে দেবে।

—হুঁ, আর পরম ভট্টারককে ধর্মের অবতার বলে আখ্যা দেবে।

—দেখলে ত কোনটা সোজা। দুনিয়ার মঙ্গল করতে যাওয়া না নিজের পরলোকের পথ তৈরী করা।

—ঠিক বলেছেন আচার্য, যে সব শ্রমণ ব্রাহ্মণদের দান ধ্যান করবেন, তারা আনন্দে প্রচার করে বেড়াবেন যে রাজা নিজ পুণ্যের ফলে রাজা হয়েছেন এবং পুণ্যবলে এত সুখ ভোগ করছেন। আর দরিদ্র প্রজারা গায়ের রক্ত জল করে অন্ন এবং ধন তৈরী করেও পূর্বজন্মের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ ভোগ করছে। অতএব লাঠিও ভাঙল না আর সাপও মরল।

আচার্য আমার কথা শুনে হেসে বল্লেন ঃ

—বৎস জয়! তুমি নিশ্চয় আমার মনের কথা বুঝতে পারবে। বৃদ্ধ বয়সে তোমার মত শিক্ষার্থী পেয়ে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি। আমি গান্ধারে যাচ্ছিলাম যে কোনও রাজকুল থেকে ভাল একজন শিক্ষার্থীকে বেছে নিয়ে শিক্ষা দিতে যাতে পরে সে পৃথিবীর কিছু মঙ্গল করতে পারে। আমি জানি যে অরিস্তঁাত আমার জন্মের ছয় শতাব্দী পূর্বে এই প্রচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

—তিনি কি করেছিলেন আচার্য?

—তিনি প্লাতোর শিষ্য ছিলেন। প্লাতো নিজের চোখের সামনে নিজ গুরুকে হত্যা করতে দেখেছিলেন। আর প্লাতোর শিষ্য অরিস্তঁাত সেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন।

—খুনের বদলে খুন ?

—খুনের বদলে খুন অদূরদর্শীরাই করে। যেমন কিছুক্ষণ আগে আমি তোমাকে বললাম যে, তুমি যদি যৌধেয়গণের মধ্যে গিয়ে সুক্রাতের মত সবাইকার মঙ্গল করতে চাও, ধনীদের বলো যে তোমরা গরীবদের মধ্যে তোমাদের পাপের অর্থ ভাগ করে দিয়ে তাদের সঙ্গে এক হয়ে বাস করো তাহলে তোমাকেও বিষের পেয়ালা হাতে করে সুখী মনে পান করতে হবে। আর যদি পরম ভট্টারকের রাজত্বে অমন কাজ করো তাহলে পরম ভট্টারক তোমাকে অত সহজে মরতে দেবে না। তোমার শরীর থেকে একটু একটু করে মাংস কেটে নিয়ে নূন ছিটিয়ে দিতে থাকবে যতক্ষণ তুমি বেঁচে থাকবে।

—হ্যাঁ তা আমি মানি।

—প্লাতো যখন বুঝতে পারলেন যে ধন ঐশ্বর্যের কারণেই সকল অশান্তি। অর্থাৎ ধনের জন্য প্রভুতা, প্রভু হবার অবসর পেয়ে অধিক ধন লুঠ করবার সুযোগ আর সে রাস্তায় বাধা দিতে গেলে তার মাথায় বজ্রপাত। তখন তার একমাত্র উপায় হল এই ধন ঐশ্বর্যের মধ্যে "আমার আমার তোমার তোমার" ভাবটি না থাকে। তাই সমস্ত জীবন ভোর প্লাতো সেই চেষ্টাই করে গেছেন। সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তার "গণ" নামক গ্রন্থ লিখেছিলেন। সুক্রাতের মৃত্যু ঘটিয়ে অনেক লোক পরে অনুতাপও করেছিল। কারণ সকল সদস্যরা ধনী ছিল না, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন, পরে সেই কারণেই প্লাতো'র হাতে বিষের পেয়ালা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অরিস্তঁাত নিজের গুরু এবং তস্যগুরুর উদ্দেশ্য পূর্ণ করবার জন্য মনে করেছিলেন "যদি আমি কোনও রাজকুমারকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে আমার মনের মত করে গঠন করতে পারি, তাহলে তার শক্তি ও সহায়তায় আমার

উদ্দেশ্য সফল হতে পারে"। সেই উদ্দেশ্যে তিনি রাজা ফিলিপের পুত্র অলিকসুন্দর (সিকান্দার)-কে উপযুক্ত শিষ্য মনে করে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু সিকান্দার দুনিয়ার কতখানি ভালো করেছিলেন তা তোমরা জানো। তিনি আজীবন পৃথিবীতে রক্তের হোলি খেলে গুরুর আশায় ছাই দিয়েছেন।

—অরিস্তঁাতের নির্বাচনের ভুলের জন্যই এ কাণ্ডটা হতে পেরেছিল। গণ-সন্তানের উপর তবুও খানিকটা ভরসা করা যায়, কিন্তু রাজকুমারকে দিয়ে এই কাজের আশা করাও বোকামী।

—সেই ভুল করেছিলেন অরিস্তঁাত।

—আমি বুঝতে পেরেছি ভন্তে! খুনের বদলে খুন করা খুবই সোজা। কিন্তু একটা মানুষের পক্ষে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা অসম্ভব। তাছাড়া একাধিক ব্যক্তি মিলেও হঠাৎ এ কাজ করা যায় না। তবুও যা উচিত তাই আমাদের করা কর্তব্য।

—অর্থাৎ বহুজনহিতায়?

—হ্যাঁ, যা বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় তাই করাই আমাদের কর্তব্য। তথাগত তাঁর প্রথম শিষ্যকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, "চরথ ভিক্ষবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়"।

—কিন্তু ভন্তে, তিনি তাঁর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারলেন না কেন?

—সকল কারণগুলি আমি অবশ্য জানি না। তবে তথাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে "আমার-তোমার" বিচার তুলে দেবার জন্য খুব কড়া নিয়ম করেছিলেন। নিয়মগুলি এখনও "বিনয় পিটকে" লেখা আছে। কিন্তু তথাগতের মৃত্যুর পর একশত বৎসরও হয়নি, তার মধ্যেই ভিক্ষু-সঙ্ঘের মধ্যে "আপন-পর" ভাব প্রবিষ্ট হল। তথাগতের নিয়ম ছিল নিজ দেহের বস্ত্র এবং তাকে সেলাই করবার সূঁচ, ভিক্ষাপাত্র ছাড়া আর সব কিছু ভিক্ষু সঙ্ঘের যৌথ সম্পত্তি। কিন্তু তার বদলে ভিক্ষুগণ সোনা, অর্থ এবং পণ্য জমা করে নিজেদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে আরম্ভ করলেন। সমস্ত পৃথিবী যখন "যার যার তার তার"

চিন্তায় ডুবে আছে, তার মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভিক্ষু কেমন করে নিজেদের চরিত্র বজায় রাখবে ?

—এখন সেই জন্যে ভিক্ষুদের মধ্যেও ধনী-গরীব দেখতে পাওয়া যায়।

—হ্যাঁ, ভিক্ষু-সঙ্ঘের উপর তথাগত যে আশা রাখতেন তা পূর্ণ হয়নি।

—তাহলে ভন্তে, দুনিয়ার আর কোনও আশা নেই ?

—না বৎস, নিরাশা জীবনের চিহ্ন নয়! আশা আছে বৈ কি।

গত আড়াই বৎসর যাবত আমিই যে শুধু শিক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম, তা নয়। আচার্য নিজেও তাঁর সমস্ত বিদ্যাটুকু আমাকে নিঃশেষে দান করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলেন। কতবার যে তিনি আমাকে নিয়ে গেছেন রাজগৃহে তার ইয়ত্তা নেই। সেখানে আমি গৃধ্রকূটের বড় শিলার উপর বসতাম সামনে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে নতুন নতুন উপদেশ দিতেন। তাঁর সুগৌর শরীরের একাংশ লাল রংয়ের চীবর দিয়ে ঢাকা। তাঁর চোখে-মুখে দেখতাম করুণা আশা ও বেদনার অদ্ভুত ছাপ। ডান হাত তুলে পাঁচ পাহাড়ে ঘেরা শূন্য ভূমির দিকে দেখিয়ে তিনি বলতেন,

—বৎস! এখানে এক সময় বিরাট এক মহানগরী ছিল। কতই না হাট-বাট, বড় বড় চৌরাস্তা আর প্রাসাদশ্রেণী ছিল এখানে। ধনীদের সুন্দর সুন্দর মহল, তার মধ্যে সযত্ন সজ্জিত প্রকোষ্ঠ, তার মধ্যে শৃঙ্গার বিভূষিত কামিনীরা কেলি করত। ঐ দক্ষিণ কোণে রাজা বিম্বিসারের বিশাল অন্তপুর ছিল, পাটলিপুত্রের পরমভট্টারকের অন্তঃপুরের মত। পুরুষপুরে দেবপুত্র শাহীর অন্তঃপুরের মত। কিন্তু কালের নির্মম করাঘাতে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এইখানে রাজা বিম্বিসারকে তাঁর সুযোগ্য পুত্র অজাতশত্রু কারাগারে নিক্ষেপ করে

তিল তিল করে মেরেছে। কেন জানো? রাজ্যের জন্য, নিজের ভোগের জন্য, পরলোক, পরজন্মের ধ্যানধারণা ছিল না পুত্র অজাতশত্রুর।

—ধনী এবং প্রভুদের কাছে পরলোকবাদ, পরজন্মবাদ প্রভৃতি হাতীর দাঁতের মত। দেখানোর জন্য এবং খাওয়ার জন্যে আলাদা। বৌদ্ধেরাও পুনর্জন্মবাদ মানে, কিন্তু আমার মতে পুনর্জন্মবাদ এবং বহুজনহিতায় এক সঙ্গে চলে না।

—তাহলে বৎস পরলোকবাদে তোমার বিশ্বাস নেই?

—আমার পরলোকবাদের সংজ্ঞা আলাদা।

—কি রকম? আচার্য হাসলেন এবং প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন।

—পুত্র পিতার পরলোক। পুত্রই পিতার পুনর্জন্ম। পিতা মৃত্যুর পুর্বে নিজের শরীরের একটা অংশ মাতার দেহরক্তে সঞ্চারিত করেন, মাতা তাকে নিজের রক্ত দিয়ে পুষ্ট করেন গর্ভে ধারণ করে। সেই ভ্রুণ শিশুরূপে ভূমিষ্ঠ হয় আগামী লোক এবং বংশধর রূপে। একেই আমি পরলোক বলে মনে করি।

—তোমার বিচার খুব সুন্দর জয়! আমি আমার লেখা "অভিধর্মকোষে" ব্রাহ্মণদের আত্মবাদ (আত্মা এক নিত্য সনাতন বস্তু) এর খণ্ডন করে লিখেছি যে আত্মার নিত্য স্থিতির বাসনা এবং মৃত্যুকে ভয় করাকে তুচ্ছ স্বার্থান্ধতা এবং কাপুরুষতা বলে। যে মানুষ এই তুচ্ছ লালসা ও কাপুরুষতার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছে তার মুক্তির কোন রাস্তাই নেই, তার নির্বাণ প্রাপ্তি অসম্ভব।

—আপনি ঠিক বলেছেন আচার্য। আমিও পরলোকবাদ এবং পরজন্মবাদকে তুচ্ছ স্বার্থান্ধতা এবং কাপুরুষতা বলে মনে করি। আমি সর্বকালের জন্য মরব না, মৃত্যুর পরেও আবার জন্মাব এই সান্ত্বনা একটা মারাত্মক কল্পনা। এই অন্ধ বিশ্বাসের ফলে মানুষের হাত পা যদি বাঁধা না থাকত তাহলে নয়শত নিরানব্বুই জন মানুষ নিজেদের মুখের গ্রাস একটি মানুষের সামনে এগিয়ে দিয়ে নিজেরা না খেয়ে মরত না। তাহলে অর্ধাহারী উপবাসী, বিবস্ত্র জনসাধারণের মেহনতে,

তাদের রক্তের বদলে, তাদের অস্থি-মজ্জার উপর ধনীর প্রাসাদ গড়ে উঠত না।

—সাধু, বৎস সাধু। আমি বুদ্ধ দর্শনকে পুষ্ট করবার জন্য আমার লিখিত পুস্তকে অনেক কিছুই লিখেছি, কিন্তু পরলোকবাদ এবং নির্বাণবাদের বিষয়ে যা লিখেছি, সে সকল যুক্তিগুলি আমার নিজের কাছেই যেন দুর্বল মনে হয়। তথাগত নিজেই যখন কোন নিত্য-সনাতন আত্মাকে মানেন না, তখন নির্বাণকে কেন মানতে হবে। হাঁ, যদি দীপ নির্বাণের মত জীবন-এর নির্বাণ অর্থে শুধু নিভে যাওয়া হয়, তাহলে নির্বাণ এবং তার পরের জন্য আমাদের কোন চিন্তা করবার প্রয়োজন ছিল না। চিন্তা যদি করতেই হয়, তাহলে নির্বাণের পূর্বে সনাতন জীবনের জন্য, পার্থিব দেহ-মনের জন্য চিন্তা করা উচিত।

—ঠিক, এই শরীরের মধ্যেই পুনর্জন্ম রয়েছে, একথা আমি মানি। যেমন আমার শৈশবকালে এই দেহ-মন যা ছিল, এখন সে অবস্থায় নেই। তার পরিবর্তন হয়েছে। শৈশবের মৃত্যু হয়েছে। তারুণ্যের জন্ম হয়েছে। মানুষ প্রতি মুহূর্তে মরছে, আবার জন্মগ্রহণ করছে। পৃথিবীর অন্যান্য সকল জিনিসের মত যে সকল উপাদান দিয়ে মনুষ্যদেহ গঠিত হয় সেগুলিও প্রবাহ। যেগুলি ক্ষণে ক্ষণে মরে এবং নতুন করে জন্মায়। এই মুহূর্তে এই জীবিত দেহ-মনই ইহলোক, আর ঠিক পরের মুহূর্তে এবং তারও পরের মুহূর্তকেই পরলোক বলা যায়। এ ছাড়া আর একটা পরলোকবাদ বলা যায় তাকে যার প্রবাহ অনন্তকাল ধরে চলতে থাকে। সে হল সন্তান। বংশ-পরম্পরা।

—আমি স্বীকার করছি জয়, তোমার এই পরলোকবাদ শ্রমণ, ব্রাহ্মণদের পরলোকবাদের চেয়ে অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। আমি তাই ভাবছি জয়, এই পৃথিবীতে মানুষ যখন প্রথম এই সকল ভূমি আবাদ করেছিল এবং প্রথম সমাজ ব্যবস্থা প্রণয়ণ করেছিল, তারা যদি তোমার পরলোকবাদের কথা জানতে বা বুঝতে পারতো তাহলে আজকের পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াতো।

—আশাতীত সুন্দর সমাজ ব্যবস্থা হত ভন্তে। রাজগৃহের তৎকালীন কোটিপতি শ্রেষ্ঠীদের সন্তানদের আজ আমরা জানতে পারতাম না। অজাতশত্রু নিজের পিতার খেয়াল করেনি, নিজের মাতুলকুলের খেয়াল করেনি। সর্বতোভাবে সে শুধু নিজের খেয়াল নিয়ে মেতেছিল সারাজীবন, তাই আজ তাকিয়ে দেখুন তার সন্তানগণ আজ কালের আবর্তনে নয়শত নিরানব্বুই জনের মধ্যে মিশে গেছে। অতএব যতক্ষণ এই নয়শত নিরানব্বুই আর এক জনের ভেদভাব দূর না হয় ততক্ষণ এ পৃথিবীর, এ সমাজের কোন মঙ্গল হওয়া অসম্ভব।

এখন আমার বয়স বিশ বৎসর। শিক্ষার একটা ধাপ শেষ করেছি সবে। আচার্য বসুবন্ধু আমাদের শিক্ষার ভার যদি না গ্রহণ করতেন তাহলে এতদিন তিনি পাটলিপুত্রে থাকতেন না। শুধু মাত্র অজ্জুকার অনুরোধে তিনি গান্ধার যাত্রা স্থগিত রেখে আমাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মত গুরু পেয়ে আমি ধন্য হয়েছি। যদিও আমি তাঁর এক শতাংশ জ্ঞান আয়ত্ব করতে সমর্থ হইনি, তবুও তিনি নিজমুখে স্বীকার করেছেন যে, বৎস! তুমিই আমার যোগ্যতম এবং শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

আমিও চাইছিলাম যে জীবনের বিশটা বৎসর যে রাজকীয় পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছি, এখন তা থেকে বিস্তৃত কর্মক্ষেত্রে, বিশাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বেরিয়ে পড়তে হবে। আচার্য বসুবন্ধু বলতেন, একমাত্র সিংহলেই তথাগতের বিশুদ্ধ উপদেশাবলী ছড়িয়ে আছে। পরমভট্টারকের স্বীকৃতি নিয়েই বোধগয়ায় সেখানকার রাজা কিছুদিন আগে একটা বিহার তৈরী করেছিলেন। আমি বার বার সেখানকার ভিক্ষুদের সঙ্গে দেখা করেছি, আলাপ করেছি। তাঁরা পুরনো ভাষায় লেখা কিছু সূত্র আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটুকুতে আমার তৃপ্তি হল না। অতএব আমি ঠিক করলাম সিংহল গিয়ে বুদ্ধ-দর্শন সম্বন্ধে কিছু জ্ঞানার্জন করে আসব।

এখন প্রশ্ন হল সিংহল যাওয়া যাবে কি উপায়ে। দশ বিশ হাজার দীনারের জন্য আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে না। কিন্তু শুধুমাত্র অর্থের জোরে বিদেশ যাত্রা করবার পক্ষপাতী আমি নই। অজ্জুকা পরমভট্টারকের তরফ থেকে বিশেষ দূত সঙ্গে দিয়ে আমাকে পাঠাতে পারেন, কিন্তু রাজ পরিচয় সম্বল করে বিদেশ যাত্রা পছন্দ করি না। আমি বিদ্যালাভ করেছি কিন্তু বয়সে নবীন। তবুও আমি স্বচ্ছন্দ বিহারী যাত্রী হয়ে যাওয়াটাকেই বেশী পছন্দ করি, তবে ভিক্ষাজীবি হয়ে নয়। রোজগারের পন্থা বেছে নিয়েছি মূর্তিকলা আর ধীরে ধীরে দক্ষতা এসেছে আমার কাজে। কণ্ঠসঙ্গীত, বীণাবাদনেও আমার পারদর্শিতা আছে। শুধু এই দুটি বিদ্যার সহায়তায় আমি স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করতে সক্ষম। অতএব শেষ বৎসর এই বিদ্যাগুলিকে কিছুটা অভ্যাসের শান দিয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। এখন সবচেয়ে চিন্তার বিষয় হল, অজ্জুকার কাছ থেকে বিদায় নেওয়া। গত বৎসর পিতা দেহত্যাগ করেছেন। তখন থেকে অজ্জুকা আমার প্রতি অত্যধিক মনোযোগী হয়ে উঠেছেন। আমার ভালোমন্দের চিন্তা তাঁকে পেয়ে বসেছে। একদিন যদি আমি আমার মহল থেকে তাঁর কাছে না এসেছি, পরদিন তিনি আমার কাছে স্বয়ং এসে উপস্থিত হতেন। চন্দ্র ইতিমধ্যে অনেকখানি স্বাধীনতা লাভ করেছে। সে তার নিজের পছন্দমত একটা পৃথিবী তৈরী করে সেই পৃথিবীতে বিচরণ করছে। অজ্জুকা মাঝে মাঝে আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতেন। আমি বলতাম—উপস্থিত আমি বিদ্যার্থী হয়েই থাকতে চাই, অন্য কথা পরে চিন্তা করবো।

—আচার্য তোমার বিদ্যার খুব প্রশংসা করছিলেন।

—আমার উপর তাঁর অপার করুণা। তাঁর কাছে যে বিশাল বিদ্যার ভাণ্ডার রয়েছে, আমার সারাজীবনেও তা শেষ করতে পারব না। কিন্তু তিনি আর এখানে থাকতে চাইছেন না।

পাটলিপুত্রের অন্যান্য মনীষীদের সাহচর্যে কাল কাটাতে লাগলাম। অজ্জুকার মনে একটা অহেতুক আশঙ্কা জন্মেছিল যে আমি তরুণীদের

সঙ্গে মেলা-মেশা পছন্দ করি না। আমি তো তরুণীদের ঘৃণা করতাম না। তাদের সৌন্দর্যের স্বীকৃতি দিতাম। তাদের নাচ-গানের আনন্দ উপভোগ করতাম, শুধু চন্দ্রের মত লালসাকে প্রণয়ের মুখোস পরাতে পারতাম না।

তাই বলে আমার জীবন নীরস ছিল না বা আমি জীবন বৈরাগী ছিলাম না। তবে আমার ভোগের একটা গণ্ডী ছিল যার সীমা লঙ্ঘন করতে পারতাম না।

দক্ষিণাপথের অনেক রাজকুমার পাটলিপুত্রে থাকত, আমি তাদের কাছে গিয়ে আলাপ আলোচনা করে সিংহল যাত্রার সুগম পথের সন্ধান জানতাম। তাদের দেশের নানা সংবাদ সংগ্রহ করতাম।

॥ নয় ॥

ভগ্নপোত

সেদিন আচার্য স্রুঘ্ন যাবার উদ্দেশ্যে নৌকায় চাপলেন। তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানাতে বহু লোক নদীতীরে সমবেত হয়েছেন। আমি তাঁর সঙ্গে সরযূ ও গঙ্গার সঙ্গম পর্যন্ত গেলাম। সেখান থেকে ফিরে আসবার সময় শেষবার তাঁকে যখন প্রণাম করলাম তখন আমার চোখের জল আর বাধা মানল না। আচার্য বললেন,

—বৎস জয়! স্নেহ অপরিহার্য। স্নেহের মাধ্যমে মানুষ আপনাকে উৎসর্গ করতে শেখে। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে, আমরা চলমান সংসারের চলমান পথিক। এই পথে পথ চলতে সংযোগ-বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী। আমি পাকা ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোন মুহূর্তে বৃন্তচ্যুত হয়ে যেতে পারি, এবং তাই স্বাভাবিক। যা অবশ্যম্ভাবী তার জন্য চিন্তা করতে নেই, বিচলিত হতে নেই। আমি আমরণ তোমার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকব জেনো। মৃত্যুর পর পর্যন্ত। যেমন করে দীপ থেকেই দীপ জ্বালানো হয়, তেমনি তোমার শিক্ষা, তোমার কর্মের মাঝেই আমি বেঁচে থাকবো।

আমি নতমস্তকে আমার ছোট নৌকায় এসে উঠলাম। আচার্যের নৌকা ক্রমশ দূর হতে দূরে চলে যেতে যেতে এক সময় দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি মনের অবসাদ দূর করবার জন্য আমার নৌকার নাবিকদের সঙ্গে অন্য আলোচনা শুরু করলাম।

অজ্জুকার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাটলিপুত্রের বাইরে যাওয়া খুবই কঠিন হয়ে পড়ল। সর্বদাই তিনি আমার ভবিষ্যত সম্বন্ধে চিন্তা করতেন। যদিও তিনি অসাধারণ নারী ছিলেন না, তবুও তাঁর

অসীম ধৈর্য ছিল, দূরদর্শিতা এবং উদারতা ছিল। প্রথম যখন আমি বিদেশ যাত্রার প্রস্তাব করি, তখন তিনি নিজেকে সংযত রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর শুভ্র গণ্ড বেয়ে শীর্ণ দুটি অশ্রুর ধারা নামল। তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। কোন কথা বলতে পারলেন না। আমি তাঁর অবস্থা দেখে বিচলিত হয়ে বললাম,

—অজ্জুকা, আমি শুধু শিক্ষার জন্যই বিদেশ যেতে চাইছি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি অজ্জুকা, যতক্ষণ তোমার সানন্দানুমতি না পাচ্ছি ততক্ষণ আমি আর কোথাও যাওয়ার নামটিও উচ্চারণ করব না।

কিছুদিন যাবত প্রতিদিন তিনি একবেলা আমাকে নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। রোজ রোজ কষ্ট করে আমার মহলে আসতে দেখে কয়েকদিন পর আমি নিজেই তাঁর কাছে যাওয়া শুরু করলাম। রোজই আমাদের দেখা হতো, তবুও আমি সাহস করে বাইরে যাওয়ার কথা বলতে পারিনি। একদিন কথাচ্ছলে তিনি বললেন,

—জয়, আমার উপর তোমার অগাধ স্নেহ।

—তার কারণ তুমি একদিকে আমার মা, আর একদিকে আমার সহোদরা দিদি।

—কিন্তু ভাই, আমি এতদিন ভুলে গিয়েছিলাম যে আমি যৌধেয় কন্যা। যৌধেয় রমণী স্বামীর হাতে খড়গ তুলে দিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে দেবার সময়ও চোখের জল ফেলে না। তোমাকে আটকে রেখে আমি যে ভুল করেছি, তার জন্য আমি অনুতপ্ত। তোমার উপর কঠিন উত্তর দায়িত্ব রয়েছে। যৌধেয় জাতির ভবিষ্যৎ তুমি। তোমার মত ভাই পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি।

আর আমার কোন চিন্তা রইল না। আনন্দে মন ভরে গেল। তার কয়েকদিন পরেই অজ্জুকা নিজেই আমার যাত্রার সব আয়োজন করে আমায় বিদায় দিলেন। আমি সিংহল যাত্রার উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্র ত্যাগ করলাম। দীর্ঘ বিশ বৎসরের স্মৃতি পড়ে রইল পিছনে, মনটা প্রথমে একটু চঞ্চল হয়েছিল, কিন্তু আমাকে যেতেই

হবে, আমি সংসারের চলমান পথিক, পথেই আমার জীবন সাধনা।

প্রথম থেকেই আমার বাসনা, সিংহল যাওয়ার পথে দক্ষিণাপথ হয়ে যাব। পাটলিপুত্র ত্যাগ করবার আগেই আমার জানা ছিল যে সূহ্মসীমা পার হবার পরেই আমাকে এমন সব ভাষার সংস্পর্শে আসতে হবে যা আমার পক্ষে বোধগম্য নয়। তবে এ কথাও জানতাম যে তখনকার রাজকুল এবং ব্রাহ্মণকুলে যে ভাষা প্রচলিত তা ঠিক মাগধী ভাষার মত।

আমার সামনে দুটি মাত্র রাস্তা। এক হল এখান থেকে নৌকায় গঙ্গা নদী বরাবর গিয়ে সমুদ্রে পৌঁছবার খানিকটা আগে নেমে কিছুদূর পায়ে হেঁটে এবং তারপর আবার নৌকায় তাম্রলিপ্ত পৌঁছানো। সেখান থেকে কোন সামুদ্রিক পোত ধরে সিংহল যাত্রা করা। আর একটি পথ হল অটবীর রাস্তা। কিন্তু এ পথ দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল। সৌভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে সিংহবর্মার মত বন্ধু পেলাম। সিংহবর্মাও আমার এই দুর্গম যাত্রার সাথি হতে প্রস্তুত। সে শুধু চিত্রকার নয়, দুঃসাহসী যোদ্ধা। আমরা অটবীর পথে যাওয়াই ঠিক করলাম। গয়া হয়ে আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল। পথিমধ্যে কোথাও কোন পান্থশালায় কখনও বা কোন গ্রামবাসীর গৃহে আশ্রয় নিতাম। সঙ্গে পরমভট্টারকের পরিচয়পত্র ছিল, কিন্তু নিতান্ত সাধারণ পরিস্থিতিতে তা ব্যবহার করা উচিত মনে হল না। রাস্তায় আমাদের সঙ্গে কয়েকদল সার্থবাহর সাক্ষাৎ হয়েছে বটে, কিন্তু আমরা তাদের সঙ্গে যাওয়া পছন্দ করলাম না। অটবীর প্রান্তদেশ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে কয়েকজন ভারবাহী ছিল। এবার তাদের বিদায় দিলাম। তার জন্য অনেক কিছু জিনিসপত্র ছেড়ে যেতে হল। শুধুমাত্র নিজেদের অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্রগুলি তুলে নিলাম। সিংহবর্মা রাস্তার খবরাখবর অনেক কিছুই রাখতো। সে বললো—সূহ্ম পর্যন্ত গরম পোষাকের দরকার হবে, তারপর সাধারণ পোষাকেই চলবে। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে আমরা একটা করে মোটা এবং শক্ত পশমের কম্বল

নিয়েছিলাম আর সব সুতীর বস্ত্রাদি ছিল। সাধারণ যাত্রীর বেশেই আমরা পথ চলছি। খড়গ আমাদের অভিন্ন অঙ্গ ছিল এবং জঙ্গলে চলবার জন্য এবং মাঝে মাঝে মৃগয়া করবার জন্য ধনুর্বাণও ছিল। তাছাড়াও আমার কাছে কিছু দীনার ছিল।

অটবীর সীমা বরাবর কয়েকদিন হল চলেছি। কুড়িজন লোকের একটা ছোট সার্থবাহ দল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সেদিন দুপুর বেলা গাছের ছায়ায় বসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময়ে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের কাছে ছুটে এল। সকলের বিস্রস্ত বেশ, হাতে খড়গ, প্রায় সকলেরই কাপড়-চোপড় রক্তে ভেজা। তাদের একজন আমাদের কাছে এসে বললো,

—মহাশয়, আমাদের সত্তর জন লোকের সার্থবাহ দল ছিল, সঙ্গে কুড়িখানা গাড়ি-ভর্তি দক্ষিণাপথের বহু মূল্যবান পণ্যদ্রব্য ছিল। এখান থেকে এক যোজন দূরে আমরা কাল রাত্রে বিশ্রাম করছিলাম। সকলে যখন আমরা যাত্রার জন্য রওয়ানা হব এমন সময় প্রায় একশো জন সশস্ত্র শবর জাতি আমাদের আক্রমণ করল। আমরা বাধা দিয়েছিলাম এবং আমাদের কুড়ি-পঁচিশজন লোক হতাহত হয়ে পড়ে যেতে আমরা দেখলাম শবরদের শক্তির সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না, তখন প্রাণের ভয়ে আমরা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে আসি। তারা আমাদের সকল পণ্যদ্রব্যাদি, গাড়ি, ঘোড়া এবং বহু লোককে ধরে নিয়ে গেছে। এখনও আমাদের অনেক লোক জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। জানি না এতক্ষণ আমাদের মুখ্য সার্থবাহ বিষ্ণুদাসের কি অবস্থা হয়েছে।

তাদের কথা মন দিয়ে শুনলাম। আমাদেরও ঐ রাস্তায় যেতে হবে। সেখানে শবর ডাকাতদল ওৎ পেতে বসে আছে। এখন প্রশ্ন হল আমরা বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য আগের দিকে এগিয়ে যাব, না বিপদ এড়াবার ভয়ে পিছনে ফিরে যাব। সবাইকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আমি এবং সিংহবর্মা দৃঢ়স্বরে বল্লাম,

—ভাইসব, এখন আমাদের পিছনে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। শবর জাতি শিকারের গন্ধ পেলে মুহূর্তে নিজেদের সকলের মধ্যে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়। অতএব আগে ও পিছনে দুদিকেই এখন সমান বিপদ। সামনের ডাকাতরা একবার লুঠ করে দ্বিতীয়বার আক্রমণের ইচ্ছা হয়ত ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পিছনের লোকেরা তা করবে না। বর্তমানে আমরা পঁয়ত্রিশ জন রয়েছি এবং প্রয়োজন হলে জঙ্গলের গভীরে লুকোতে পারব। অতএব আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর সকলে আমাদের সঙ্গে একমত হল এবং আমরা সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। মোট সত্তরজন হলাম আমরা। সকলের হাতে খড়গ আছে এবং প্রায় অর্ধেক লোকের হাতে ধনুর্বাণ আছে। এক যাম দিন থাকতে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলাম, যেখানে আজ সকালে শবর দস্যুদল আক্রমণ করেছিল। আটাশজন মৃত এবং দুইজন অর্ধমৃত মানুষ সেখানে পড়েছিল তখনও। মৃতদেহ সংকার করা সম্ভব নয়, তাহলে আগুনের ধোঁয়া দেখে শবররা সতর্ক হয়ে যাবে। তখন একখানা গাড়ী পড়েছিল, তার মধ্যে কিছু খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্রাদি ছিল। আহত লোক দুটি পিপাসায় জলের জন্যে কাতরাচ্ছে। আমরা পাশের নালা থেকে জল নিয়ে এসে ওদের দিয়ে শুশ্রূষা করলাম। তাদের কাছে শুনলাম যে বিষ্ণুদাসও আহত হয়েছে। লড়াই করবার সময় খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে বিষ্ণুদাস। পরে শবররা তার পায়ে বর্শা মেরে আহত করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

তাদের কাছে আরও শুনলাম, শবররা সংখ্যায় পঞ্চাশজনের বেশী নয়। অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল বলে তারা পরাজিত হয়েছে। আমরা আহতদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। আমি সিংহবর্মাকে বললাম,

—বন্ধু, বিষ্ণুদাস খুব বাহাদুরী দেখিয়েছে বলে শবররা তাকে খুব মারধোর করবে নিশ্চয়। তারা গাড়ীগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াতে

নিয়েছিলাম আর সব সুতীর বস্ত্রাদি ছিল। সাধারণ যাত্রীর বেশেই আমরা পথ চলছি। খড়গ আমাদের অভিন্ন অঙ্গ ছিল এবং জঙ্গলে চলবার জন্য এবং মাঝে মাঝে মৃগয়া করবার জন্য ধনুর্বাণও ছিল। তাছাড়াও আমার কাছে কিছু দীনার ছিল।

অটবীর সীমা বরাবর কয়েকদিন হল চলেছি। কুড়িজন লোকের একটা ছোট সার্থবাহ দল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। সেদিন দুপুর বেলা গাছের ছায়ায় বসে আমরা বিশ্রাম করছিলাম। এমন সময়ে কুড়ি-পঁচিশ জন লোক হাঁফাতে হাঁফাতে আমাদের কাছে ছুটে এল। সকলের বিস্রস্ত বেশ, হাতে খড়গ, প্রায় সকলেরই কাপড়-চোপড় রক্তে ভেজা। তাদের একজন আমাদের কাছে এসে বললো,

—মহাশয়, আমাদের সত্তর জন লোকের সার্থবাহ দল ছিল, সঙ্গে কুড়িখানা গাড়ি-ভর্তি দক্ষিণাপথের বহু মূল্যবান পণ্যদ্রব্য ছিল। এখান থেকে এক যোজন দূরে আমরা কাল রাত্রে বিশ্রাম করছিলাম। সকলে যখন আমরা যাত্রার জন্য রওয়ানা হব এমন সময় প্রায় একশো জন সশস্ত্র শবর জাতি আমাদের আক্রমণ করল। আমরা বাধা দিয়েছিলাম এবং আমাদের কুড়ি-পঁচিশজন লোক হতাহত হয়ে পড়ে যেতে আমরা দেখলাম শবরদের শক্তির সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না, তখন প্রাণের ভয়ে আমরা জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে আসি। তারা আমাদের সকল পণ্যদ্রব্যাদি, গাড়ি, ঘোড়া এবং বহু লোককে ধরে নিয়ে গেছে। এখনও আমাদের অনেক লোক জঙ্গলের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। জানি না এতক্ষণ আমাদের মুখ্য সার্থবাহ বিষ্ণুদাসের কি অবস্থা হয়েছে।

তাদের কথা মন দিয়ে শুনলাম। আমাদেরও ঐ রাস্তায় যেতে হবে। সেখানে শবর ডাকাতদল ওৎ পেতে বসে আছে। এখন প্রশ্ন হল আমরা বিপদের সম্মুখীন হবার জন্য আগের দিকে এগিয়ে যাব, না বিপদ এড়াবার ভয়ে পিছনে ফিরে যাব। সবাইকে ইতস্ততঃ করতে দেখে আমি এবং সিংহবর্মা দৃঢ়স্বরে বল্লাম,

—ভাইসব, এখন আমাদের পিছনে ফিরে যাওয়া নিরাপদ নয়। শবর জাতি শিকারের গন্ধ পেলে মুহূর্তে নিজেদের সকলের মধ্যে সংবাদ পাঠিয়ে দেয়। অতএব আগে ও পিছনে দুদিকেই এখন সমান বিপদ। সামনের ডাকাতরা একবার লুঠ করে দ্বিতীয়বার আক্রমণের ইচ্ছা হয়ত ত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পিছনের লোকেরা তা করবে না। বর্তমানে আমরা পঁয়ত্রিশ জন রয়েছি এবং প্রয়োজন হলে জঙ্গলের গভীরে লুকোতে পারব। অতএব আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই মঙ্গল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর সকলে আমাদের সঙ্গে একমত হল এবং আমরা সামনের দিকে রওয়ানা হলাম। মোট সত্তরজন হলাম আমরা। সকলের হাতে খড়গ আছে এবং প্রায় অর্ধেক লোকের হাতে ধনুর্বাণ আছে। এক যাম দিন থাকতে আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলাম, যেখানে আজ সকালে শবর দস্যুদল আক্রমণ করেছিল। আটাশজন মৃত এবং দুইজন অর্ধমৃত মানুষ সেখানে পড়েছিল তখনও। মৃতদেহ সংকার করা সম্ভব নয়, তাহলে আগুনের ধোঁয়া দেখে শবররা সতর্ক হয়ে যাবে। তখন একখানা গাড়ী পড়েছিল, তার মধ্যে কিছু খাওয়া-দাওয়ার জিনিসপত্রাদি ছিল। আহত লোক দুটি পিপাসায় জলের জন্যে কাতরাচ্ছে। আমরা পাশের নালা থেকে জল নিয়ে এসে ওদের দিয়ে শুশ্রূষা করলাম। তাদের কাছে শুনলাম যে বিষ্ণুদাসও আহত হয়েছে। লড়াই করবার সময় খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে বিষ্ণুদাস। পরে শবররা তার পায়ে বর্শা মেরে আহত করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে।

তাদের কাছে আরও শুনলাম, শবররা সংখ্যায় পঞ্চাশজনের বেশী নয়। অতর্কিতে আক্রমণ করেছিল বলে তারা পরাজিত হয়েছে। আমরা আহতদের গাড়ীতে তুলে নিয়ে আবার এগিয়ে চললাম। আমি সিংহবর্মাকে বললাম,

—বন্ধু, বিষ্ণুদাস খুব বাহাদুরী দেখিয়েছে বলে শবররা তাকে খুব মারধোর করবে নিশ্চয়। তারা গাড়ীগুলি সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়াতে

তাদের গন্তব্যস্থল আমরা অনায়াসে জানতে পারব। অতএব পাঁচ-ছয়জন লোককে এই গাড়ীর সঙ্গে ছেড়ে চল তাড়াতাড়ি আমরা তাদের অনুসরণ করি।

সিংহবর্মা আমার মতে সর্বদাই রাজী। কয়েকজন লোক অবশ্য প্রথমে রাজী হয়নি, আমরা সেই কয়জনকে গাড়ীর সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে শবরদের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হলাম। সূর্যাস্তের আগেই আমরা এমন একজায়গায় এলাম, যেখান থেকে গাড়ীর চাকার দাগ বড় রাস্তা ছেড়ে ছোট রাস্তায় বেঁকে গেছে। আমরা বড় রাস্তার পাশে একটা গাছে লাল কাপড় বেঁধে রেখে সরু রাস্তা ধরলাম। কিছুদূর যাবার পর দূর থেকে আগুন দেখতে পেলাম এবং আরও খানিকটা গিয়ে মানুষের কণ্ঠ-শব্দ পেলাম। আমি অন্যান্য সকলকে সেখানে অপেক্ষা করতে বলে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গেলাম। অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে নিজেকে বাঁচিয়ে আগুনের কাছে পৌঁছলাম। সেখান থেকে শবরদের সব কিছুই দেখা যায়। একদিকে গাড়ীগুলি পরপর দাঁড় করিয়ে রেখেছে ওরা। বলদগুলি গাড়ীর সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আর একদিকে বিশাল আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। সেখানে এক জায়গায় প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন শবর উপস্থিত। সন্ধ্যার অন্ধকার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, আর একটু পরে শবরদের কালো শরীর অন্ধকারের সঙ্গে মিশে যাবে। একমাত্র পাতলা একটা লেঙ্গুটি ছাড়া আর কিছু নেই তাদের শরীরে। মাথার মধ্যে নানাপ্রকার পালক গোঁজা রয়েছে। লম্বায় আমাদের চেয়ে বেঁটে হলেও তাদের শরীরের গঠন দেখে আমার হিংসা হচ্ছিল। ক্ষীণ কটি, বিশাল চওড়া ছাতি, মাংসল কাঁধ এবং পেশীবহুল বাহু দেখেই তাদের শক্তিমত্তার পরিচয় পেলাম। বিষ্ণুদাসের জন্য চারিদিকে দৃষ্টি ঘোরাতে ঘোরাতে একটা গাড়ির সঙ্গে কয়েকজন লোককে বাঁধা দেখলাম। যদিও আমি বিষ্ণুদাসকে কখনও দেখিনি, তবুও আন্দাজ করে নিলাম, বিষ্ণুদাসকে নিশ্চয় ঐখানে কোন গাড়ীর সাথে বেঁধে রাখা হয়েছে। সব দেখে নিয়ে ধীরে ধীরে আবার আমি ফিরে এলাম এবং দলের সকলকে

সব বল্লাম। অতঃপর ত্রিশজন লোককে নিয়ে সিংহবর্মা বাঁদিকের জঙ্গলে ঢুকল, আমি বাকী কজনকে নিয়ে ডানদিকের পথে এগিয়ে চল্লাম। স্থির হল, ইশারা করে একসঙ্গে দুদিক থেকে আক্রমণ করব আমরা।

আক্রমণের সঙ্কেত বুঝিয়ে দিয়েছি সকলকে। এতক্ষণে অন্ধকার ছেয়ে গেছে। আমরা এক একজন করে গাছের আড়াল দিয়ে গাড়ীর কাছে পৌঁছলাম। এতক্ষণ আমাদের অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। এইবার সঙ্কেত করে আমরা এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম শবরদের উপর। ওরাও একেবারে নিরস্ত্র ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিল আমাদের, কিন্তু একই সঙ্গে অতর্কিতে দুদিক থেকে আক্রমণের ফলে তীর ব্যবহার করবার সুযোগ পেল না ওরা খড়গ এবং বর্শাযুদ্ধে আমরা শবরদের চেয়ে বহুগুণে দক্ষ। দুই দলের মধ্যে বাঁচা মরার লড়াই। খপ খপ খড়্গের শব্দ, মাঝে মাঝে কাতর ধ্বনি। আমাদের পিছন থেকে বর্শা চালানো হচ্ছিল শবরদের উপর তার পিছন থেকে তীর। কিছুক্ষণের মধ্যে শবররা প্রায় অর্ধেক আহত হয়ে পড়ল। আর কিছু জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল। আমরা একটা গাড়ীর সঙ্গে বাঁধা অর্ধমৃত বিষ্ণুদাসকে পেলাম। যন্ত্রণায় কাতর তৃষ্ণার্ত বিষ্ণুদাসকে সিংহবর্মা জল এনে দিল। পরে বিষ্ণুদাসের কাছে শুনলাম, কিছু সংখ্যক শবর মূল্যবান জিনিষপত্রাদি নিয়ে নিজ গ্রামের দিকে রওয়ানা হয়েছে অনেকক্ষণ। অতএব আমাদের এই মুহূর্তে এখান থেকে চলে যেতে হবে। বলা যায় না ওরা যে কোনও সময় আরও লোকজন নিয়ে আবার আক্রমণ করতে পারে। তখুনি সেখান থেকে আমরা রওয়ানা হলাম এবং বড় রাস্তায় এসে পৌঁছলাম। সেখানে আমাদের আর একখানি গাড়ী ও কয়েকজন লোক অপেক্ষা করছিল। বিষ্ণুদাস সেখান থেকে নিজ দেশের উদ্দেশে ফিরে চলল। কারণ তার বহুমূল্য পণ্যাদি সবই লুঠ হয়ে গেছে, যা আছে তা নিয়ে মগধ পর্যন্ত গিয়ে কোন লাভ নেই। তাছাড়া তার সার্থের সবচেয়ে বড় বড় যোদ্ধারা যুদ্ধে মারা গেছে, অতএব ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।

অটবীর রাস্তায় শুধু শবরদের ভয়ই নেই, যে কোনও সময় হাতীর দল বা বাঘে আক্রমণ করতে পারে। বিশেষ করে রাত্রে পথ চলা সবচেয়ে বেশী বিপদজনক। তবুও আমরা রওয়ানা হলাম সেই রাত্রেই। কারণ শবর দল মার খেয়ে চুপ করে বসে থাকবার জাত নয়। সমস্ত রাত্রি আমরা রুদ্ধশ্বাসে চললাম সেই বিপদ সঙ্কুল পথে।

সকালে আমরা এক জলাশয়ের কাছে এসে পৌঁছুলাম। সেখানে কিছুদূরে একটি ছোট্ট চালাঘর দেখতে পেয়ে এগিয়ে গেলাম। লোকেরা এটিকে চণ্ডিকার স্থান বলে। মন্দিরের বদলে ঐ পর্ণকুটীর ছাড়া আর কিছুই নেই। বিগ্রহের বদলে একটি সিঁদূর মাখানো পাথর দেখলাম শুধু। পূজারী নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিল। কিন্তু তার কয়লার মত কৃষ্ণকায় ও বড় বড় রক্ত চক্ষু প্রমাণ করিয়ে দেয় যে সে ব্রাহ্মণ নয়। আর একজন আধা বয়সী পরিব্রাজিকাকে দেখলাম সেখানকার বাসিন্দা। পরিব্রাজিকার গায়ের রং গৌরবর্ণ, যৌবনে সুন্দরী বলা যেত কিন্তু এখন বসন্ত শেষের ঝরাপাতার রিক্ততার ছাপ সর্বাঙ্গে, পরিব্রাজিকার পরণে কষায়বস্ত্র, গলায় অক্ষের মালা এবং মাথায় জটা কুণ্ডলিত। কথাবার্তায় বেশ চতুরতার আভাষ। স্মিতবদনে আমাদের স্বাগত জানাল। বিষ্ণুদাস দুদিন আগে যাওয়ার সময় এখানে বিশ্রাম নিয়েছিল এবং পরিব্রাজিকা রাস্তার বিপদের কথা বলে সাবধান করেছিল। তাই এখন বিষ্ণুদাস দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললো—আর্যা! আপনি সেদিন রাস্তার বিপদের কথা ঠিকই বলেছিলেন। আমরা ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়েছিলাম, কিন্তু কোনও প্রকারে আপনার কৃপায় প্রাণে বেঁচে গেছি।

পরিব্রাজিকা বিষ্ণুদাসের ক্ষতস্থান দেখে সমবেদনা জানালো এবং কয়লা প্রভৃতি কি সব জিনিষ দিয়ে ক্ষতস্থানে পট্টি বেঁধে দিল। এদিকে খিদেয় পেট জ্বলছে আমাদের, কিছুলোক খাবার ব্যবস্থা করতে লেগে গেল দেখে আমরা পরিব্রাজিকার কাছে বসে আলাপ করতে লাগলাম। পূজারীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এখানেও

শবরদের ভয় আছে। কিন্তু আমার মন বলছে যেন ও নিজেও শবর দলের চর। পূজারীর ছদ্মবেশে এখান থেকে পথযাত্রীর সংবাদ আদান প্রদান করে। নইলে এই জঙ্গলে এমন কি তপস্যা করছে এরা। সিংহবর্মা বললো—তপস্যা না ছাই। ঐ বিগত যৌবনার একজন পুরুষের দরকার ছিল শেষ সাথী হিসেবে, আর ঐ কাকভট্টের পক্ষে ওর চেয়ে সুন্দরী স্ত্রী পাওয়া সম্ভব নয়, তাই ওরা দেবা দেবী জঙ্গলে এসেই নিজেদের ঘর বেঁধেছে।

ওদের দুজনের উপর আমাদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল, যতক্ষণ আমরা ছিলাম। একটু এদিক ওদিক গেলেই আমরা সচকিত হয়ে উঠতাম। কি জানি হয়ত শবরদের খবর দিতে গেল।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা একটু বিশ্রাম করে আবার যাত্রা শুরু করলাম। বিষ্ণুদাস পরিব্রাজিকা ও ভট্টের জন্য উপায়ন পাঠালো।

এমনি করে আরও দশদিন পথ চলবার পর অটবীর সীমানা পার হয়ে এলাম। ইতিমধ্যে একদিন রাত্রে একদল হাতীর আক্রমণ ছাড়া আর কোনও বিপদে পড়তে হয় নি। আমাদের আগুন জ্বালানো থাকতো সমস্ত রাত্রি, তাই হাতির দল বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি।

এবার আমরা সুহ্মদেশের অন্তর্গত প্রথম নগরীতে এসে পৌঁছলাম, বিষ্ণুদাসের ক্ষত অনেকখানি শুকিয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও খুব দুর্বল। বিষ্ণুদাস আমাদের দুজনকে তাদের প্রাণরক্ষক বলে খুব শ্রদ্ধা করত। তাছাড়া আমাকে ত সমস্ত সার্থবাহ দলের নেতা বলেই সম্মান করেছিল একদিন। এখানে বিষ্ণুদাসের এক সার্থবাহ আত্মীয় থাকে। তার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে আমাদের খুব খাতির করল। তাছাড়া, নানা দেশের বহু সার্থবাহ সজ্জনদের সঙ্গে বিষ্ণুদাসের খুব ঘনিষ্টতা দেখলাম। তাদের অনেকের সঙ্গে এখানে দেখা হল। আমাদের যাত্রার কথা শুনে তারা প্রত্যেকে আমাদের নামে একটা দুটো করে পরিচয়পত্র লিখে দিল। বিদেশে কোথাও গেলে যাতে আমাদের

কোন প্রকার অসুবিধায় না পড়তে হয় সে ব্যবস্থাও করে দিল। এক একজন সার্থবাহ কমপক্ষে তালপত্রের দুই-তিন পাতা ভর্তি করে আমাদের নামে প্রশংসাপত্র লিখল। তারপর সেই পত্রের নিচে নিজেদের নামাঙ্কিত মোহর। আবার অন্য কাপড়ের মোড়কে পুরে দড়ি বেঁধে চামড়ার খাপে ঢোকানো প্রভৃতিতে বেশ ওজন হতে লাগল এক একটির।

গত একমাস যাবত আমাদের সঙ্গে নাগরিক জীবনের কোন সম্বন্ধ ছিল না। না ছিল ঠিকমতো খাওয়া, না ছিল স্নানাদি, বিশ্রাম প্রভৃতি। তার উপর শবরদের সঙ্গে যুদ্ধের এবং পথ চলার ক্লান্তি। পথ চলতে আমরা অর্ধেক গাড়ী এবং বলদ রাস্তার মধ্যে ছেড়ে এসেছিলাম। এখানে সব জিনিসপত্র খুব সস্তা। তাছাড়া এমন কিছু কিছু জিনিস সার্থবাহদের কাছে দেখলাম যা পাটলিপুত্রে শুধু শ্রেষ্ঠীদের ঘরেই দেখতে পাওয়া যায়।

পথশ্রমে আর রৌদ্রে পুড়ে আমাদের চেহারা বদলে গিয়েছিল কিন্তু সার্থবাহদের আন্তরিক সেবা যত্নে কয়েক্দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমাদের সেবা যত্নে এতটুকু ত্রুটি করেনি তারা। তাদের সঙ্গে একসঙ্গে স্নান করা, সুস্বাদু আহারাদি গ্রহণ করা, শ্বেত ধৌতবস্ত্র ব্যবহার এবং সার্থবাহদের তরুণ দাসীরা সর্বদা সংবাহন এবং সেবার জন্যে তৎপর থাকত। এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা আবার পাটলিপুত্রের চেহারা ফিরে পেলাম। এখানে আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য বহু কিছু ছিল, কিন্তু আমি শুধু নাচ-গানই পছন্দ করতাম। সিংহবর্মা নিজের তুলিকা বের করে প্রথম চিত্র আঁকল। মুহূর্ত মধ্যে নগরীর সকল শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদের মধ্যে পাটলিপুত্রের বিখ্যাত চিত্রকারের সংবাদ প্রচার হয়ে গেল। তার পরেই সিংহবর্মার সারা সময় চিত্রাঙ্কণে কাটিতে লাগল। ইতিমধ্যে আমাদের এক মিত্র সার্থবাহের কন্যা দাসীকে দিয়ে তার নিজের চিত্র আঁকার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছে। সিংহবর্মা অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু সিংহবর্মা ভারতীয় চিত্রকলার মর্মজ্ঞ হলেও সজীব মূর্তি পটের উপর আঁকতে

পারদর্শী নয়। কল্পনার মূর্তি অঙ্কনে তার দেশ জোড়া খ্যাতি ছিল তবুও তিন চার দিন চেষ্টা করবার পর সার্থবাহ কন্যার সজীব চিত্র আঁকতে পারল না। অতঃপর আমি সিংহবর্মার পাশে আর একটি পট নিয়ে বসলাম। বাতায়নের কাছে সার্থবাহ কন্যা বসে থাকে আর আমি তাকে দেখে চিত্রপটে তুলি চালাই। দুচার দিনেই আমার চিত্র তৈরী শেষ হল। ইতিমধ্যে সিংহবর্মারও একটা চিত্র শেষ হয়েছে। কিন্তু ওর পটের চিত্র সার্থবাহ কন্যার চিত্র নয় অপরূপ সুন্দরী এক কল্পনার মূর্তি। আমি আমার তৈরী চিত্র সিংহবর্মার সামনে রেখে বল্লাম—এই নাও চিত্র, সার্থ-কন্যাকে দিয়ে এসো। কিন্তু এক সর্ত্তে।

—কি ?

—এ চিত্র তোমার তৈরী বলে চালাতে হবে। আশ্চর্য হয়ে সিংহবর্মা বললো,

—কিন্তু বন্ধু এ চিত্র তুমি তৈরী করেছ।

—ঠিক কথা। কিন্তু এখানে আমরা দুজনেই চিত্রকর বলে প্রসিদ্ধ হতে চাই না। আমাকে খড়্‌গধারী যোদ্ধারূপেই থাকতে দাও, আর তুমি কলাকার হিসেবে পরিচয় পাও।

এ কয়দিন আমি লক্ষ্য করেছি সিংহবর্মা যখন চিত্রাঙ্কনে তন্ময় হয়ে থাকত, তখন সার্থ-কন্যা অপলক নেত্রে সিংহবর্মার তরুণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত। হঠাৎ কোনও কাজে আমি সেখানে উপস্থিত হলে সার্থ-কন্যা চমকে উঠত এবং অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে মাথা নত করত। সেদিন সিংহবর্মা দুটি চিত্র তরুণীর সামনে রেখে বললো —দেবী, এই হল তোমার বাস্তবিক চিত্র, আর এই তোমার কাল্পনিক চিত্র। তরুণী চিত্র দেখে ভীষণ খুশী হয়ে কৃতজ্ঞতা জানালো। অতঃপর সিংহবর্মা সেখান থেকে বিদায় চাইলে তরুণীর মুখ শুকিয়ে গেল এবং হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ালো। সিংহবর্মা সবিস্ময়ে দেখল তরুণীর চোখে জল। কম্পিত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে অনেক কষ্টে কয়েকটি শব্দ বেরিয়ে এলো সিংহবর্মার উদ্দেশ্যে—

—এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে চাও কেন? আরও কয়েকটা দিন থাকো।

সকল কথা আমার কাছে এসে বললো সিংহবর্মা। আমি শুনে চিন্তিত হলাম। সিংহবর্মা নিজেও এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল না, কিন্তু আমার ইচ্ছার প্রতিকূলে কোন কাজ করবার সামর্থ্য নেই তার তা আমি জানতাম। অগত্যা আমি আরও কিছুদিন এখানে থেকে যেতে মনস্থ করলাম। কিন্তু সার্থবাহদের অতিথি হয়ে নয়। প্রথমে সার্থবাহ খুব অনুরোধ করল তাদের অতিথি হয়ে থাকবার। সুযোগ বুঝে আমি বল্লাম—

—আমাদের যদি এখানে থাকতে হয় কিছুদিন, তাহলে আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা করে থাকতে দিন। অগত্যা সার্থবাহ আমাদের মতে রাজী হয়ে শহরের বাইরে তাদের সুন্দর উদ্যানে আমাদের থাকবার ব্যবস্থা করে দিল।

এমন চমৎকার রমণীয় উদ্যান পেয়ে মনে হল এইখানেই বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিই। চতুর মালী নানারকমের ফুলগাছ সাজিয়ে বাগানের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। গাছের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম বসন্ত আগতপ্রায়। বাগানের ঠিক মাঝখানে এক অপূর্ব সৌধ, তার ঠিক পাশ দিয়ে সুবর্ণরেখার মত একটি নদীর ধারা বয়ে চলেছে। জায়গাটা যেমন আমার পছন্দ হল তেমনি সিংহবর্মার। কিন্তু ওর কাজের এত ভীড় যে অন্য দিকে নজর দেবার সময় ছিল না। আমারও সময় কাটাবার জন্য একটা কাজের ধান্ধা করতে হল। ইচ্ছে করলে মূর্তি তৈরীর কাজে আমি যথেষ্ট উপার্জন করতে পারতাম, কিন্তু দুজনেই আমরা রূপকারের প্রসিদ্ধি চাই না। সিংহবর্মারও ইচ্ছে আমি চিত্র তৈরী করি ওর নাম দিয়ে, আর নিজের খ্যাতি খড়গ এবং বিদ্যার মধ্যেই সীমিত থাক। কিন্তু তাতেও আমার মন সরল না, কারণ তাহলে সে সংবাদ রাজকুল অবধি পৌঁছতে পারে। অগত্যা ভেবে চিন্তে আমি সঙ্গীতাচার্যের রূপ গ্রহণ করলাম। কণ্ঠ সঙ্গীতে এবং যন্ত্র বিদ্যায় নিজের কৃতিত্ব দেখিয়ে

প্রচুর খ্যাতি অর্জন করলাম। আমার চাহিদা দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল।

গীত বাদ্যের প্রতি জনসাধারণের একটি বিশেষ শ্রদ্ধাভাব ছিল এবং পাটলিপুত্রের রাগ ও লয় এর বিশেষ খ্যাতি ছিল অন্যান্য সকল দেশে। নগরের তরুণীদের নৃত্য-গীতে পারদর্শিতা এ সময় তাদের শ্রেষ্ঠ গুণ বলে গণ্য করা হত।

এমনি করে আমাদের দুজনের খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়েই চললো। একজন চিত্রকার। অন্যজন সঙ্গীতাচার্য। এমন কি বিশিষ্ট দু-চার জায়গায় তরুণীদের গীত বাদ্য এবং নৃত্য শিক্ষা দেবার জন্যও আমাকে নিযুক্ত করা হল।

এদিকে সার্থ-কন্যার সঙ্গে সিংহবর্মার প্রেম বেড়ে চলেছে। প্রকৃতির বুকে বসন্তলীলার ধূম লেগেছে। সহকার মঞ্জরীতে ভ্রমরের গুঞ্জনধ্বনি। আকাশ বাতাস সুগন্ধিতে পরিপূর্ণ। সকলের মনে বসন্তের নবীন সুর ঝঙ্কৃত। বসন্ত-উৎসব পালন করছে দেশের নানাস্থানে।

সার্থ-কন্যা প্রায়ই উদ্যানে চলে আসে এবং সিংহবর্মার সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে। তাদের নিবিড় অন্তরঙ্গতা আমাকে উদ্বেল করে তুলল।

একদিন সিংহবর্মা তার প্রেয়সীকে বললো,

—প্রিয়ে, এখন আমরা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছি যে এইবার আমাদের কোন স্থির নির্ণয়ে পৌঁছুতে হবে।

কুমারী ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো,

—কেন আমরা কি এখনও কোনও নির্ণয়ে পৌঁছাই নি ?

—তা পৌঁছেচি বটে। কিন্তু আমাদের নির্ণয়ের উপর তোমার গুরুজনদের স্বীকৃতির মোহর চাই।

—যদি তাদের স্বীকৃতি না পাই ?

কথা বলতে গিয়ে কুমারীর কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। সিংহবর্মা তরুণীকে আরও কাছে টেনে নিয়ে তার অলকগুচ্ছের মধ্যে অঙ্গুলি-চালনা করতে করতে বললো,

—তার জন্য চিন্তা করোনা প্রিয়ে। আমার বন্ধু নিশ্চয় একটা কিছু বিহিত করবে।

বিহিত করা অবশ্য খুব কষ্টসাধ্য নয়। কাবণ আজ পর্যন্ত সকল সার্থবাহরা আমাদের একান্ত আপনার জন মনে করে। তাছাড়া এও জানে যে আমরা উভয়েই অভিজাত বংশজাত তরুণ। যতবার আমরা এখান থেকে বিদায় নিতে চেয়েছি, ততবার তারা সকলে মিলে আমাদের বাধা দিয়েছে।

আরও কিছুদিন পর আমি যাওয়ার কথা বলতে সার্থবাহ বললেন,

—আপনারা ত কলিঙ্গপত্তন যাবেন। আমিও কয়েকদিনের মধ্যেই কলিঙ্গ জিন প্রতিমা দর্শন করতে যাচ্ছি। অতএব আপনারা আমার সঙ্গে যাবেন।

—কিন্তু আমরা ত অটবীর দুর্গম পথে যাবো বলে ঠিক করেছি।

—এখান থেকে তাম্রলিপ্ত যেতেও অটবীর দুর্গম পথ দিয়ে যেতে হবে যেখানে পাগলা হাতী ও বাঘের ভয় পদে পদে। অতএব এ রাস্তায় গেলে আপনারা অটবী যাত্রার রোমাঞ্চ এবং সমুদ্র যাত্রার আনন্দ এক সঙ্গে পাবেন। সেদিন আমি হাঁ বা না কিছুই বললাম না। পরদিন সিংহবর্মার কাছে শুনলাম, সার্থবাহ সপরিবারে কলিঙ্গ জিন প্রতিমা দর্শন করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

*　　*　　*　　*

এবার সমুদ্রপথে চলেছি আমরা কলিঙ্গের দিকে। নির্বিঘ্নে এবং পরমানন্দে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। কদিন আমরা ভেসে চলেছি। অবিরাম আমাদের জাহাজ চলছে।

নীল আকাশের গায়ে সাদা ফুলের মত ছড়ানো তারা দেখে দেখে নাবিকরা জাহাজ চালাচ্ছে। কয়েকজন নাবিক যারা জাহাজ চালনায় ব্যাপৃত তারা ছাড়া বাকী সকল পোতারোহী গভীর নিদ্রামগ্ন। নিশ্চিন্ত মনে আমিও আকাশের দিকে তাকিয়ে শুয়ে ছিলুম। জাহাজ চলছে, আর চলছে।

এমন সময় হঠাৎ ভীষণ জোরে জাহাজ দুলে উঠল। ঘুমের

ঘোরে আচমকা ধাক্কা পেয়ে সব যাত্রিরা একদিকে গড়িয়ে গেল। এক মূহূর্তে জাহাজের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। অথচ কেউ বুঝতে পারছে না কি হল। ততক্ষণে সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা জাহাজের মধ্যে এসে আছড়ে পড়ছে আর জাহাজ ক্রমশ জলপূর্ণ হচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারে জাহাজ কোনদিকে যাচ্ছে বোঝা যায় না। পালের দড়ি কেটে গিয়ে মাস্তুলের উপর পত পত করে ঝুলছে। নাবিকরা প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু জলের ভারে জাহাজ একদিকে কাত হয়ে গেছে। একদিকে অসহায় নরনারীর আর্ত চীৎকার, ছুটোছুটি, প্রাণ রক্ষার ব্যাকুল প্রার্থনা, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ তরঙ্গমালা আক্রোশে ফুলে ফুলে উঠছে, আর একটু একটু করে জাহাজখানা গ্রাস করছে। নাবিকরা চীৎকার করে সকলকে জাহাজের অন্যদিকে যেতে বলছে কিন্তু আরোহীরা প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি শুরু করেছে, কে কার কথা শোনে। আমি জাহাজের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে হতভম্বের মত ভাবছি, হঠাৎ একি হল, এখন কর্তব্যই বা কি। তখনও আমরা কেউই খেয়াল করতে পারিনি যে জাহাজকে কোন অদৃশ্য পাহাড়ের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আমার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মত চিন্তাধারা ছুটছে। এমন সময় ভীষণ বেগে জাহাজটার সঙ্গে কোন কিছুর সঙ্ঘর্ষ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে মনে হল কেউ যেন আমাকে ছুড়ে ফেলে দিল মহাশূন্যে। তখনও আমি জ্ঞান হারাইনি। জলে পড়ে আমি সাঁতরাতে লাগলাম। কানে ভেসে এল মরণোন্মুখের আর্ত কলরব। তার পরেই সব স্তব্ধ হয়ে গেল। জেগে রইল শুধু সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জন। উপরে নীল আকাশ আর নিচে অনন্ত সমুদ্রের বুকে মহানিশার অন্ধকারে দিশেহারা আমি ভেসে চললুম। কোথায় কোন দিকে, তার কোনও নিরীখ নেই। অকূল সমুদ্রে কতক্ষণ এমনি করে সাঁতার কাটব ? লাভই বা কি ? কিন্তু মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করা কাপুরুষতা মনে হল, তাই যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এই ভেবে ভেসে চল্লাম।

ভেসে চল্লাম নিরুদ্দেশ স্রোতের মুখে। সাঁতার কেটে শক্তি ক্ষয়

করা উচিত নয় ভেবে চিত হয়ে ভাসতে লাগলাম। আকাশের সপ্তর্ষী'র সাতটি তারার মধ্যে চারটি তখন সমুদ্রের গর্ভে ডুবে গেছে অতএব সূর্যোদয় হতে এখনও তিনটি তারা বাকী। তুফান শেষ হয়ে সমুদ্র অনেকখানি শান্ত হয়েছে। দৈবাৎ পায়ে একটা কিসের স্পর্শ পেলাম। সেটাকে ধরলাম। একটা বিরাট কাষ্ঠখণ্ড। তার উপর হাত পা ছড়িয়ে শোওয়া চলে এত বড়। কিন্তু যদি তট থেকে বহুদূরে আমাদের জাহাজ চূর্ণ হয়ে থাকে তাহলে এই কাঠ আশ্রয় করে কদিনই বা বেঁচে থাকবো! দুচারদিন হয়ত জীবনটা বাঁচতে পারে তারপর সেই মৃত্যু। কাঠের টুকরোটার উপর শুয়ে নানারকম চিন্তা এসে মনে জট পাকাতে লাগলো। মনে হল এ বিশাল পৃথিবীতে আমার জীবনের মূল্যই বা কতটুকু। অবসাদে শরীর ভেঙ্গে এল। শরীর থেকে হাত পা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো আলগা হয়ে খসে পড়ছে। চোখের সামনে একটা কালো কালির গোলা উপর থেকে নেমে এসে চোখের উপর চেপে বসছে। ধীরে ধীরে হৃদয়ের স্পন্দন ও বুঝি থেমে আসছে।

কাঠের আশ্রয় পেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিংবা চেতনা হারিয়েছিলাম জানি না।

যখন চেতনা ফিরে পেলাম, তখন চোখ খুলতে সাহস হচ্ছিল না। ক্রমে ক্রমে মনে পড়তে লাগল সব ঘটনা। মনে হচ্ছিল এখনও রাত্রি রয়েছে নয়ত চোখ খুললেই দেখতে পাব দিগন্তব্যাপী ভয়াল মহাসমুদ্র। চোখ খুলে লাভ নেই, কিন্তু ঊষা দেবীর স্বচ্ছ আলো চোখের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করে চোখ খুলে দিল। তাকিয়ে দেখি নীল আকাশের তারাগুলি কখন অদৃশ্য হয়েছে। পূর্ব দিকে সমুদ্রের গর্ভ থেকে সূর্যের লাল আভা ঠিকরে বেরিয়ে কোণের আকাশে সিঁদূর লেপে দিয়েছে। উঠে দাঁড়ালাম। পিছন দিকে ফিরে দেখি পশ্চিম দিকে সারি সারি তালগাছ। তাহলে আমি বেঁচে আছি এবং তীরে উঠেছি। আশায় আনন্দে মন ভরে উঠল। আবার সমুদ্রের দিকে, তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও কোন

জীবনের চিহ্ন দেখতে পাই কি না। কিন্তু না, এতগুলি জীবন বলি নিয়ে অশান্ত সমুদ্র শান্ত হয়েছে। গত রাত্রের নির্মমতার কোনও চিহ্নই আর অবশিষ্ট নেই। অতঃপর বালু-বেলায় দাঁড়িয়ে আমার লম্বা চুলগুলি নিংড়ে জল ঝেড়ে নিলাম। আমার দেহে একখানি অন্তরবাস (ধূতি) ছাড়া আর কিছুই নেই। কোমরে হাত দিয়ে দেখি দীনারভর্তি থলিটি তখনও বাঁধা রয়েছে। থাক, একটা অবলম্বন আছে। কিন্তু আমার সহযাত্রীদের জন্য দারুণ বেদনায় মন ভরে গেল, এবার কোথায় কোন দিকে যাব চিন্তা করতে লাগলাম। একা নিরুদ্দিষ্টের মত বেলা-ভূমির বালু ভেঙ্গে উত্তর দিকে চলতে থাকলাম। প্রায় এক ক্রোশ চলবার পর সমুদ্রের কিনারায় একখানি ভগ্নপোতের একাংশ দেখতে পেলাম। কিন্তু সেটা আমাদেরই গত রাত্রের ভাঙ্গা পোত কিনা নিশ্চিত হতে পারলাম না। এগিয়ে চললাম। জাহাজ থেকে ভেসে আসা কিছু জিনিসপত্র সমুদ্রতটে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অদূরে একটা মানুষের দেহ দেখে ছুটে গেলাম। কিন্তু হায়! তার দেহে প্রাণ নেই, শবটি আমাদের মিত্র সার্থবাহের। তার শরীর খুব মোটা বলে তার পক্ষে বেশীক্ষণ সাঁতরান সম্ভব হয়নি। কিন্তু সিংহবর্মার সম্বন্ধে আমি নিরাশ হলাম না। মনে হল আমার মত সেও নিশ্চয় বেঁচে আছে। আরও কিছুটা দূরে আরও পাঁচ-ছয়জন যাত্রীর মৃতদেহ দেখতে পেলাম। তার মধ্যে একমাত্র সার্থবাহ পত্নী ছাড়া আর কারুকে চিনতে পারলাম না। সামনে আর কোথাও কিছু দেখতে না পেয়ে হতাশ হয়ে তালবনের দিকে এগিয়ে গেলাম। আশেপাশে কোনও মানুষের বসতি নেই। জীবনের চিহ্ন নেই। আমার খেদ হতে লাগল যে আমি তাল গাছে উঠতে পারিনা। নইলে গাছে উঠে অনেকদূর নিরীক্ষণ করতে পারতাম।

এখানে আশে-পাশে বাবলার গাছ এবং ফণী মনসার ঝোপ-ঝাড়। শুধু পায়ে কাঁটার মধ্যে দিয়ে চলা উচিত মনে হল না। আবার বালুতট ধরে চললাম। কিছুদূর গিয়ে একটা তালবনের মধ্যে একটি

মানুষ বসতির সন্ধান পেলাম। এগিয়ে গেলাম সেইদিকে। আমাকে দেখেই কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে এল।

এতক্ষণে আমার ভিজে কাপড় প্রায় শুকিয়ে এসেছে। তবুও আমার অবস্থা দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে আমি বিপদাপন্ন। কুকুরের শব্দ শুনে দু-তিনজন স্ত্রীলোক ঘর থেকে ছুটে এল। এবং কুকুরগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে আমাকে কিছু বললো, কিন্তু আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না। মনে হল আমি কোন অজ্ঞাত দ্বীপে এসে পৌঁছেচি। জাহাজে থাকাকালে আমরা সমুদ্রের তীর লক্ষ্য করেই চলেছিলাম এবং গন্তব্যস্থান সম্বন্ধে নাবিকরা নিশ্চিন্ত ছিল। তবু এখানে কেমন করে ভেসে এলাম।

কালো জামের মত কালো মেয়েগুলির শরীর। তার উপর নীল রংএর এক টুকরো অন্তরবাসক কটির নিচে জড়িয়ে রাখা। কটিদেশের উপর মাথায় কালো চুল ছাড়া আর কোনও আবরণ নেই। চুলগুলি পিছন দিকে বাঁধা। গলায় কড়ি, পাথর প্রভৃতির মালা। হাতে ধাতুর তৈরী পেটাই চুড়ি। কানে ভারী বস্তু একটা বাঁধা রয়েছে। তার ভারে কান লম্বা হয়ে কাঁধের কাছ অবধি ঝুলে পড়েছে। এ ধরনের দ্বীপ সম্বন্ধে অনেক গল্প শুনেছি। ছোটবেলায় কুলুপার কাছে গল্প শুনতাম। এই রকম ভগ্নপোত থেকে কোনও প্রকারে প্রাণে বেঁচে রাজকুমার যখন তীরে এসে দাঁড়াল তখন চারিদিক থেকে রাক্ষুসীরা এসে ঘিরে দাঁড়াল এবং রাজকুমারকে বন্দী করে নিয়ে গেল। আমার মনে হল আমি বোধ হয় তেমনি কোনও দ্বীপে এসে পড়েছি। কিন্তু এখানে মাত্র তিনজন স্ত্রী আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তারা হাতের ইশারায় আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে বললো। হঠাৎ আমার মনে হল এই একটি ভাষা পৃথিবীর সব মানুষের এক। আমি সমুদ্রের দিকে হাত বাড়িয়ে নিজের বুকের উপর হাত রেখে ইশারায় বোঝাতে চাইলাম যে আমি সমুদ্র দুর্ঘটনায় বিপদাপন্ন। কিন্তু স্ত্রী লোকগুলি আমার সব কথা না শুনে হাতের ইশারায় বাড়ীর

মধ্যে ডাক দিল। তারা আমাকে একটি ঘর দেখিয়ে ভিতরে যাবার ইশারা করতে আমি একবার ভেতরে চেয়ে দেখলাম। ছোট ছোট ঘর তালপাতার ছাউনি এবং তালপাতার বেড়া দিয়ে ঘেরা। ঘরে ঢোকবার সময় আমার কেমন ভয় করছিল। মনে হচ্ছিল এইবার বোধ হয় একসঙ্গে দু-পাঁচ হাজার রাক্ষসী একসঙ্গে আমাকে শত্রু মনে করবে এবং ছিঁড়ে খাবে আমাকে। ঘরের ভিতরে যাবার আগে দরজার কাছে আর একবার দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম। যদি আমাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে এরা দরজা বন্ধ করে দেয়? তাহলে সমুদ্র থেকে রক্ষা পাওয়া প্রাণটা বেঘোরে এদের হাতে যাবে। স্ত্রীলোক তিনটি আমার দিকে তাকিয়েছিল দেখে আমি মুখে হাত দিয়ে ক্ষুধার সঙ্কেত করলাম। আমার ইশারা ওরা বুঝতে পেরে কি সব বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে দুজন প্রৌঢ়া স্ত্রী অন্যত্র চলে গেল। সেখানে রইল একজন ষোড়শী তরুণী।

জম্বু শ্যামা ষোড়শীর সর্বাঙ্গে কানায় কানায় যৌবন। যেন মাটীর তৈরী মূর্তি। উন্নত বুকের গোলাকার স্তনযুগল শ্রীফলের স্মৃতি নিয়ে জেগে রয়েছে। বড় বড় গোল চোখ দুটির শুভ্র শ্বেতিমা মোহময়, দৃষ্টিতে মাদকতা পূর্ণ। এদের চেহারা ত রাক্ষসীর মত নয়। ভয় কাটিয়ে মাথা নিচু করে করে ঢুকলাম।

ঘরের মধ্যে গিয়ে যা দেখলাম তাতে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারলাম না। মনে হল আমি বোধ হয় এখনও সমুদ্রের বিভীষিকা দেখছি। আমার চোখের ঘোর কাটেনি।

সবিস্ময়ে চেয়ে দেখলাম, ঘরের মধ্যে একটা চাটাইয়ের উপর সিংহবর্মা এবং তার প্রেয়সী বাসন্তী অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে। একমাত্র বুকের ওঠানামা ছাড়া প্রাণের আর কোন লক্ষণ নেই। স্মৃতিপটে এক এক করে সমস্ত ঘটনাগুলি ভেসে উঠল। পাটলিপুত্র থেকে এই মুহূর্ত পর্যন্ত সব কিছু স্বপ্নের মতই মনে হয়, কিন্তু যদি তাই হয় তাহলে সমস্ত জীবনটাই ত স্বপ্ন।

ষোড়শী শ্যামা ঘরের এক কোণে এসে বসে আমাদের দেখতে

লাগল। কিছুক্ষণ পরে প্রৌঢ়া দুজন একটা মাটীর পাত্রে ভাত আর জলপাত্রে জল এনে আমার সামনে রাখল। খিদে আমার সত্যিই পেয়েছিল কিন্তু সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। তবুও খেয়ে নিলাম সব। ভাতের সঙ্গে লবণ এবং মাছ ছিল, স্বাদ বিচার করবার সময় এটা নয়, তাই মনে কোন দ্বিধা না করেই খেয়ে নিলাম। খাওয়া শেষ হলে প্রৌঢ়া দুজন চলে গেল। যাবার সময় শ্যামা ষোড়শীকে কিছু বলে গেল।

আমি কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম। পেটের চিন্তা নেই, তাছাড়া আমার সামনে আমার বন্ধু ও তার প্রেয়সী দুজনেই জীবিত। এখন এই দুটি প্রাণোচ্ছ্বল মূর্তির দিকে চেয়ে আমার বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারি। একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ওদের পাশে বসলাম। আমার কঞ্চুকের (জামা) উপর হংসমিথুন আঁকা ছিল, হঠাৎ চেয়ে দেখি শ্যামা তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। আমি এবার ভাল করে ওকে দেখলাম, শ্যামাও নিঃসঙ্কোচে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিল। আমিই বরং লজ্জায় মুখ নামিয়ে নিলাম। শ্যামা আমার আরও কাছে সরে এসে আমার কঞ্চুকের উপর আঁকা হংসমিথুন দেখতে লাগল। আমি ওর দিকে তাকাতে ও হাত আকাশের দিকে দেখিয়ে ইশারা করে হেসে ফেল্ল। এখনি কিছুক্ষণের মধ্যে আমারও সঙ্কোচ দূর হল। শ্যামা আমার কঞ্চুক ও অন্তরবাস হাত দিয়ে ধরে দেখতে লাগল, আমিও তার কাপড় ধরে দেখলাম। আমার কাপড় যতখানি মিহি ও মসৃন সেই তুলনায় ওর কাপড় শতগুণে রুক্ষ। এককথায় কম্বলের মত বললেও অত্যুক্তি হয় না। যাই হোক আর সকল কিছু আমি বিনা দ্বিধায় ওর অনুকরণ করতে পারি কিন্তু ওর অব্যাজ হাসি ও নিঃসঙ্কোচ শুভ্র-দৃষ্টি অনুকরণ করা আমার পক্ষে অসাধ্য।

এমনি ভাবে আকারে ইঙ্গিতে আমরা নিজেদের প্রকাশ করবার চেষ্টা করলাম। এমনি করে যদি এক যুগ অপেক্ষা করেও আমরা একে অন্যের ভাষা আয়ত্ব করতে পারি, একে অন্যের অন্তস্থলে প্রবেশ

করতে পারি তাতেও কোন ক্ষতি নেই। আমি অবাক হয়ে শ্যামাকে দেখছি। শ্যামাও দেখছে আমাকে। দেখছে আর মুচকি হাসছে। অপরূপ সে হাসি, কম্পিত অধরের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় মুক্তার মত দাঁতের সারি। প্রাণ খোলা সে হাসির উচ্ছ্বাসে তার উন্নত বক্ষ দুটি সমুদ্রের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ফুলে ফুলে উঠছে।

এমন সময় সিংহবর্মা আড়মোড়া ভেঙ্গে পাশ ফিরে শুয়ে চোখ খুললো। সিংহবর্মা চোখ খুলে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেই উঠে দাঁড়ালো, আমি ও তাড়াতাড়ি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে আনন্দে ও ভাষা হারিয়ে ফেল্ল এবং আমরা দুজন কতক্ষণ সে আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ হয়ে রইলাম তা মনে নেই। প্রথম আমিই কথা বললাম —বন্ধু, এটা কী আমাদের নবজন্ম নয়?

—শুধু নবজন্ম নয় প্রিয়বন্ধু, আশ্চর্য সুন্দর জন্ম। দেখ আমরা জন্মগ্রহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে তারুণ্য পেলাম এবং প্রাণাধিক প্রিয় বন্ধুকে পেলাম।

আমাদের আনন্দোচ্ছ্বাস ও হাব-ভাব দেখে শ্যামা তৃপ্তির হাসি হাসছে, ইতিমধ্যে বাসন্তী জেগে উঠল। বাসন্তী চোখ খুলে আমাদের দেখে শাড়ী দিয়ে তার দেহ ঢাকতে লাগল। আমি বাসন্তীকে বল্লাম,—বাসন্তী বৌদি। আজ পর্যন্ত যা কিছু শিখেছিলে সব ভুলে যাও। সে সব শিক্ষার কোনও মূল্য নেই এখানে। মনে কর সব শিক্ষা দীক্ষা সমুদ্রের জলে ধুয়ে গেছে। এখন এই শ্যামার কাছ থেকে নতুন করে শেখ। বাসন্তী দেবী আমার কথা শুনে মৃদু হাসল কিন্তু আঁচল গুছিয়ে গায়ের ওপর টেনে নিল।

সমুদ্র যাত্রা শেষ হল। এখন আমাদের সবার আগে জানতে হবে আমরা কোথায় আছি। এখান থেকে সভ্য নাগরিকদের লোকালয় কতদূরে। কিন্তু জানবার উপায়ই বা কী। এদের ভাষা আমরা বুঝিনা, আমাদের ভাষাও ওরা বোঝে না। আমি সিংহবর্মাকে জিজ্ঞাসা করলাম,

—তোমরা কিছু খেয়েছ ?

—না, কিন্তু খিদে পেয়েছে খুব। আমাদের কথা শেষ না হতে সেই প্রৌঢ়া দুজন মাটীর পাত্রে ভাত এবং জল এনে সামনে ধরে দিল। আমি বাসন্তীর দিকে মুখ করে বল্লাম,

—এখন লজ্জা ছাড়ো বাসন্তী দেবী। আমাদের সৌভাগ্য যে এখনও আমাদের শরীরের এই বস্ত্রটুকু সঙ্গে আছে। নয়তো সমুদ্রের গর্ভ থেকে আমাদের ঠিক তেমনি করে তীরে উঠতে হত যেমন করে মাতার গর্ভ থেকে শিশু ভূমিষ্ট হয়। এখন এদের দেশের নিয়মানুযায়ী এখানে বাস করতে হবে ততদিন, যতদিন আবার আমরা সভ্য দুনিয়ায় পৌঁছতে না পারছি। ধীরে ধীরে এই শ্যামার কাছে সব শিখে নাও।

বাসন্তী মাথা নিচু করে ঈষৎ হাসল। শ্যামার মুখেও হাসি ফুটল। আমি সিংহবর্মার উদ্দেশে বল্লাম,

—বন্ধু, এখন অন্যচিন্তা ছেড়ে দিয়ে সামনে ঐ অন্ন দেবতার পূজা করো আগে। এর মধ্যে তণ্ডুল, লবণ, মাছ এবং জল ছাড়া অন্য কিছু নেই। আমি খেয়েছি এবং আমি শপথ করে বলতে পারি কোনও পরমভট্টারকের ভোজনশালায় এমন সুস্বাদু খাবার কখনও খাইনি।

ভোজন পাত্র সিংহবর্মার সামনেই ছিল। বাসন্তী পাশে বসেছিল কিন্তু এখনও তার লজ্জা বা জড়তা সম্পূর্ণ কাটেনি। একটাই পাত্রে খাবার খেতে হবে দুজনকে। অগত্যা আবার আমাকে বলতে হল—বাসন্তী বৌদি। বন্ধু সিংহবর্মা বয়সে আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়। সেই সূত্রে তুমি নিশ্চয় আমার বৌদি এবং আমি তোমার দেবর। যদি কখনও অজ্ঞানবশতঃ আমার মুখ দিয়ে তেমন কোন কথা বেরিয়ে যায় তাহলে যেমন অন্য বৌদিরা তাদের দেবরের সব ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে তেমনি তুমিও আমাকে ক্ষমা করো। এখন পরমভট্টারিকা বৌদি বাসন্তী দেবীর কাছে আমার নিবেদন এই যে, আমার অগ্রজ সিংহবর্মার পরমভট্টারিকা হবার

বহুদিন আগেই তাঁর মহাদেবী হয়েছো। একথা অবশ্য একমাত্র আমরা এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জানে না। এখন এখানকার লোকেরা এবং এই তরুণী শ্যামাও সেই অনুমানই করেছে, তার কারণ তোমরা দুজন একই সঙ্গে ধরা পড়েছ। অতএব স্বামী স্ত্রী'র মত নিঃসঙ্কোচে এক থালায় অন্নগ্রহণ করতে দ্বিধা করোনা। এখানে দুজনের জন্য আলাদা পাত্রের ব্যবস্থা করা মুস্কিল এবং তা করতে গেলে এদের সন্দেহও হতে পারে।

আমার কথা শুনে সিংহ বাসন্তীর হাত ধরে ভাতের থালার উপর চেপে ধরল। অগত্যা বাসন্তী গ্রাস মুখে তুলল। মাথা নিচু করে প্রথম গ্রাস মুখে দিয়ে আড়চোখে আমার দিকে তাকাতে আমি তার সেই অপরূপ ভঙ্গিমা দেখে স্তম্ভিত হলাম। চিত্র তৈরীর সময়ে ওকে অনেকবার দেখেছি, উদ্যানবাটিতেও কয়েকবার আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয়েছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য কখনো চোখে পড়েনি। এখন ওর চোখ দুটি লাল, সারাদেহে ক্লান্তির ও দুশ্চিন্তার ছাপ। তবু তার সলাজ সহাস চাউনির তুলনা হয়না।

আমি বললাম—ব্যস বৌদি। মাঝে মাঝে অনুগ্রহ করে ঠিক এমনি মধুর কটাক্ষপাত করো আমার দিকে, তাহলে দেবর লক্ষ্মণ তার ভাইও বৌদির সঙ্গে মাত্র চৌদ্দ বৎসর কেন সারাজীবন হাসিমুখে এই বনবাসে কাটিয়ে দেবে।

সিংহ বেশ মুরুব্বিয়ানা ভাবে জবাব দিল,

—জয়, বুঝে শুঝে কথা বলো। মনে করোনা যে তোমার বাসন্তী বৌদি চিরকাল এমনি বোবা হয়ে থাকবে। ও যখন কথা বলতে আরম্ভ করবে, তখন তার উত্তর খুঁজে পাবে না তুমি, মনে থাকে যেন।

আমি বাসন্তী বৌদির দিকে তাকাতে মাথা নেড়ে সে চোখের ইঙ্গিতে সিংহকে সমর্থন জানাল।

॥ দশ ॥

মানবতার বাল্যজীবনে

খাওয়া শেষ হলে সিংহ নিজের কাহিনী শোনাল: যে সময় জাহাজে দুর্ঘটনা ঘটল তখন আমরা দুজনে কাছাকাছি শুয়েছিলাম। চারিদিকে তখন মৃত্যুর লীলাখেলা চলছে। কি করব চিন্তা করছি এমন সময় আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কায় আমরা সমুদ্রের জলে ছিটকে পড়লাম। আমার চোখের সামনে বাসন্তী তলিয়ে যাচ্ছিল দেখে ওকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। তখন লজ্জা সঙ্কোচের অনুভূতি লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

চিন্তার সময় ছিল না, বাসন্তীকে পিঠের উপর তুলে নিয়ে প্রাণপণে সাঁতার কেটে সরে এলাম। তবে এ কথা ধ্রুব সত্য যে যদি দুজনেই সাঁতার না জানতাম, তা হলে কেউই আমরা বাঁচতে পারতাম না। খানিকদূর গিয়ে আমি বাসন্তীকে একহাতে আমার কোমর ধরে সাঁতরাতে বললাম। সেই সময় এক মূহূর্তের জন্য ও আমার কাছ থেকে একটু দূরে সরে গিয়েছিল। অন্ধকারের মধ্যে ডাক দিতে ও আমার কাছে এলো। এমনি করে আমরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে এগুতে লাগলাম অজানার দিকে। কিছুক্ষণ পরে ক্লান্তি ও নিরাশার অন্ধকারে মনকে আচ্ছন্ন করতে লাগল। তখন আমি শবাসন হয়ে শরীরটাকে ভাসিয়ে দিলাম এবং বাসন্তীকেও তেমনি করতে বললাম। তারপর কতক্ষণ তরঙ্গের মুখে ভেসেছি তা মনে নেই। ক্রমশ সমুদ্র শান্ত হয়ে এল। শেষ অবধি ভীষণ অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম।

বাসন্তীকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বল্লাম,

—দেখেছ বৌদি, ভাই সিংহ তোমাকে কেমন করে মৃত্যুর মুখ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এল?

এইবার বাসন্তী দেবী কথা বললো,

—তাইতো আমরা পৌরুষের পূজারী।

—কিন্তু পৌরুষের শক্তি নারী। প্রেরণা দেয় নারী।

—না জয়, তোমার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে। যাই হোক আগে কথা শেষ করতে দাও। সমুদ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে যখনই ক্লান্তি বোধ করেছি, তখনই বাসন্তীর দিকে ফিরে দেখেছি। ওর কথা ভেবেছি। ওর চিন্তা, ওর স্পর্শ আমাকে বাঁচবার প্রেরণা দিয়েছে। দেহে শক্তি দিয়েছে। শরীর অবশ হয়ে এসেছে কিন্তু মন ভেঙ্গে পড়েনি।

বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে বাসন্তীকে।

এমন সময় দৈবাৎ আমার পা মাটিতে ঠেকল। তখন আমি যেন সহস্র হস্তীর শক্তি পেলাম। পায়ের নিচে মাটির আশ্রয় পেয়েছি। বাসন্তীকে তখন কাঁধে তুলে নিয়ে আমি এগুতে লাগলাম।

—সাবাশ? তুমি তাহলে কুম্ভকর্ণকেও হার মানিয়েছ? যার ভয়ে সপ্ত সমুদ্র কোমর জলের বেশী রাখতে সাহস করত না। আর দ্রৌপদীও তোমার উপর ভরসা রেখেছিল তাই রক্ষে।

—না দেবর·········, অসমাপ্ত রয়ে গেল বাসন্তীর কথা।

আমি বল্লাম—থামলে কেন, শেষ করো। আমি দেবর বৈত নয়।

—হ্যাঁ, যখন আমার মনে হল যে আমরা তটের সন্ধান পেয়েছি, তখন আমি মাটিতে পা রাখতে গিয়ে মাটির স্পর্শ পেলাম না।

—কাজেই দ্রৌপদী ভীমের কাঁধে চাপল।

—না আমি কাঁধে চাপিনি। আমি স্বাধীন ভাবে বাকিটুকু সাঁতরে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ও জোর করে আমায় কাঁধে তুলে নিল।

—তাহলে ভাই ভট্টারক জবরদস্তী ভীম হতে চাইল? ভাগ্যিস সে সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম না,—যখন ভীম দ্রৌপদীকে সাগর থেকে উদ্ধার করে ডাঙ্গায় এসে দাঁড়াল। যদিও তার চেয়ে

ভাল উপমা রয়েছে মহাবরাহের। বিষ্ণু মহাবরাহের রূপে সমুদ্র থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু এটার মত জীবন্ত উপমা নয়।

—সত্যিই তাই, ভীমই বলো আর মহাবরাহই বলো, তখন তোমার ভাই নিজের পৌরুষ জাহির করবার জন্য মাত্রাতিরিক্ত উতলা হয়েছিল। এত যে ক্লান্তি ও দুশ্চিন্তা সব যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। তখন তোমার ভাইয়ের উন্মত্ত উল্লাসের কথা মনে পড়লে এখনও আমার হাসি পায়।

—কেন উল্লাস হবেনা বলতো জয়। তখন যদি সমুদ্র থেকে আমাকে একলা তীরে উঠতে হতো, তাহলে আমার অবস্থা কি হত? আমার উমাকে যে মৃত্যুর অন্ধকার থেকে আবার জীবনের আলোয় আনতে পেরেছি এর চেয়ে বেশী আনন্দের আর কী হতে পারে? মানুষ প্রথমে অনুভূতি দিয়ে আনন্দ বেদনা অনুভব করে, তারপরে ভাষায় প্রকাশ করে।

—বুঝলাম, কিন্তু বৌদি! তোমাকে কাঁধে করে যখন সিংহ সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল, তখন তুমি কী অনুভব করছিলে?

—আমি তখন পূর্বাচলে অরুণোদয় দেখছিলাম।

—অর্থাৎ তোমার প্রভাত জীবনাকাশে উদয় চাঞ্চল্য অনুভব করছিলে?

সিংহ এবার তাদের অপ্রত্যাশিত ও অভাবিত রক্ষা পর্বের শেষ অধ্যায় বর্ণণা করল:

তারপর যখন আমরা বেলাভূমিতে এসে দাঁড়ালাম তখন পূব দিক লাল হয়ে উঠেছে। আমি ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছি। নিজের বুকের ধকধকানি শুনতে পাচ্ছি। এমন সময় দূরে এই তালকুঞ্জ দেখে মনে খানিকটা আশা হল। মনে ভেবেছিলাম একটু সুস্থ হয়ে তারপর আশ্রয় সন্ধান করবো। ইতিমধ্যে কয়েকজন পুরুষ জাল নিয়ে মাছ ধরতে যাচ্ছিল। তাদেরই একজন আমাদের দেখতে পেয়ে এই বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

—আমি এসে দেখলাম তোমরা দুজনে চেটাইয়ের ওপর ঘুমে অচেতন। আমার আনন্দের অবধি রইল না।

—এবার তোমার কথা বল দেবর। বাসন্তী অনুরোধ জানাল।

—তোমার কথাগুলি ভারি মিষ্টি লাগে বৌদি। ভাগ্যিস আমাকে তোমাদের সঙ্গে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে হয়নি। তাহলে ভাই সিংহ ভীমের বদলে যুধিষ্ঠির হয়ে শান্তির নিশ্বাস ফেলতে পারত। আমার কথা ঠিক তোমাদের উল্টো। তোমরা চাটাইয়ের উপর এসে ঘুমিয়েছ, আর আমি ক্ষীর সমুদ্রে শেষ শয্যা পরে ঘুমের কাজটা সেরে নিয়েছি।

আমার কথা শুনে বাসন্তীর চোখে মুখে হাসি ফুটে উঠল। সিংহ বাসন্তীর দিকে একবার তাকিয়ে আমাকে বললো,

—অর্থাৎ তোমার হাত একখানা কাঠের তক্তার সঙ্গে গিয়ে ঠেকল, আর তুমি কষ্ট করে সাঁতরাবার বদলে তার উপর শুয়ে পড়লে।

—আমাকে এতখানি ছোট মনে করোনা ভাই সিংহ।

—আমাকে ত ভীম বানিয়ে দিলে, আর নিজের বেলায় শেষশায়ী ভগবান আখ্যা নিয়ে নিলে। তারচেয়ে বলোনা কেন পরাক্রম দেখাবার বদলে হাত পা ঢিলে করে কাঠ ও সমুদ্রের স্রোতের মুখে নিজেকে সমর্পন করে দিলে।

—বন্ধু, বৌদির সামনে এতখানি কাপুরুষ প্রতিপন্ন করোনা আমাকে।

—তোমার বৌদিকে কি এত নির্বুদ্ধি মনে করো দেবর, যে তোমার ভাইয়ের কথার ভুলে যাব? তাছাড়া আমার মামা স্বার্থ-বাহের কাছে আমি শুনেছি অটবীতে শবরদের সঙ্গে লড়াইতে তোমার বীর পরাক্রমের কথা, আমি সব জানি।

—সে লড়াইতে সিংহবর্মা ছিল আমার সহ সেনাপতি।

—তা জানি। তোমার ভাইকে আমি খর্ব করিনি। তবুও আমি জানি তুমি শেষশায়ী নও, নিশ্চয় তার কোন নিগূঢ় কারণ ছিল।

—ধন্য দেবী ভট্টারিকা। ব্যঙ্গ করে বলল সিংহবর্মা বাসন্তীকে। জয়ের মিঠে বুলি এরি মধ্যে তোমাকে জয় করে নিল।

—না সিংহ, বৌদির ধারণা অমূলক নয়। তাহলে কারণটা বলি শোনো। প্রথমতঃ আমি দিক নির্ণয় করতে পারিনি। বুঝতে পারিনি কোনদিকে তীর। ভয় হল, যদি হাত পা দুটোকে পরিশ্রান্ত করে ফেলি আর আমার মুখ যদি সমুদ্রের দিকে হয়, তাহলে মৃত্যু অবধারিত। সকল পরাক্রম ব্যর্থ হবে শেষ পর্যন্ত। অবশ্য তোমার শক্তির ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতে হয়। কিন্তু আসলে দেবের অনুগ্রহে আমরা তীরে আসতে পেরেছি।

—বুঝলে ত ভট্টারক মশাই ? আমার দেবর তোমার মত শক্তির বড়াই করেনি।

—হ্যাঁ বৌদি ঠিক তাই। নইলে সেই অকুল সমুদ্রে নিশ্চিন্ত হয়ে কাঠের তক্তার ওপর ঘুমিয়ে পড়তাম না। সকাল হতে চোখ খুলে দেখি তীরে এসে পড়েছি। ভগ্ন পোতের কত খাবার জিনিস, যাত্রিদের শব দেখলাম। তারপর দিক ঠিক করবার জন্য ঐ উঁচু টিলাটার উপর উঠে এই বস্তীটা দেখতে পেয়ে এখানে এলুম। আসতেই কুকুর তাড়া করে এসেছিল কিন্তু ঐ শ্যামা তরুণী এবং ওর দুইজন সাথী কুকুরের হাত থেকে বাঁচিয়ে এই ঘর অবধি পৌঁছে দিয়ে যায়। এখানে এসেই দেখলাম তোমরা দুজনে অসাড়ে ঘুমচ্ছো।

এরপর কয়েকদিন পর্যন্ত বাসন্তীকে তার বাবা মায়ের শোচনীয় মৃত্যু সংবাদ দিইনি। দুঃসংবাদটা শোনাবার জন্য আমি শক্তি সংহত করেছি এবং নিরুপায় হয়ে তার কোমল বুকে আঘাত করেছি।

বাসন্তী লুটিয়ে পড়ে ফুলে ফুলে কেঁদেছে।

* * * * * *

এখন জানতে পারিনি আমরা কোথায় আছি। ভাষা না জানার জন্যে আমি ওদের কিছু জিজ্ঞাসা করতেও পারছি না।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা গ্রামের সকল নরনারী খেত খামার থেকে

বস্তীতে ফিরে এলো। সারাদিন পরে বস্তী আবার প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল। এমন সময় গ্রাম্য নেতার বাড়ী থেকে আমাদের ডাক এলো। আমরা গেলাম। তার বাড়ীতে অনেক স্ত্রী পুরুষের-ভীড়। সসম্মানে আমাদের বসবার জায়গা দিল। একে অপরের ভাষা না বোঝার জন্য প্রায় সময়েই উভয় পক্ষকে চুপ করে থাকতে হয়েছে। দলপতি চালের মেরয় (কাঁচা সুরা) দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা করল।

মাটির ঘড়ায় সুরা ভর্তি আর সকলের সামনে একটি করে তাল পাতার পেয়ালা। আমি লক্ষ্য করছিলাম শ্যামা বাসন্তীকে নিয়ে তার সখীদের মধ্যে বসে সুরাপান করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাসন্তী চমৎকার মানিয়ে নিয়েছে ওদের সঙ্গে। পানীয়ের সঙ্গে আগুনে ঝলসানো মাছ খুব তৃপ্তি সহকারে খেলাম। একটু একটু করে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। স্ত্রী পুরুষের দল নাচ গান নিয়ে মেতে উঠল এবার। মাদলের সঙ্গে বাঁশীর সুরে নাচ চললো অনেক রাত্রি অবধি। যদিও এদের নাচের পদ্ধতি খুবই সোজা তবুও এদের দলের মধ্যে নেমে নাচবার বাসনা হল না।

পরে শ্যামা তরুণীকে আমার গুরু করলাম। নৃত্যের সকল মুদ্রা তার কাছে আয়ত্ব করে নিলাম। এবং ওদের সুরে আমি বাঁশী বাজাতে শুরু করলাম। তরুণী শ্যামার সঙ্গে অল্প দিনেই ঘনিষ্ট হয়ে উঠলাম। যেদিন থেকে আমি ওদের সঙ্গে নাচতে সুরু করলাম। সেদিন থেকে, আমার চামড়া সাদা হলেও, আমি ওদেরই একজন হয়ে গেলাম।

তৃতীয় দিন শ্যামা আমাকে এক টুকরো কাপড় দিল পরবার জন্য। কোমরে দড়ি বেঁধে লেঙ্গুটির মত করে পরলাম সেটাকে, ওখানকার অন্যান্য পুরুষদের মত। আর কঞ্চুক ও অন্তরবাসক সব পুঁটলী বেঁধে বৌদির সামনে গিয়ে হাজির হলাম। আমার চেহারা দেখে বাসন্তী বৌদি হো হো করে হেসে ফেলল। কিন্তু তার চোখে মুখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল। আমি একশত দীনার ভর্তি থলিটা

তার হাতে দিয়ে বললাম—তোমার সমস্যার সমাধান আমি পরে করছি বৌদি। আগে এই দীনারগুলিকে কোথাও মাটির নীচে পুঁতে রাখো। হয়ত কোনদিন উপকারে লাগবে। আর তোমার নিষ্কমালা (মোহর মালা) যে পরশু দিন রাত্রেই খুলে রেখেছ, সেটা খুব বুদ্ধির কাজ করেছ।

—হ্যাঁ, তোমার দাদা সমুদ্র থেকে উঠে আগেই বলেছে গহনাগুলি খুলে রাখবার জন্য। যদিও বেশীর ভাগ গহনা সব পেটিকার মধ্যেই ছিল।

—সে এতক্ষণ সমুদ্রের তলায় নাগলোকের কোন অপ্সরার হাতে গিয়ে পড়েছে।

—যা দু'একখানা পরা ছিল ওগুলি খুলতে মন চাইছিল না।

—তা বললে কি হবে 'যদ্দেশে যদাচার'। গহনা যেমন রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, তেমনি কখনও কখনও আবার প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক গহনা থেকে মুক্তি পেয়েছ। আরও অনেক কিছু থেকে মুক্তি পেতে হবে তোমাকে।

—সে সব কি দেবর ?

—দেখতেই পাচ্ছোতো তোমার মুক্ত পুরুষ দেবরকে ?

সিংহ এতক্ষণ আমাদের কথা শুনছিল, এবার বিদ্রূপের সুরে বললো,

—অতি উত্তম। তোমার দেবরকে যদি শুক্র, বৃহস্পতি মনে কর, তাহলে ওর কথামত অঙ্গাবরণ থেকে মুক্ত হয়ে নাও। সবশেষে এই দাসকেও মুক্তপুরুষ সাজতে হবে তোমাদের দেখাদেখি।

—আমার কথা পরিহাস করে উড়িয়ে দিওনা সিংহ। এখনও কত মাস কত বৎসর এখানে আমাদের থাকতে হয় কে জানে। আশপাশের খবর যতদিন আমরা না পাচ্ছি, ততদিন এই বন্ধুদের আশ্রয় ত্যাগ করা চলে না। অতএব বৌদিকে হিতৈষীর মত কাজ করতে বুদ্ধি দেবে।

—বৌদির হিতৈষী চিরকাল দেবররাই হয়ে থাকে। চার যুগের

কবিরা দেবর বৌদির গীত গেয়ে আসছে। স্বামীর গান বাঁধতে পারেনা তারা।

—শোনো বৌদি। ভাই আমার বোকা নয়। দৃষ্টি ওর প্রখর। দূর প্রসারী। তাছাড়া তুমি ওকে আত্মসচেতন করে তুলেছো। যদি কখনও আমরা দু'চার বৎসর পরে নিজেদের সভ্য মানুষের মধ্যে ফিরে যেতে পারি, তখন লজ্জার মাথা খেয়ে নগ্নদেহে তাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে না হয়। এই কাপড় কখানা এখন তুলে রেখে দিয়ে এই অজানা দেশের নিয়ম মত নেংটি পরে থাকা লজ্জাকর নয়। কিন্তু যখন পরিচিতদের কাছে যাব তখন ঐটা বের করে সভ্য মানুষের বেশে যেতে পারবো।

—তুমি বড় ধূর্ত জয়। কটাক্ষপাত করে বললো সিংহ।

—কে ধূর্ত তা এখনি প্রমাণ করছি দাঁড়াও। আচ্ছা বৌদি তুমিই বলো তোমার এই কাপড় জামাগুলি রোজ যেমন পরছ, এমনি পরলে কতদিন চলবে ?

গম্ভীর ভাবে বাসন্তী জবাব দিল,—খুব বেশী হলে পাঁচ ছয় মাস।

—তাহলে সিংহ তোমার মনে হয় এখান থেকে আমরা কতদিনে সভ্য জগতে গিয়ে পৌঁছতে পারব ?

—তুমি জ্যোতিষী জানো ত—বলোই না কতদিন লাগবে।

—না, আমি জ্যোতিষী জানি না, তবুও অনুমান করা যায় ছ মাস বা এক বছরও লাগতে পারে। হয়ত আরও বেশী লাগতে পারে। ততদিন বৌদির শাড়ীখানার চিহ্নও থাকবে না। তখন তুমি নিজের ধর্মপত্নীকে কি পরতে দেবে ?

আমার কথায় সিংহ চুপ হয়ে গেল। বৌদিও গম্ভীর হয়ে চিন্তা করছে। আমি জানি যে ওদের উত্তর দেবার কিছু নেই। বাসন্তীর উদ্দেশ্যে আবার আমি বললাম,—আমি একথা বলছি না বৌদি, যে এখুনি তুমি ওদের মত অন্তরবাসক (লুঙ্গী) পরতে আরম্ভ করো। ধীরে ধীরে অভ্যাস কর। প্রথমে রাত্রে, তারপর স্নান করবার সময়,

এমনি করে আপনা থেকে অভ্যাস হয়ে যাবে। মোট কথা এই কাপড় চোপড়গুলি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

—তোমার যুক্তি সঙ্গত দেবর, কিন্তু·········

—আমি তা জানি বৌদি জন্মগত অভ্যাস একদিনে ত্যাগ করা যায় না, আমি স্বীকার করি। মানুষ অভ্যাসের দাস। যে অভ্যাসে গ্রহণ করা যায় সেই অভ্যাসেই ত্যাগ করা যাবে।

—কিন্তু তোমার দাদা?

—ওকে আমি আগামী কালই ঠিক করে নেবো।

—নিজের উপর এতখানি বিশ্বাস তোমার? বললো সিংহ।

—নিশ্চয়ই। এখানে তুলি ধরা ভুলে যেতে হবে। মনে রেখ আমরা আমাদের নব পরিচিত বন্ধুদের দয়ার উপর জীবিকা নির্বাহ করবো না। আতিথেয়তা দু' চারদিন চলে, বেশীদিন অতিথির সম্ভ্রম থাকে না। তাছাড়া আমাদের দীনার দিয়ে এখানে কোনও কাজ হবে কিনা তাও জানবার উপায় নেই। অতএব এদের মত আমাদের কায়িক পরিশ্রম করতে হবে। লাঙ্গল, গরু বলদের ব্যবহার এরা জানে না। কোদাল চালিয়ে চাষ করতে আমাদের বড় জোর দশ বারো দিন হাতে ব্যথা হবে, কিন্তু তারপরই সব অভ্যাস হয়ে যাবে। দ্বিতীয় কাজ হল মৎস শিকার। সেটা এমন কিছু কঠিন নয়। দু' চার দিনেই আয়ত্ব হয়ে যাবে।

আমার কথা শুনে সিংহবর্মা আনন্দে আমার হাত দুখানা চেপে ধরে বাসন্তীকে বললো,—দেখেছ, এতদিন আমার ভাইয়ের আমি মিথ্যে বড়াই করিনি। এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে ওর সম্বন্ধে আমি তোমার কাছে যত প্রশংসা করেছি, তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসা পাবার ও যোগ্য।

—আহা হা, আমি যেন আমার দেবরকে চিনি না, জানি না। তোমার চেয়ে আমার দেবরের উপর বেশী অধিকার আছে।

—বেশ, যদি তাই হয় তাহলে দেবরের অনুসরণ করবার জন্যে তৈরী হয়ে নাও।

—তোমার আর উপদেশ দিতে হবে না। আমি কাল থেকে শ্যামার কাছে কিছু কিছু কাজ শিখে নিয়ে ওকে সাহায্য করব। আর কিছু না হোক, ভাত রান্না, জল আনা এ কাজতো নিশ্চয় পারবো।

—কাজের কথা ত পরে। শাড়ী কঞ্চুকী কি করবে?

—দেবর যা বলবে তাই হবে। দু' চার দিনের মধ্যেই আমি সব কিছু অভ্যাস করে নেব। কিন্তু আমার নাগরিক চিত্রকার, তুমি তোমার কথাটা বল দেখি!

—এই কথা? শোনো তাহলে, তোমার নাগরিক চিত্রকার সিংহবর্মা তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে চিরদিন একমত, এক প্রাণ। তার অমতে কোন কাজ করেনি। করবে না। দেখতে চাওতো আজই সন্ধ্যেবেলা দেখতে পাবে যে তোমার দেবর ও তার ভাই দুজনে একই বেশে সান্ধ্যমজলিসে যাচ্ছে।

* * * * * *

এমনি করে আমাদের দিনগুলি বেশ কাটতে লাগল। এক বৎসরেরও বেশী এই অজানা পল্লীতে আমরা বাস করছি। আমি কেবল দেহের গৌর বর্ণ পাল্টাতে পারিনি। নইলে আর সব দিক দিয়েই ওদের সমান হয়ে গেছি। খেতের কাজ ও শিকারে আমি ওদের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রমী। পান গোষ্টিতে ওদের সঙ্গে বসে ওদের সঙ্গে উঠতাম। নাচের আসরে আমি ছিলাম সবচেয়ে কুশলী নর্তক। রোগ, শোক, আপদে, বিপদে আমি সকলের পরমাত্মীয়। বৌদি ত রাতের পর রাত জেগে রোগীর সেবা শুশ্রূষা করে অল্পদিনেই ওদের সকলের আপন জন হয়ে গেল। শুধু যদি আমাদের শিক্ষা ও আমাদের সংস্কার ভুলতে পারতাম তাহলে সত্যই জীবন হত সুখের। কিন্তু প্রতিদিন সকালে ঘুম ভাংতেই আমার মনে পড়ত কেমন করে এখান থেকে আমরা উদ্ধার পাব। কাজের শেষে ঘন্টার পর ঘণ্টা সমুদ্র তটে ঘোরাফেরা করতাম আর সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু তখনও আমার জানা ছিল না যে

এই দ্বীপের চারিদিকে গুপ্ত এবং বিপদজনক পাহাড়ে ভর্তি এবং কোন নাবিক এখান থেকে দু' পাঁচ যোজনের মধ্যে আসতে সাহস করে না। আমি কাঠ কাটতে অনেক দূর পর্যন্ত যেতাম এবং সেখান থেকে পাহাড়ের টিলার উপর দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করতাম। কিন্তু কোন আশাই দেখতে পেতাম না। শুধু মাত্র একটা সান্ত্বনা ছিল যে আমরা ওদের গলগ্রহ হয়ে নেই বা ওদের কু-দৃষ্টিতে পড়িনি। বরং ওদের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছি। সিংহবর্মা আর বাসন্তী পতি পত্নী, সেজন্য ওদের আলাদা ঘর তৈয়ারী হল। কিন্তু আমি অবিবাহিত। পল্লীবাসীর নিয়মানুসারে অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষরা আলাদা ঘরে বাস করবে। দিন ভোর কাজের শেষে সান্ধ্য মজলিসে নাচ গান আর সুরাপান হত। ইতিমধ্যে আমি ওদের দু-চারটা গানও শিখেছিলাম। তারপর খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ করে আলাদা ঘরে শুতাম। আলাদা ঘর বলতে খুব বড় একটা ঘরের একদিকে অবিবাহিত তরুণ অন্যদিকে অবিবাহিতা তরুণীরা রাত্রি বাস করত। সাত আট বৎসর বয়স থেকে ২০।২১ বৎসরের উর্দ্ধে সকল বালক বালিকা, এবং তরুণ তরুণীদের সম্মিলিত শয়নগৃহ। ঘরের মধ্যে তরুণ তরুণীদের অবাধ মেলামেশার কোন বাধা নিষেধ নেই। বিশেষ করে ঘরের মধ্যে প্রায় সকলেই নগ্ন অবস্থায় থাকত। এই রীতির সঙ্গে পাটলিপুত্রের অন্তঃপুরের সাদৃশ্য লক্ষ্য করতাম। কিন্তু পাটলিপুত্রের অন্তঃপুরের সঙ্গে এখানকার আকাশ পাতাল প্রভেদ। সেইটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। পাটলিপুত্রের অন্তঃপুরের নরনারীরা শুধু নগ্নদেহে থেকেই ক্ষান্ত হত না; এবং সমস্ত দিনরাত্রি শুধু কামচর্চা বা তার চেয়েও বীভৎস কাণ্ড করেই পরিতৃপ্ত হতনা। যত রকম বীভৎসতা কল্পনা করা যায় শুধুমাত্র সেই চিন্তা ছাড়া আর কোনও চিন্তা নেই। আর এখানে কেউ সেসব খেয়ালই করে না। অবশ্য তার মানে এ নয় যে এখানকার তরুণ তরুণীদের আসক্তি নেই। একজন সুস্থ মানুষের ভোজনের দিকে যতখানি আগ্রহ ঠিক ততখানি আগ্রহ কাম উপভোগের দিকে।

এরা সবসময় যেমন খাওয়ার কথা চিন্তা করে না, তেমনি কাম বাসনার কথাও প্রয়োজন অনুসারেই চিন্তা করে। তার একটা যুক্তি হল এই যে, এখানকার মেয়েরা পরতন্ত্রী নয়। তাদের ইচ্ছামত প্রেমিক বেছে নেবার অধিকার আছে। তার জন্যে বাবা বা মা কেউ বাধা দেবে না। কোনও তরুণ জোর করে প্রেমী হতে পারে না। কারণ এখানকার তরুণদের কাছে প্রলোভনের সামগ্রী কিছুই নেই। না আছে প্রাসাদ, না দাস-দাসী, না আছে যান-শিবিকা বা বস্ত্র-আভূষণ প্রভৃতি যা দিয়ে তরুণীদের প্রলোভন দেখাবে। তা ছাড়া কোন তরুণী তার স্বামীর রোজগারে ভাগ বসাতে আসে না। একজন তরুণী একজন তরুণের চেয়ে কম পরিশ্রম করে না, বরং সমকক্ষ বলা যায়। অতএব তরুণের উপর তরুণীর আসক্তির একমাত্র কারণ হল স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, শক্তি এবং নৃত্য-গীতের কৌশল। এই পল্লীতে আমি এমন একজনও পুরুষ দেখিনি যার ক্ষীণ কটি, বিশাল বক্ষ, এবং বৃষভ স্কন্ধ নেই। তার উপর সান্ধ্যবৈঠকে পুরুষদের মধুর বাঁশীর সুরের সঙ্গে মাদলের তালে তালে তরুণীদের মধুর কণ্ঠের গীত মিশে গিয়ে এক কামনাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। মশালের আলোতে সুরামত্ত পুরুষগুলি যখন অদ্ভুত অঙ্গ সঞ্চালন করে নাচতে থাকে তখন তাদের বলিষ্ঠ শরীরের পেশীগুলির ওঠানামার দিকে তাকালে নারী মাত্রেরই লুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। আর স্ত্রীরাও আমাদের সভ্য দেশের স্ত্রীদের মত কমনীয়, কোমলদেহা নয়। তারাও সবল ও পুষ্ট পেশীর অধিকারিণী। সিদ্ধহস্ত যবন শিল্পীদের গড়া পাথরের শ্যামা মূর্তির মত দেখতে।

এই সম্মিলিত শয়নগৃহের মহামান্য নেতা ছিলাম আমি। পল্লীর বড় মজলিসে যখন নৃত্য-গীত বন্ধ থাকত তখন আমরা নিজেদের আস্তানায় আসর জমাতাম। নাচ-গান শেষ হলে আমি ওদের নানাপ্রকার গল্প শোনাতাম। বেশীর ভাগ কুলুপার কাছে শোনা গল্পগুলির সদ্ব্যবহার করতাম। জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা বলতাম যখন, তখন ওদের ঘুম পেত। কিন্তু যখনই অবাস্তব রাক্ষস

মাঝিমাল্লাদের লোমহর্ষক কাহিনী বলতাম তখন খুব আনন্দ সহকারে মনোযোগ দিয়ে শুনতো, ঘুমোবার জন্য আমাকে প্রায়ই জোর করতে হত। তরুণরা প্রেম এবং বীরত্বের কাহিনী শুনতে ভালবাসতো, বালকরা ভয়ের গল্প শুনতো মন দিয়ে।

একদিন আমি অরিয়ো এবং দস্কির গল্প বলছিলাম। অরিয়ো ছিল সেই দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ গায়ক। তার মধুর কণ্ঠের কাছে কোকিলের কণ্ঠস্বর ও হার মানত। তার বাঁশীর সুরে বনের পশু পক্ষীরাও মুগ্ধ হত। (অরিয়ো কিন্তু আসলে তন্ত্রীবাদক ছিল, কিন্তু এরা তাদের যন্ত্র চেনে না তাই অরিয়োকে বংশীবাদক বলেই পরিচয় দিলাম) লোকের মুখে মুখে অরিয়োর প্রশংসা ধরে না। সে খুব খুশী হয়ে একদিন রাজ দরবারে বাঁশী বাজাতে গেল। সেখানে এক তরুণী শ্রোতাদের মধ্যে বসেছিল। তাকে দেখে অরিয়োর মনের ভাবের পরিবর্তন হল। সে তখন সেই রূপসীর দিকে তাকিয়ে তন্ময় হয়ে বাজাতে লাগল আর ভাবতে লাগল ঐ তরুণী কতক্ষণে উঠে এসে তাকে বাহবা দেবে। বাজনা শেষ হলে সভার সকলে অরিয়োকে ধন্যবাদ জানিয়ে শতমুখে প্রশংসা করতে করতে চলে গেল। কিন্তু সেই তরুণী একবারও বাহবা জানালো না বা কোনও প্রকার স্বীকৃতি না দিয়েই চলে গেল। সেজন্য অরিয়ো মনে খুব আঘাত পেল। সে ভাবল যদি ঐ তরুণীর কাছে সে প্রশংসা না পেল তাহলে তার জীবন বৃথা। সেইদিন থেকে অরিয়ো স্নানাহার ছেড়ে দিয়ে দিনরাত চুপ করে ভাবতে লাগল। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তার অসুখ হল। বাঁশী বাজানো বন্ধ হয়েছে আগেই। খাওয়া দাওয়া বন্ধ। এমন কি অসুখের পথ্যাপথ্য গ্রহণেও নারাজ। অতবড় গুণী ব্যক্তির অসুখের সংবাদ শুনে গ্রামের সব লোক দেখতে এলো। অরিয়ো শুধু একবার চোখখুলে দেখে নিয়ে আবার চোখ বন্ধ করে। ক্রমশ তার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠল। এমন সময়ে কেউ সেই তরুণীকে গিয়ে বললো অরিয়োর অবস্থা। তখন তরুণীটি এলো। অরিয়ো চোখ খুলে দেখলো তার শিয়রে দাঁড়িয়ে সেই

তরুণী তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার শুষ্ক মুখে হাসি ফুটলো। প্রাণভরে দেখল সুন্দরী তরুণীকে। তারপর অরিয়ো চোখ বুজলো। সে চোখ আর কখনও খুলল না।

গল্প শেষ করে সকলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই। শ্যামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে বসে আছে যেন এখনও আমার কথা শেষ হয়নি। অবশ্য শ্যামা অবিবাহিতা বলে আমাদের ঘরেই রাত্রিবাস করতো, তাছাড়া মাত্র আট নয় মাসের মধ্যে ওদের সেই ভাষা শিখতে শ্যামা আমাকে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। কিছুক্ষণ পরে শ্যামা ম্লানমুখে বললো—মেয়েটার হৃদয়টা পাথরের তৈরী না হলে অমন করতে পারতো না।

আমি বললাম—কি করে জানবো বলো। এই কোমল শরীরের মধ্যে যেমন শক্ত হাড় থাকে, তেমনি হৃদয়ের বদলে তার হয়তো পাথর ছিল এক টুকরো।

এমনি করে দুখে সুখে দিন কাটছিল। বৌদি এখন তার প্রাণের সখী। শ্যামার মতই বেশ ভূষা পরে চলতে ফিরতে শিখে নিয়েছে। দুজনে যেন সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি। একজনকে মনে হত শ্বেত পাথরের মূর্তি আর একজনকে কালো পাথরের।

এখানে মাসের কোনও হিসেব পাওয়ার উপায় নেই। তবুও কৃষ্ণ পক্ষ বা শুক্লপক্ষ এবং আকাশের তারা দেখে অনুমান করছিলাম এটা বসন্তকাল। চারিদিকে গাছে গাছে নতুন পাতা, ফুলে ভরে উঠেছে।

সেদিন আমাদের কাঠ কাটা শেষ হয়ে গেছে। আমরা তিনজন বিশ্রামের জন্য একটা গাছের নিচে বসেছি। সিংহ হঠাৎ কি ভেবে বনফুল তুলতে গেল। আমিও খানিকটা সাহায্য করলাম ওকে। ফুল তোলা শেষ হলে সিংহ ফিরে এসে বাসন্তীকে বল্ল,—ভট্টারিকা আজ আমি তোমাকে ফুল দিয়ে সাজাবো।

বাসন্তী বৌদি ওর কথা শুনে হেসে ফেললো। আমি বাসন্তীকে বল্লাম,—এ কাজটা ও তোমার চেয়ে ভালোই পারবে বৌদি। পটের উপরে রং-তুলি দিয়ে নকল ফুল তৈরী করে যে অমন সুন্দর সাজাতে পারে, আসল ফুল দিয়ে সে নিশ্চয় তার চেয়ে ভালো সাজাতে পারবে।

—তাহলে বন ফুলে আজ শৃঙ্গার হবে?

—হ্যাঁ বনদেবী। বললো সিংহবর্মা।

—আমার ইচ্ছে হচ্ছে, বৌদির সেই বনদেবীর সাজে আমি একটা মূর্তি তৈরী করে ফেলি।

—জয়, আমারও মনে হচ্ছে বোধ হয় আমিও তুলি ধরা ভুলে যাব।

—অসম্ভব নয়। তোমার চেয়ে আমার কাজ অনেক সোজা। লোহা দিয়ে দু-চারটে ছেনী হাতুড়ী তৈরী করে নিয়েছি আর পাথরের ত অভাব নেই।

—তাহলে? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বৌদি তাকালো আমার দিকে।

—তাহলে আর কি বৌদির আদেশের অপেক্ষা। এবার সিংহবর্মা ব্যঙ্গ করলো,

—সুহ্ম নগরীতে যখন বৌদির চিত্র তৈরী করেছিলে তখন কি বৌদির আজ্ঞার অপেক্ষা করেছিলে?

—না, তখন আমার বৌদি হয়নি।

আমাদের কথায় আশ্চর্য হয়ে বাসন্তী জিজ্ঞাসা করলো,—কোন চিত্র?

—আরে সেই যে প্রথম তোমার দুখানা চিত্র তৈরী করেছিলাম, যার একটা আসল আর একটা নকল।

—হ্যাঁ।

—সেই আসল চিত্রখানি তোমার দেবর এঁকেছিলেন আর কাল্পনিক চিত্রখানি আমি।

—ও, আর তুমি দুখানি চিত্রের চিত্রকর বলে নিজেকে জাহির করেছিলে?

—হ্যাঁ, জয়ের আজ্ঞাপালন করবার জন্য।

—বুঝেছি। কিন্তু দেবর তুমি কিসের আজ্ঞা চাইছ?

—বনদেবীকে পাথরে উৎকীর্ণ করবার।

—কিন্তু আমার উজুর ভয় করছে জয়। মাঝখানে বলে উঠলো সিংহবর্মা।

—উজুর কি সিংহ?

—এই, মানে তুমি বনদেবীকে পাথর না বানিয়ে ফেল। তোমার আর কি পল্লীর মধ্যে গিয়ে বলে দেবে যে আমার বৌদি কি সব গাছের শিকড় গায়ে লাগিয়ে পাথর হয়ে গেছে। আর তারাও একবার দেখে তাই বিশ্বাস করে নেবে।

—কিন্তু আমি সশরীরে উপস্থিত থাকব যে? বললো বৌদি।

—তুমি ত ওকে চেন না। বলে দেবে এ বাসন্তী নয় অন্য কোন স্ত্রী।

—তাহলে তোমাতে আর তুমি থাকবে না।

—তা থাকব না, কিন্তু তুমি নিশ্চয় থাকবে। তুমি ত জানো না জয় তোমার এই পোষাক পরা চেহারা এমন নিখুঁত ভাবে পাথরে খোদাই করবে যে সত্যিই যদি তোমাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে তোমার অতি আপন জনকে ডেকে এনে দেখিয়ে বলে যে তুমি পাথর হয়ে গেছ, তাহলে কারও অবিশ্বাস হবে না। তাছাড়া তুমি যে মাত্র ছ মাস বা এক বৎসরের জন্য এই পোষাক ধারন করেছ, জয় তাকে চিরস্থায়ী করে রেখে দেবে পাথরের বুকে।

—বৌদি এবার আমার কথা শোনো। পাথরের মূর্তি তৈরী করা কোন দোষ বলে আমি জানি না। তাছাড়া তোমার এই সুন্দর বনদেবীর বেশ খারাপই বা কিসে? অমন সুন্দর ফুলদলে সজ্জিত ভ্রমর কৃষ্ণ চিকুর, কর্ণপুর শূণ্য অনুপম শ্রবণ, শস্কুলী সুডৌল কপোল, কম্বু কণ্ঠ, লতাবাহু···সিংহবর্মা আমার কথায় বাধা দিয়ে বললো, —বলো, অমন উন্নত শ্রীফল সদৃশ বক্ষ, ক্ষীণ-কটি, মোটা ভঙ্গ, উরু কদলী, এগুলি আর বাকী রাখছ কেন। এমনি ত বৌদির

রূপসুধা পান করে পেট ভরে না এখন পাথরের মূর্তি তৈরী করে দিনরাত তার দিকে নিজে দেখ আর অনন্তকাল ধরে দুনিয়ার লোককে দেখাও।

—তুমি চুপ করো। বললো বাসন্তী,—এতে এমন কি ক্ষতি হবে?

—না ক্ষতি কেন হতে যাবে। যদি দেবর বৌদি রাজী ত আমি কোথাকার পাজী।

—না সিংহ আমার কথা আগে শেষ করতে দাও। আমি বৌদির পাশে তোমাকেও খোদাই করব।

—বেশ আমি এক সর্তে রাজী হতে পারি, তার পাশে যদি তুমি নিজের মূর্তি খোদাই করতে পারো।

—কিন্তু আমি আমাকে দেখব কেমন করে?

—কেন জলের দিকে তাকিয়ে। মন্তব্য করে বাসন্তী।

—বেশ, বৌদির ইচ্ছা পূরণ করতে চেষ্টা করবো। কিন্তু আমরা চলে যাবার পর লোকে ভাববে যে এই বনেই বোধ হয় রামের বনবাস হয়েছিল।

এরপর মূর্তি খোদাই সুরু করলাম। সামনে বসিয়ে মূর্তি তৈরী করতে গেলে দিনের পর দিন বসিয়ে রাখতে হয়। তাতে লোক জানাজানি হবে। তাই আগে মাটির মূর্তি তৈরী করে নিলাম তারপর যখন একলা সময় পেতাম তখনই জঙ্গলে এসে খোদাই করতাম।

কিছুদিনের মধ্যে বৌদির মূর্তি শেষ করেছি, তার পাশে সিংহবর্মার মূর্তি অর্দ্ধেকটা হয়েছে। সেদিন কাজ করছি, এমন সময় দেখলাম গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে একজোড়া চোখ তাকিয়ে আছে। চোখে চোখ পড়তেই চোখ জোড়া সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সে চোখ আমার পরিচিত। ডাক দিলাম—শ্যামা!

—কি,—উত্তর এলো গাছের আড়াল থেকে। শ্যামাকে কাছে ডাকলাম আমি। আমার কাছে এসে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মূর্তির দিকে। ও কয়েকদিন থেকে উৎসুক হয়েছিল আমি রোজ কোথায় যাই। শেষ অবধি আমাকে খুঁজে বের করল।

আমি তাকে পাশে বসতে বলে প্রশ্ন করলাম,—এ কে বলতো?

—বাসন্তী দিদি। কিন্তু রং তো তেমন হয়নি।

—আমি শুধু রূপ দিতে পারি শ্যামা, রং ফলাতে পারিনা। তা যদি পারতাম তাহলে ত দেবতা হয়ে যেতাম। কিন্তু তুমি এসব কথা কাউকে বলোনি ত।

—না কাউকে বলিনি। আজ একলা মনটা কেমন করছিল তাই খুঁজে খুঁজে তোমার কাছে চলে এলাম।

—বেশ, এখন আমাকে খুঁজে পেয়েছ ত? বল এখন কি করবে।

—দেখব তুমি কেমন করে পাথর দিয়ে মানুষ তৈরী করো।

—ঠিক উল্টো। পাথর থেকে মানুষ হয়না, মানুষ থেকে পাথর তৈরী করি আমি। মানুষ মরে যাবে কিন্তু এই এই পাথর থাকবে অনন্তকাল। আচ্ছা শ্যামা, আমি যদি তোমার মূর্তি খোদাই করি তাহলে কেমন হয়?

—কিন্তু আমি যে শ্যামা।

—ঠিক কথা, আর এই পাথরও শ্যাম। তোমার মূর্তিই সবচেয়ে ভালো হবে! কিন্তু রোজ তোমাকে আসতে হবে এখানে।

শ্যামা রাজী হল এবং তারপর থেকে রোজ আবার সঙ্গে আসতো। ওর মূর্তি তৈরী করার সময় আমি একবার ওর দিকে দেখে খোদাই করতে থাকতাম আর শ্যামা সারাক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। এবার ভালো করে দেখতে পেলাম শ্যামাকে। এখন মনে হতে লাগল, এতদিন আমি ওর রূপের কিছুই লক্ষ্য করিনি। ওর চোখ দুটি তৈরী করবার সময় আমি আমার সাফল্যের আনন্দে আবেশ ভরে বলে ফেললাম,—শ্যামা, তোমার চোখ দুটি ভারি সুন্দর।

—কি জানি, আমি ত দেখতে পাইনা আমার চোখকে।

—আমি দেখতে পাই। এত সুন্দর চোখ আমি জীবনে দেখিনি। লোভ হয় চোখ দুটিতে চুম্বন করবার।

শ্যামা আমার কথা শুনে একবার যেন শিউরে উঠলো।

রোমাঞ্চিত হল ওর দেহ। তারপর ধীরে ধীরে ওর চোখ দুটি আমার মুখের কাছে এনে ধরলো। আমি চুমু খেলাম ওর চোখে। শ্যামাও আমার চোখে চুম্বন করে বললো—জয়, তুমি কত সুন্দর। কতদিন থেকে আমি তোমাকে মনে মনে কামনা করছি। আজ আমার জনম সার্থক হল।

—কিন্তু কখনও তুমি বলোনি সেকথা।

—আমাদের জাতির নিয়ম ছেলেরাই প্রস্তাব করে।

—তাহলে আমার অন্যায় হয়েছে শ্যামা।

—কোন কোন পুরুষেরা আবার বলতে দ্বিধা করে।

—বেশ, আমি আর দ্বিধা করবো না।

—আমার মনে হয় জয়, এইখানে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে সারাজীবন তোমার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। কিন্তু আমি শ্যামা বলে তুমি ঘৃণা করবে না ত ?

এ কথার উত্তর আমি খুঁজে না পেয়ে শ্যামাকে নীরবে কাছে টেনে নিলাম। শ্যামা আবেগ ভরে আমাকে নিবিড় আলিঙ্গন করল—আমি বাধা দিলাম না।

এর পর সিংহবর্মা ও বৌদিকে এখানে আসতে বারণ করলাম। বলে দিলাম তাদের আর আসার দরকার নেই। তিনটি মূর্তি শেষ হয়ে গেলে আমি ডেকে পাঠাবো। কিন্তু তার মধ্যে শ্যামার সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা এত বেশী বেড়ে গেল যে বৌদির দৃষ্টি এড়াল না। একদিন বৌদি আমায় ঠাট্টা করে বললো,—দেবর, যদি আমার দেবরানীকে একবার দেখতে পেতাম, তাহলে আমি খুব খুশী হতাম।

আমি কুটিল বিস্ময়ে বললাম,—এই অজানা পল্লীতে হঠাৎ দেবরানীর খেয়াল হল কেন ?

—কারণ আমি আমার দেবরকে প্রসন্ন দেখতে চাই।

—আমাকে আবার অপ্রসন্ন দেখলে কবে ?

—অপ্রসন্ন দেখিনি কখনও। তবে আগের চেয়ে এখন একটু

বেশী প্রসন্ন দেখছি কিনা। এ বয়সে একজন সাথীর প্রয়োজন তাই বললাম।

—বেশ, কিন্তু তোমাকেই সম্বন্ধ খুঁজে বার করতে হবে। না হলে জানোত, দেবরানী আর জেঠানী'র মহাভারত?

—সে মহাভারত ত পাটলিপুত্র নয় সুহ্ম দেশের দেবরানীকে নিয়ে। আমি এমন একজনকে খুঁজে বার করেছি, যাকে আমি খুব পছন্দ করি, এবং আমার দেবর তার চেয়েও বেশী।

—তার মানে?

—মানে এবার থেকে তোমাকে বারোয়ারী কুটির ত্যাগ করে আমাদের ঘরের পাশে নিরালা একটা ঘর বানাতে হবে।

—ঘর গেরস্তি? কিন্তু বৌদি, তুমি ত জানো যে আমরা প্রবাসী। এদের আশ্রিত। এরা জাতিতে কালো হলেও কারও দাস নয় এবং কোনও মানবকে নিজেদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মানতে রাজী নয়। অতএব তারা যা করবে তার জন্য কারও মতামতের অপেক্ষা করোনা।

তার জন্য তোমার চিন্তা করতে হবে না। শ্যামার মাকে আমি রাজী করিয়েছি। তাছাড়া আমার সকল সাথী এবং গাঁয়ের সব তরুণীরা ত বিবাহ-নৃত্যে নাচবার জন্য ছটফট করছে।

—কিন্তু সমাধান কেবল স্ত্রীরা করলেই ত চলবে না।

—শ্যামার বাবা এযং গ্রামের মুখ্যবৃদ্ধ একরকম রাজীই ধরে নাও। আর রইল তরুণ মণ্ডলী। তাদের কথা ছেড়ে দাও।

—তাহলে তোমার মত কি বল?

—আমার মতে আগামী পূর্ণিমার দিন পাকা রইল।

পল্লীবাসীদের সঙ্গে গৌরবর্ণদের সম্বন্ধ এর আগে আর কখনও হয়নি। যদিও দু'একবার হয়েছে তা একমাত্র যুদ্ধ ক্ষেত্রে। তাছাড়া আমরা যে পল্লীতে এসে উঠেছি এখন থেকে গৌরবর্ণদের এলাকা বহুদূর। এমন কি সারা গ্রামের দু একজন ছাড়া গৌর মানুষ কেউ চোখে দেখেনি কখন। আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা গৌরবর্ণ

গ্রামবাসীর সম্পত্তি। সকলে মিলে চাষ-আবাদ করে, আর যার যার যেমন দরকার ভাগ করে নেয়। কারও কম পড়লে যৌথ ভাণ্ডার সর্বদা তার জন্য উন্মুক্ত আছে।

—এদের সব সুন্দর। শুধু এই অবোধ অসহায় অবস্থা পীড়াদায়ক।

*　　　*　　　*　　　*

আমরা এখানকার ভাষা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছি। এখন আমরা পল্লীবাসীদের মত সরলভাবে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও এতদিন জানতে পারলাম না আমরা কোথায় আছি। এই জায়গার নাম এরা যা বলে, সে নাম আমরা কখনও কোন গ্রন্থেও পড়িনি বা লোকমুখেও শুনিনি।

একমাত্র লোহাই অন্য স্থান থেকে এখানে আসে। কিন্তু যাদের কাছ থেকে এরা লোহা আনে তারাও শ্যামবর্ণ জাতি। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে অন্য এক কালো জাতির কাছ থেকে আনে। একবার মনে করেছিলাম যে আমি আর সিংহবর্মা দুজনে ঐ লোহার ব্যাপারীদের সঙ্গে লোহার উৎপত্তি কেন্দ্রে যাই। কিন্তু সাহস হয় নি, তিনজনে বিচ্ছিন্ন হতে। আর তিনজনে যদি একত্রে যাই তা'হলে গ্রামবাসীদের এবং বিশেষ করে শ্যামার মনে আঘাত দেওয়া হবে, হয়ত ভুল বুঝতেও পারে। কোন দিকেই পথ খুঁজে পাই না। এমনি করেই আমাদের দিন আশা নিরাশার দোলায় দুলতে থাকে।

॥ এগারো ॥

আবার নাগরিক দুনিয়ায়

কখনও কখনও পুরানো জীবন মনে পড়লে মনটা একটু খারাপ লাগত বটে কিন্তু আমাদের নতুন জীবনও বিস্বাদ নয়। সিংহবর্ম্মা আর আমি। কখনও মাছ ধরতে যাই, কখনও খেতে কাজ করি। বাসন্তী আর শ্যামা পল্লীতে থেকেই কাজ কর্ম করে। বাসন্তী গাছের ছাল দিয়ে তৈরী সুতো দিয়ে কাপড় বুনতে শিখেছে। তার মধ্যে আবার নিজের কলা কৌশল দেখাতে ছাড়ে না। নানাপ্রকার ফুল, লতা-পাতা, হংস মিথুন প্রভৃতি উৎকীর্ণ করে কাপড়কে সুদৃশ্য করে তুলছে। পল্লীর স্ত্রীরা বাসন্তীর কাছ থেকে এই সব শিল্প বিদ্যা শিখে নিচ্ছে।

কাজের শেষে আমাদের সঙ্গে অনেক তরুণ-তরুণী সমুদ্র তটে বেড়াতে যেত। কখনও বা শুধু ঘুরেই বেড়াতাম কখনও আবার বনফুল তুলে বা শঙ্খের মালা গেঁথে আপন আপন প্রেমিকাকে সাজিয়ে দিতাম। বাঁশী বাজাতাম আর আমার আশে পাশে প্রেমিক-প্রেমিকারা বসে তন্ময় হয়ে শুনতো। শ্যামা আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আবার কোনদিন গল্প বলতাম। সময়ের কোনও হিসেব নেই এখানে। এদের সরল ভাষায় কাহিনী শুনতে বড় ভালো লাগতো। সংস্কৃত বা মাগধী ভাষার চেয়ে শব্দ সম্ভার বা ধাতুর ব্যবহার অনেক কম। বাক্যের প্রয়োগ ও খুব সরল। কোন কোন তরুণ গল্পচ্ছলে তাদের জীবনের কোন বেদনাময় কাহিনী বলতো তখন অনেকের চোখে জল ভরে আসতো। তার মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো লাগতো এক মৎস শিকারীর কাহিনী।

কোন এক তরুণ সমুদ্রে মাছ ধরতে গেছে। সেদিন হঠাৎ

সমুদ্রে ঝড় উঠলো। উছলে-উপচে উঠলো সমুদ্রের জল। ঢেউয়ে ঢেউয়ে শুরু হল প্রলয় তাণ্ডব নৃত্য। তার প্রবল স্রোতের টানে তরুণের ছোট কাঠের ডিঙ্গিখানা গভীর সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল দিশেহারা হয়ে। কিন্তু তরুণ নির্ভয়ে বসে সমুদ্রের খেলা দেখছিল, তার প্রাণে এতটুকু ভয় ভাবনা নেই। সে জানে যে সে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সে তাই সমুদ্রকে সম্বোধন করে বললো—হে সমুদ্র! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না তাই নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছি। হে বায়ু দেবতা! তুমি মনে কোরনা যে তোমার কোপে পড়ে আমি ভয়ে অশ্রুপাত করবো। কিন্তু একজনের জন্যে আমার সত্যিই দুঃখ হচ্ছে, সে আমার প্রিয়তমা। বেলা শেষে জাল কাঁধে নিয়ে যখন সকলে ঘরে ফিরে যাবে তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে তাকিয়ে থাকবে। যখন দেখবে সবাই চলে গেল তার প্রিয়তম আসেনি, তখন সে ছুটে যাবে সকলের কাছে গিয়ে কেদে কেঁদে জিজ্ঞাসা করবে, ওগো তোমরা সবাই ঘরে ফিরে এলে আমার প্রিয়তমকে কোথায় রেখে এলে, সে কেন এলো না। বল না সে কোথায়? সকলে নীরবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে চলে যাবে, কেউ উত্তর দিতে পারে না। তারপর সে দৌড়ে আসবে সাগরের তীরে, বালুচরে দাঁড়িয়ে তোমার দিকে, তোমার উঁচু-নীচু ঢেউগুলির দিকে তাকিয়ে হৃদয় বিদীর্ণ করে চীৎকার করে বলবে হে সাভার! কোথায় আমার প্রিয়, কোথায় আমার প্রিয়। তার চীৎকারে তখন তুমি ও শান্তিতে ঘুমাতে পারবে না।···

কিন্তু এই সুখী জীবনেরও শেষ আছে। একদিন সন্ধ্যাবেলা চার-পাঁচজন অপরিচিত শ্যামবর্ণ লোক পল্লীতে এসে ঢুকলো। তাদের শরীরেও এদের মত ভাঙ্গের অঙ্গবাস, মাথায় নানা রংয়ের পালক। হাতে তীর ধনুক ও বর্শা। সকলে মনোযোগ দিয়ে তাদের দিকে দেখতে লাগল। শ্যামা আমার কোলের উপর মাথা রেখে শুয়েছিল। আমি ওর গালের উপর উড়ে এসে পড়া অবিন্যস্ত চুলগুলি সরিয়ে দিতে দিতে আদর করছি। শ্যামার মুখে মধুর মুচকি

হাসি। আমরা উভয়ে আমাদের ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিলাম। শ্যামা আসন্নপ্রসবা। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম মেয়ে হবে, শ্যামা বললো—না জয়! তোমার মত সুন্দর পুত্র সন্তান হবে দেখে নিও। এমন সময় কয়েকজন লোকের জোরে জোরে কথা কানে আসতে সেদিকে কাণ খাড়া করলাম। ভয়ের বিশেষ কোন কারণ দেখলাম না। কারণ এখানে ব্যস্ত হবার একমাত্র কারণ হল যুদ্ধের সংবাদ। আর মাত্র পাঁচ জন লোক নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেনি। প্রথমে যে লোকটি ছিল, তার মাথায় অনেকগুলি পালক। সে একজন গ্রামবাসীর কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করে গ্রামের মুখ্যের ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল। প্রথমে ওরা কয়েকজনে কি সব কথাবার্তা বললো, তারপর আমাদের দুজনকে ছাড়া একে একে সবাইকে ডেকে নিয়ে গেল। যদিও আজ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার কেউ করেনি তবুও আমরা আশঙ্কিত হলাম না। ওদের সকলকে যেতে দেখে আমি শুয়ে পড়লাম। শ্যামাও আমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। নানা কথা চিন্তা করতে করতে আমারও সবে তন্দ্রা এসেছে এমন সময় কার ডাক শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমার তিনজন মিত্র ইশারা করে আমাকে ঘরের বাইরে ডেকে নিল। আমরা বাইরে এসে বসলাম। ওরা নিম্নস্বরে এক নিষ্ঠুর সংবাদ শোনাল। কথাগুলি ওরা ঠিক স্পষ্ট করে বলতে পারছে না। ওদের বুক ফেটে যেন কান্না বেরিয়ে আসছে। ওদের কথার অর্থ হল,—শ্যামবর্ণ জাতিদের প্রতিনিধি হয়ে ঐ পাঁচজন লোক এসেছে। কিছুদিন হল উত্তর দিকের গৌরবর্ণ জাতিরা শ্যামবর্ণদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে। তারা ক্রমাগত কৃষ্ণবর্ণ পুরুদের হত্যা করছে, তাদের স্ত্রীপুত্রদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ঘর বাড়ী জ্বালিয়ে দিচ্ছে। সেই জন্যে উত্তর দিকের সকল শ্যামবর্ণ জাতির পক্ষ থেকে ওরা আমাদের কাছে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবার কথা বলতে এসেছে। আর ওরা খবর পেয়েছে যে আমাদের গ্রামে কিছু গৌর বর্ণ লোক বাস করছে। এখন ওরা বলে গেল যে এখুনি গৌরবর্ণদের

গ্রাম থেকে সরিয়ে দাও নইলে তারা মনে করবে যে এরা গৌরবর্ণ জাতির গুপ্তচর। তার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয় হবে।

এই কথা শুনে গ্রামের সকলে চিন্তিত হয়ে পড়েছে। এখানকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আমাদের প্রাণাধিক স্নেহ করতো। আমার বন্ধুরা অনেক কষ্টে তাদের মনের বেদনা চেপে আমাকে বললো, গ্রামে মুখ্য-বৃদ্ধ ডেকে পাঠিয়েছে। এবং শুধু শেষ কথা শোনাবার জন্যেই ডেকেছে, কারণ আমাদের এই ছোট পল্লী শ্যামবর্ণ জাতির বিরুদ্ধে গেলে মারা পড়বে।

আমি সিংহবর্মার ঘরে গিয়ে ধীরে ধীরে তাদের জাগালাম। সিংহ ও বাসন্তী আমার কথা শুনলো। আমরা বাসন্তীকে তৈরী থাকতে বলে গ্রাম্য মুখ্যের ঘরে এলাম। তখনও সেই পাঁচজন আগত শ্যামবর্ণ লোক উপস্থিত ছিল। বৃদ্ধ তাদের সর্দারের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে সর্দার বললো, তরুণ! তোমাদের সম্বন্ধে আমরা এখানে এসে সব কথাই শুনেছি এবং আমাদের বিশ্বাস হয়েছে যে তোমরা সভ্য এবং আমাদের মিত্র গৌরবর্ণের লোক। যদিও এটা অসম্ভব কথা। কারণ আমাদের ধারণা, গৌরবর্ণ শরীরে সততা থাকা অসম্ভব। তারা অপরের ধন লুঠ করে, জঙ্গল ছিনিয়ে নেয়, অপরের স্ত্রী পুত্র কেড়ে নিয়ে পশুবৃত্তি করায়। তারা মিথ্যা কথা বলে এবং দেবতাদের ভয় করে না। ওরা পাপী। ওদের পাপে সব পুণ্য ধূয়ে মুছে ওদের দেহের রং গৌরবর্ণ হয়েছে। কিন্তু তোমরা নির্দোষ। ওদের মত স্বভাবের নও। তবুও মাত্র তোমাদের তিনজনের রক্ষার জন্য এই পল্লীটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। এখানকার পল্লীবাসীর মত সমগ্র কৃষ্ণবর্ণ জাতি তোমাদের বিশ্বাস করবে না। তোমাদের শত্রু ভাববে। উত্তরদিকে তোমাদের জাতি আমাদের লক্ষ লক্ষ লোককে হত্যা করেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে শ্যামবর্ণ জাতিটাকে ধ্বংস ও নির্মূল করবে। তাহলে আমরাই বা নিশ্চিন্ত থাকি কেমন করে। পল্লীবাসীদের কাছে তোমাদের কথা সবই শুনেছি। এরা সকলেই তোমাদের জন্যে

আন্তরিক দুঃখিত। আমরাও দুঃখিত। কিন্তু আমাদের আর কোন উপায় নেই তোমাদের আশ্রয় দেবার। মিত্র হিসেবে আমরা এইটুকু করতে পারি যে, অন্যের মত তোমাদের হত্যা না করে, দক্ষিণ দিকে তোমাদের গৌরবর্ণের দেশে ফিরে যাবার অনুমতি দিতে পারি। দক্ষিণ দিকের শ্যামবর্ণের জাতিরা এখনও এই ভয়ানক সংবাদ জানেনা, তাই তোমাদের ঐ দিক দিয়ে যাওয়াই নিরাপদ। তোমরা সমুদ্রের তীর ধরে যাবে তাহলে নিশ্চয় অল্পদিনেই গৌরবর্ণের দেশে পৌঁছতে পারবে। তোমাদের সাহায্য করবার জন্য লোক প্রস্তুত আছে এরা নির্বিঘ্নে তোমাদের বিপদ পার করে দিয়ে আসবে। অতএব বন্ধু, তোমাদের স্ত্রীকে নিয়ে এখুনিই রওয়ানা হয়ে যাও।

এর চেয়ে যে মৃত্যুদণ্ড ভালো ছিল আমাদের পক্ষে। সিংহবর্মাও বিচলিত হল। কিন্তু এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। আমরা আমাদের মন কালো করতে পারি কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা যে খুশীমত আমাদের গায়ের রং আমরা কালো করতে পারি না। পারলে আজ হয়ত এত বড় বিচ্ছেদ ব্যথা নীরবে সহ্য করতে হত না। বাসন্তী রুদ্ধ নিশ্বাসে এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। আমাদের পায়ের শব্দ পেয়েই কাপড়ের পুটলিটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

আমি একবার আমার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। শ্যামা গভীর নিদ্রায় মগ্ন। চাঁদের আলো এসে পড়েছে ওর মুখের উপর। এখনও সেই তৃপ্তির হাসিটুকু লেগে রয়েছে ওর অধরে। হয়ত ও স্বপ্ন দেখছে। আমাদের সন্তানকে ঘিরে কত রঙ্গীন স্বপ্ন। শ্যামার নিশ্বাসের শব্দ আসছে আমার কানে। একবার মনে হল এগিয়ে যাই, ওকে শেষবারের মত চুম্বন করে আসি। দু-পা এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। তাহলে ও জেগে উঠবে। এবং আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য জিদ ধরবে। ওকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুজে পাবো না। সঙ্গে সঙ্গে আমিও হয়তো ভেঙ্গে পড়বো। ওর মনের বেদনা হয়ত এই পল্লীর লোকেরা বুঝবে, কিন্তু সমগ্র শ্যাম জাতি বুঝবে

কেন ? যদি আমার একার জীবনের প্রশ্ন হত তাহলে আমাদের দুটি জীবনের বলিদান স্বীকার করতে পারতাম। তা ত হবার নয়। আমার সঙ্গে আরও দুটি নিরপরাধ জীবনের দায়িত্ব রয়েছে। সিংহবর্মা আর বাসন্তী। শ্যামার দিকে তাকিয়ে আমার চোখ দুটি ঝাপসা হয়ে এলো, আর দাঁড়াতে পারছিনা। কর্তব্য ডাকছে পিছন থেকে। মনে মনে বললাম শ্যামা, প্রিয়তমা, আমাকে ভুল বুঝোনা। ইচ্ছে করে আমি তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছি না। আমৃত্যু তোমার স্মৃতি আমার বুকের মধ্যে অক্ষয় হয়ে থাকবে। আমার সন্তানের ভার তোমার উপর রইল। শেষ বিদায় বেলায় আমার মানস চুম্বন গ্রহণ করো প্রিয়ে। বিদায়, বিদায়।

একটা শুকনো তালপাতা হাতে করে আমাদের পথ-প্রদর্শক আগে আগে চলেছে। আমাদের সঙ্গে কাপড়ের পুঁটুলি ছাড়া সামান্য কিছু চাল, কিছু শুকনো মাছ, দুটো ধনুক-তীর কয়েকটি ছেনী, ও একটি বড় ছুরি।

সূর্যোদয় হতে হতে আমরা এক যোজন পথ চলে এসেছি। বুকে পাথরের ভার। চলতে হয় তাই চলেছি। এতদিনের সাথীদের বিয়োগ ব্যথায় বুকের নিচে মোচড় দিচ্ছে। কিন্তু একটি আশায় বুক বেঁধে চলেছি। আবার আমরা আমাদের পরিচিতদের সঙ্গে মিলতে পারবো, জন্মভূমিতে ফিরে যেতে পারব।

গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা। ডান দিকে ছোট বড় পাহাড় শ্রেণী দেখা যাচ্ছে। জঙ্গলে হাতী এবং বাঘের ভয়। কিন্তু শ্যামবর্ণ জাতি এসব বিপদকে জীবনের অভিন্ন অঙ্গ বলে ভাবে। এই বিস্তীর্ণ জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দশ বিশখানা কুঁড়ে ঘর সমুদ্রের বুদ্বুদের মত মনে হয়। আগুনকে ভয় না করলে হাতীর দল এসে ছারপোকার মত ওগুলো পায়ের তলায় দলে পিষে নিশ্চিহ্ন করে দিত। ওদের বুদ্ধি ও তৎপরতা না থাকলে ঐ ছোট ছোট তীর, কুঠার বা বর্শা দিয়ে জঙ্গলের

হিংস্র জানোয়ারদের কাবু করতে পারতো না। আমাদের এই দীর্ঘদিনের অভ্যাস না থাকলে এই কণ্টকাকীর্ণ বনপথে শুধু পায়ে হাঁটতে পারতাম না।

এক যাম দিন হতে হতে আমরা অন্য শ্যাম পল্লীতে গিয়ে পৌঁছলাম। পথপ্রদর্শক আমাদের নিয়ে গ্রাম জ্যেষ্ঠের কাছে গিয়ে তালপাতার ডাঁটটি তার হাতে দিয়ে আমাদের সমর্পণ করল। বৃদ্ধ মেরয় সুরা দিয়ে আমাদের অভ্যার্থনা করল এবং খেয়ে দেয়ে আবার যাত্রার কথা বললো।

এমনি করে এক পল্লী থেকে অন্য পল্লীতে যাই, আর সেখানকার পথপ্রদর্শক আমাদের আগের পল্লীতে পৌঁছে দিয়ে আসে।

পাঁচ ছয়দিন এমনি করে চলবার পর আমরা জঙ্গলের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছলাম। পথপ্রদর্শক একটা পাহাড়ের টিলার উপর উঠে দূরে আঙ্গুল দেখিয়ে বললো—ঐ মাঠের শেষ সীমানায় গৌরবর্ণদের গ্রাম। পথপ্রদর্শক বিদায় নিয়ে চলে গেল। আমি আর একবার পিছন ফিরে শ্যামপল্লীর দিকে তাকালাম। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু শ্যাম বনানী। তবুও শ্যামার দেশের সীমানা এটা, এখানেও যেন শ্যামার ছোঁয়া লেগেছে। মনে হল যেন শ্যামা নীরবে অশ্রুপূর্ণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শ্যামা যেন বলছে জয় আমাকে ফেলে যেওনা, আমি তোমার সন্তানের জননী। আমাকে সঙ্গে নাও।

বাসন্তী আমার গায়ে হাত দিয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছিল। আমি ওর বলবার আগেই বলে ফেল্লাম,—বৌদি, এবার পুটলী খোলো। এখন ঐ গ্রামে আমাদের যেতে হবে।

বাসন্তী একবার আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নিচু করে কাপড়ের পুটলি খুলে কাপড় বের করল। আমি আমার কাপড় পরলাম।

—আজ বুঝতে পারছ সেদিন আমি কেন এই কাপড়গুলি বাঁচিয়ে রাখতে বলেছিলাম? ভেবে দেখ এইগুলি না থাকলে আজ আমাদের কি দশা হত।

—কি আর হত। শিল্পির চোখে নগ্ন সৌন্দর্য ভাল লাগে তাই এতদিন আমরা থাকতে পেরেছিলাম। বললো সিংহবর্মা।

—তোমার ও কি তাই মত বৌদি ?

—যেখানেই তোমাদের মত বিরোধ, সেখানেই সর্বদা আমি দেবরের পক্ষে।

—তা হবেই তো। পতি গেল ভেসে—দেবর হল সর্বময়।

একটা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাসন্তী ভগ্ন কণ্ঠে বললে,—হ্যাঁ। দেবরের মর্মব্যথা আর কে বুঝবে ?

তারপর আমার দিকে মুখ করে বললো—ওরা কত অবোধ আর কত অসহায়।

বাসন্তীর কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে এল। চোখ দুটি ছল ছল করে এল।

আমার মতই বৌদি শ্যামাকে ভাবছে।

বার বার শ্যামার কথা মনে পড়ছে আমার। এ কদিন সে নিশ্চয় কিছু খায়নি। দিনরাত কাঁদছে। কে তাকে সান্ত্বনা দেবে, কেই বা তার মনের বেদনা অনুভব করবে। ওর পল্লীর স্বজনরা হয়ত বলছে আমরা বাইরে বেড়াতে গেছি শীগগীর ফিরে আসবো। কিন্তু শ্যামার সরল মন তা বিশ্বাস করবে না। সিংহবর্মা মৌনতা ভঙ্গ করে বললো,—জয় চলো। সামনে আমাদের অচেনা নতুন দেশ। দিন থাকতে আমাদের গ্রামে পৌঁছতে হবে।

বেলা থাকতে আমরা গ্রামে পৌঁছে গেলাম। এখানকার লোকদের বেশভূষার সঙ্গে আমাদের বেশভূষার অনেক পার্থক্য। দু-এক জনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করতে তারা যা বললো তার একবর্ণও আমরা বুঝলাম না। সিংহবর্মা বললো—আমিও বুঝতে পারছি না এদের ভাষা। তবে এদের দু-একটা শব্দ আন্ধ্র দেশীয়। এদের চোখে আমাদের দাড়ী যেন আশ্চর্য লাগছে। তবুও আমরা গ্রামের রাস্তা ধরে চলতে লাগলাম।

কিছুদূর যেতে একটা মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরে যেতে সেখানকার পূজারীর সঙ্গে দেখা হল। পূজারীকে দেখে আমার

সন্দেহ হল। যদিও তার গলায় উপবীত ছিল, কিন্তু গায়ের রং আমার শ্যামার গায়ের মত প্রায়। পূজারী আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিল। যদিও তার ভাষা শুদ্ধ মাগধী নয়, তবু সংস্কৃত এবং মাগধী ভাষার সাহায্যে তার কথার মানে বুঝতে পারলাম। এটা কলিঙ্গ দেশের কোন .একটা নগর। পিছনে যে অরণ্য আমরা ছেড়ে এলাম সেটা হল শবরদের অটবী। এখান থেকে দন্তপুর বেশীদূর নয়। আমাদের জন্য পূজারী কিছুদূরে একটা পান্থশালা দেখিয়ে দিল।

এখন মনে হচ্ছে আমরা অন্য কোনও লোক থেকে নরলোকে এসে পৌঁছলাম। এখানে আবার আমরা দেখতে পেলাম সত্যি-মিথ্যা, ছল-কপট, কৃত্রিম সৌজন্য। কুটিল রাস্তায় সাবধানে চলাফেরার জন্য পা বাড়াতে হল। আমাদের কাছে একশত দীনার রয়েছে, অতএব খরচার জন্য চিন্তা নেই। গ্রামের মধ্যে একটা বেশ বড় পন্য বিপনী রয়েছে। সেটা গ্রামবাসীদের প্রয়োজনের চেয়েও বড়। কয়েকটা দোকান শুধু লোহার জিনিষ পত্র। আমরা সেখান থেকে দুটো তরবারী, নতুন কাপড় চোপড় এবং রান্নাবান্নার কিছু জিনিষ পত্র কিনলাম।

পূজারী আমাদের খাওয়ার ভার নিল, তার জন্য উচিত পণ (পয়সা) তাকে দিলাম।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে সিংহবর্মার সঙ্গে আলোচনা করছি। দন্তপুরের নাম আমি শুনেছি। সেখানে তথাগতের দন্তধাতু রয়েছে। অতএব অনেক বৌদ্ধ বিহার বা ভিক্ষু সেখানে নিশ্চয় আছে। তাদের কাছে নানা দেশের খবর পাওয়া যাবে। সংবাদ পেয়েছি সেখানে যাওয়ার রাস্তা তেমন দুর্গম বা বিপদের ভয় নেই। প্রায় সব সময় সে রাস্তা দিয়ে যাত্রীরা যাতায়াত করে।

পূজারীর কাছে দেশ বিদেশের অনেক সংবাদ শুনলাম। এখান থেকে কলিঙ্গ দেশের রাজধানী পিষ্ঠপুর (পিঠাপুর) অনেক দূর। সেখানকার রাজা মহেন্দ্র কয়েক বৎসর আগে দেহত্যাগ করেছেন। নতুন রাজাও খুব ভালো। দেশের অধিকাংশ লোক অন্য ভাষায় কথা

বলে কিন্তু রাজকুল, ব্রাহ্মণ, এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ঘরে মাগধীর সঙ্গে অনেকটা মিল আছে এমন এক ভাষা ব্যবহার করে। সে ভাষা শুদ্ধ মাগধী নয়। অনেকটা পুরনো মাগধীর মত। 'ও ভাষায় লেখা জাতক আমি আচার্য বসুবন্ধুর কাছে পড়েছি। তাছাড়া মহাবোধীস্থ (বুদ্ধগয়া) সিংহল বিহারে ঐ ভাষায় লেখা অনেক বুদ্ধ উপদেশ দেখেছি। অতএব ওদিকে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না ভেবে নিশ্চিন্ত হলাম।

পূজারীর স্ত্রী বাসন্তীর মতই গৌরবর্ণা। ইতিমধ্যে বাসন্তীর সঙ্গে বেশ আলাপ জমে উঠেছে। অন্যান্য ব্রাহ্মণীর স্ত্রীও দুটি ভাষা জানে। বাসন্তী তাকে প্রশ্ন করলো—বোন, তোমার পতি শ্যামবর্ণ কেন? পূজারীর স্ত্রী উত্তর দিল,—উনি বলেন এখানকার রৌদ্র বড় খারাপ। পুরুদের প্রায় সময় রৌদ্দুরে ঘোরা ফেরা করতে হয় বলে গায়ের রং কালো হয়ে যায়। বাসন্তী হাসতে হাসতে সে কথা আমার কাছে বলতে আমি বল্লাম,—তোমার কি মত?

—আমার মতে, রৌদ্দুরের তাপে গায়ের রং লাল বা তামাটে হতে পারে কিন্তু গৌরবর্ণ কালো হতে পারে না।

—ঠিক বলেছো। উত্তর দেশীয় ব্রাহ্মণদের মত এও নিজের রক্তের শুদ্ধতার দাবী করে। উত্তরে শ্যামবর্ণ কম এবং গৌরবর্ণের লোক বেশী থাকে বলে সেখানে বর্ণমিশ্রন কম দেখতে পাওয়া যায়। আর এখানে শ্যামবর্ণের লোক বেশী বলে এদের রংটা বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

—কিন্তু আমাদের দেশের মত এখানেও ব্রাহ্মণরা অন্য কোন বর্ণের মধ্যে বিবাহ করে না।

—বিবাহ না করতে পারে, কিন্তু অন্যের স্ত্রী রক্ষিতা রাখতে কোন বাধা নেই এখানে।

—তাহলে তাদের সন্তানকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেওয়া চলেনা।

—হ্যাঁ পিতার বীর্যকে অস্বীকার করা যায় কিন্তু ব্রাহ্মণীদের বেলায়?

—কি ?

—ব্রাহ্মণদের ঘরে কালো দাস কর্মকর প্রভৃতির অভাব নেই। তাই অকর্মণ্য, রুগ্ন বা চরিত্রহীন ব্রাহ্মণদের উপর বিরক্ত হয়ে ব্রাহ্মণীদের কখনও কখনও ঐ দাস বা কর্মকরদের দিকে আকৃষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

—এটা স্বাভাবিক। আমি আমাদের নগরীর দু-একটা এমন ঘটনা জানি।

—তাহলে বুঝতে পারছ, এই ব্রাহ্মণও তেমনি মিশ্রিত সন্তান। এর সম্বন্ধে বড়জোর বলা যায় যে মায়ের দিক থেকে ও নিশ্চয় ব্রাহ্মণ।

আমার কাছে সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি কটু লাগতো যে এখানকার রাজাদের পক্ষ থেকে যে সব আজ্ঞাপত্র প্রচার হত, সেগুলি কলিঙ্গ ভাষা নয়। অর্থাৎ অধিকাংশ প্রজারা সে ভাষা বুঝতে পারে না। পরম ভট্টারকের তাম্রশাসন শিলালিপি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তবে তাঁর প্রজারা যে ভাষা ব্যবহার করে, তা প্রায় সংস্কৃতের কাছাকাছি। জনসাধারণ কিছু কিছু বুঝতে পারে। তবুও আবার পছন্দ হয়না। যা দশজনে বোঝে, হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তাই করা উচিত। আমাদের যৌধেয়দের দু-একজন পুরস্কৃত তাদের শিলালিপি সংস্কৃতে লিখিয়েছেন বটে কিন্তু দৈনন্দিন কাজ কারবারের বেলায় তেমন হয়নি কখনও। এখানকার লোকদের এমন ভাষা যে, তারা সংস্কৃত বা মাগধী একেবারেই বুঝতে পারে না। তবুও রাজা, সামন্ত বা ব্রাহ্মণ যারা উত্তর থেকে এখানে আসে, তারা নিজেদের ভাষা এদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে শাসন করে। পরে দন্তপুরে গিয়ে আমি দেখেছি, সেখানে অনেক শুদ্ধ কলিঙ্গভাষী পরিবার সংস্কৃত শেখার চেষ্টা করছে। এমন কি নিজেদের ছেলে মেয়েদেরও মাতৃভাষা না শিখিয়ে সংস্কৃত শেখায় জোর করে। কেউ সংস্কৃত শিখে নিজেদের কলিঙ্গ বলে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে। তারা নিজেদের কাশী, কোশল, পাঞ্চাল বা মগধ দেশীয় বলে পরিচয়

দেয়। অন্যদেশ থেকে আগত রাজার শাসন মেনে নিলে এমনিই হয়ে থাকে। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হল এই দেশের লোক। তারা সর্বদা বিদেশীদের রাজা বা শাসনকর্তা বলে মেনে নিতে ভালবাসে।

দুই দিন পথ চলবার পর আমরা দন্তপুরে পৌঁছলাম। সমুদ্রের কিনারে সুন্দর সাজানো গোছানো নগর। আমরা দন্তবিহার—সংলগ্ন একটা পান্থশালায় থাকবার ব্যবস্থা করলাম।

আমাদের তিনজনের মজার ব্যাপার হল যে, তিনজনে আমরা তিন ধর্মাবলম্বী। সিংহবর্মা এবং তার বংশাবলী ব্রাহ্মণ এবং শিবভক্ত, বাসন্তী অর্হং (জিন দেবতা) ভক্তের ঘরে জন্ম নিয়েছে, আমার কয়েক পুরুষ থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।

জাহাজ ডুবির আগে পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ ধর্মের উপর একটা পক্ষপাত ভাব ছিল, কিন্তু শবর পল্লীতে গিয়ে সে ভুল ভেঙ্গেছে। তখন আমরা বেশ বুঝতে পেরেছি যে মানব জাতির অবস্থা-ক্রম অনুসারে ধর্ম বদলাতে থাকে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন এসব ধর্ম খুব বেশীদিনের নয়। তাই যেদিন প্রথম আমি বাসন্তীকে বলেছিলাম যে মানুষ মরে জন্ম নেবার কাহিনীটা একেবারে ভিত্তিহীন। মিথ্যা। তখন বাসন্তী ভীষণ আশ্চর্য হয়েছিল আমার কথায়। যখন শবর পল্লীতে ও নিজে চোখে দেখল যে সত্যিই পরজন্ম বলে কোন কিছু নেই, ঐ সিদ্ধান্তটাকে ছোটবেলা থেকে শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রমাণ স্বরূপ দেখা যায় যে পরজন্ম বলে কোন কথা শবর জাতিরা জানে না। তারা শুধু জানে জন্ম নিলে একদিন না একদিন মরতেই হবে, আর মরতেই যদি হবে তবে কেন কাপুরুষের মত বেঁচে থাকবো। মাথা উঁচু করে স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকবো। আমি শবরদের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বাসন্তীকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—

—যদি এখন থেকে এই শ্যাম জাতির ছোট ছোট শিশুদের শিক্ষা দেওয়া যায় যে তুমি গতজন্মের কর্মফলে কালো হয়েছ এবং

গরীব হয়ে জন্মেছ অতএব এ জন্মটা গৌরবর্ণদের গোলামী করতেই হবে। সেটা তোমার অদৃষ্ট বা গতজন্মের ফল। তাহলে দেখবে দু-এক পুরুষ বাদে এরা রাজার গোলাম বনে যাবে। উচ্চজাতি বা রাজার বশ্যতা স্বীকার করে তাদের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এখন দেখ এরা রাজা কাকে বলে জানে না। যুদ্ধের কথা শুনলে তাড়াতাড়ি তীর-ধনুক বার করে নিয়ে মৃত্যুবরণ করতে ছুটে যায়।

তর্কাতর্কির চেয়ে হাতের সামনে জলজ্যান্ত প্রমান দেখে বাসন্তী সেদিন বিশ্বাস করেছিল। অথচ আমাদের তিনজনের ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হলেও তিন ধর্মই পরলোক বাদ বিশ্বাস করে এবং মানবের দাসত্ব ও মনুষ্য দ্বারা মনুষ্যের উৎপীড়নকে স্বীকৃতি দেয়।

সেদিন আমরা দন্তবিহারে দন্তধাতু দর্শন করতে গেলাম। বহু দূর দূর দেশ থেকে লোকেরা এখানে দর্শন করতে আসে। সুন্দর পাথরের তৈরী মন্দির। ভিতরে সর্বত্র চমৎকার শিল্পনৈপুণ্যের ছাপ কনিষ্ক বিহারের মত বিশাল নয় এবং অত হীরা, মনি-মুক্তাদির আড়ম্বর নেই, তবুও সাগর-সার্থবাহ শ্রেণী এই বিহারে দুই হাতে দান করে এর মহিমাকে বাড়িয়ে তুলেছে। কম করে পঞ্চাশটি স্বর্ণপ্রদীপে দিবারাত্রি ঘি'এর বাতী জ্বলছে। এক একটি প্রদীপ এত ভারী যে বেশ শক্তিশালী পুরুষ না হলে একজনের পক্ষে সেটা স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। এই সকল প্রদীপের গায়ে দাতাদের নাম ঠিকানা রয়েছে। দাতারা অনেকে দীপান্তর বাসী। সমুদ্র তীরের সাগর বণিকরাই বেশীর ভাগ দান করেছে।

দন্তধাতু একটার মধ্যে একটা নানাপ্রকার বহুমূল্য রত্ন খচিত স্বর্ণ মঞ্জুষার মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। প্রতিমাসের বিশেষ কয়েকটা দিনেই এই দন্তধাতুকে বার করে ভক্তদের দেখানো হয়। ভক্তরা তখন হাত জোড় করে ভক্তিভরে তাকিয়ে থাকে দেখবার জন্য। পুরোহিত একটা একটা করে মঞ্জুষা খুলে ভক্তদের সামনে ধরলেন। আমি দেখেই চমকে উঠলাম, কিন্তু তখন কোনও মন্তব্য প্রকাশ না

করে বাইরে এসে ক্রুদ্ধস্বরে বল্লাম,—এই সব ধার্মিকরা যে কতখানি প্রতারক তার সীমা নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য।

বাসন্তী হেসে বললো,—এ আর এমন কি নতুন কথা বললে দেবর?

—নতুন না হোক, তুমি দন্তধাতুকে দেখলে তো?

—দেখলাম ত। রত্ন-মনি খচিত বহুমূল্য মঞ্জুষার মধ্যে সুন্দর দেখাল।

—হ্যাঁ। মনি-রত্ন জড়িত সুন্দর মঞ্জুষার মধ্যে নকল জিনিষও চকমক করে। মানুষের চোখকে চমক লাগিয়ে দেয়। মুণ্ডক প্রভু যে দাঁত আমাদের দর্শন করালো, তা কখনও কোনও মানুষের দাঁত নয়।

বাসন্তী চোখ বড় বড় করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো,—দেবর, তোমার কথা শুনে তথাগতের উপর আমার একটা শ্রদ্ধাভাব জেগেছিল।

—জাগাটা ভুল নয়। তিনি তীর্থঙ্করের মত নিজেকে সর্ব-দর্শন, সর্বজ্ঞ বলে ভাবতেন না। কিন্তু এসব হল ধর্মের ব্যাপারীদের কূট বানিজ্য। হাতীর দাঁত অথবা অন্য কোন হাড় দিয়ে তৈরী ঐ দাঁত। তাও এমন আনাড়ী শিল্পীর তৈরী যে দাঁতের মাপ বা আকৃতি সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞানই নেই। বুদ্ধি করে যদি কোন চতুর শিল্পীকে দিয়ে নকল করাতো তাহলে সত্যিকারের ক্ষয় ক্ষীণ দাঁতের নকল করতে পারতো। অতবড় দাঁত কোনও মানুষের হতে পারে না।

—এবার বুঝতে পেরেছি দেবর। বাড়ী থাকতে শুনতাম যে বুদ্ধ দর্শন সম্যক দর্শন নয়। বুদ্ধের রাস্তা পুণ্যের রাস্তা নয়। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে আমার অন্যরকম ধারণা ছিল। কিন্তু তোমার আলোচনা শুনে আমার ধারণা বদলে গিয়েছিল এবং আজ খুব ভক্তিভরে দন্তধাতু দর্শন করেছি এবং বন্দনা করেছি। এখন এই কথা বলে আমার সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করলে তুমি।

দন্তপুরে আমরা বেশ কিছুদিন থেকে গেলাম। সিংহবর্মা নতুন রং, তুলি ও পট কিনে রাখল। আমিও ছেনি-হাতুড়ী জোগাড় করে রাখলাম, কিন্তু কাজ আরম্ভ করিনি। কারণ কাজের অত তাড়া নেই। আরও কিছুদিন বিশ্রাম করবো মনে করেছিলাম।

একদিন সন্ধ্যাবেলা সমুদ্রতট থেকে বেড়িয়ে ফিরছি। রাস্তার পাশে একটা ঘর থেকে বীণার মধুর স্বর কানে এলো। সুরের ঝঙ্কার আমার গতি থামিয়ে দিল। একপাশে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলাম। হঠাৎ নারী কণ্ঠের ডাক শুনে চমক ভাঙলো। তাকিয়ে দেখি অপরূপ সুন্দরী এক নারী আমাকেই বলছে—আর্য, এখানে কষ্ট করে না দাঁড়িয়ে ভিতরে এসে বীণাবাদন শুনে আমাকে কৃতার্থ করুন।

লোভ সামলাতে না পেরে তার পিছনে পিছনে ভিতরে গেলাম। আগে আগে ঘৃতপ্রদীপ দেখিয়ে নারী আমাকে অন্দরমহলে একটি কামরাতে নিয়ে গেল। সমস্ত ঘরটা জুড়ে মোটা তুলোর বিছানা, তার উপর তিনটি বড় বড় উপাধান। এককোণে পিতলের দীপ-যষ্টির উপর পঞ্চমুখ প্রদীপ জ্বলছে। পাশে ধূপদান থেকে সুগন্ধী ধোঁয়া উঠছে ধীরে ধীরে। একপাশে একটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এক তরুণী বসেছিল। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে ছন্দময় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বন্দনা করে বললো,—আর্য, আস্থতাম।

আমি বসলাম। তরুণীর পরিচয় জানবার আগ্রহ আমার নেই। খুব সুন্দরী না হলেও কুরূপা বলা যায় না। দেহে অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। কণ্ঠে একটি সরু সুবর্ণ-সূত্র, কানে ছোট আকারের কর্ণপূর, হাতে সরু কঙ্কন দুগাছি আর বেণীতে দুচারটি ফুল। বয়স আন্দাজ কুড়ি বাইশ হবে। আমি প্রত্যুত্তরে শুধু বললাম,—ভদ্রে! আপনার বীণার সুমধুর ঝঙ্কার আমাকে আপনার দ্বারে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। বহুদিন পরে এমন সুন্দর বীণাবাদন শুনলাম। পাটলিপুত্র ছেড়ে আসার পর এমন আলাপ শুনিনি।

—আর্য কি পাটলিপুত্র নিবাসী ?

—এককালে ছিলাম। এখন শুকনো পাতার মত উড়ে উড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে ফিরছি।

—এই বীণার আলাপ আমি পাটলিপুত্র থেকেই শিখেছিলাম। পিষ্টপুরের কুমারের পরিচারিকা হয়ে আমি গিয়েছিলাম। সঙ্গীতেয় প্রতি অনুরাগ দেখেই তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন।

কথার মাঝেই তরুণীর কণ্ঠ বাষ্পার্দ্র হয়ে এল। চোখ দুটি ছলছল করে এল।

তাকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখে আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, —ভদ্রে! আমার মনে হয় আপনার মনে কোন ব্যথা জমা হয়ে আছে। আমি অকারণ আপনাকে কষ্ট দিলাম।

—এ আমার ভাগ্যের দান। সারাজীবন ভোগ করতে হবে আর্য। বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর রাজকুমারই ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারী। কিন্তু রাজবংশের চিরকালের বিধি। পিতার মৃত্যুর পর অধিকার নিয়ে ভাইয়ে ভাইয়ে রক্তপাত হবেই। পিষ্টক-পুরেও তার ব্যতিক্রম হলনা। সেই অধিকারের সংগ্রামে রাজকুমার প্রাণবলি দিল আর আমিও ঝড়ের দাপটে পাতার মত দিশাহারা হয়ে বেড়াচ্ছি। এখন আর দুঃখের কথা বলে আপনাকে কষ্ট দেবনা। যদি কখনও সময় হয় জানাবো তখন সব কথা। আপাততঃ একমাত্র সঙ্গীত ভিন্ন আপনার আতিথ্য আরাধন করবার আর আমার কিছুই নেই।

—সর্ব চেয়ে প্রিয়বস্তু আমার। আমি তাতেই খুশি হবো।

তরুণী বীণার সুরে কণ্ঠ মিলিয়ে গান গাইল। মানব ইতিহাসে কত করুণ ঘটনাই না নিত্য মানুষের জীবনে ঘটছে। আর সেই সব কাহিনী দরদী কবি অন্তরের আবেগ দিয়ে গেঁথে রেখেছেন শিল্পীদের জন্য। তরুণীর গীতটিও তেমনি বেদনাভরা এক করুণ উচ্ছাস। আমার এত ভাল লাগলো যে মনে হল এই ধরণের ব্যথার গান গাইবার জন্যেই যেন ঈশ্বর ওর কণ্ঠকে সৃষ্টি করেছেন বিশেষ

করে। গীত শেষ হলে তরুণী আমাকে প্রশংসা করবার অবসর না দিয়েই বললো,—আর্য! মনে হচ্ছে আপনিও সঙ্গীতজ্ঞ। যদি আমার ধারণা ভুল না হয় তাহলে আপনিও আমাকে ধন্য করুন। বহুদিন আমি পাটলিপুত্রের সঙ্গীত শুনিনি।

শবর পল্লী থেকে বেশীদিন হয়নি আমরা এখানে এসেছি। যার জন্যে পুরোপুরিভাবে কৃত্রিম শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে পারলাম না। অতএব সরলভাবেই বললাম,—সঙ্গীতপ্রেমকে জীবনে কখনও অস্বীকার করতে পারব না। কিন্তু বহুদিন হল সঙ্গীত ছেড়ে দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবুও একটা দ্বিপদী শোনাব আপনাকে। ভুলচুক হওয়া অসম্ভব নয়।

এই কথা বলে আমি বীণা হাতে নিয়ে বসন্ত রাগের একটি দ্বিপদী গীত ধরলাম। সমাগমেই আনন্দলাভ হয়, কিন্তু বিরহ সঙ্গীতে যত তাড়াতাড়ি মানুষের মনকে জয় করে নেয়, সমাগম সঙ্গীতে ততটা হয়না। বিরহ সঙ্গীত যত বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় ততই মধুর লাগে। চিরবিরহী অনন্তবিরহীর প্রতি শ্রোতাদের সহানুভূতি ও অনন্ত হয়। গান গাইতে গাইতে আমি লক্ষ্য করছিলাম আমার বিরহ সঙ্গীত শুনে তরুণীর চোখ বাষ্পাকূল হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত অশ্রু আর বাধা মানল না।

গান শেষ হলে তরুণী আমাকে প্রণাম করে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বললো,—আর্য! ফলভারে বৃক্ষ নত হয়, তেমনি মহাপুরুষরা নিজের মহত্ব প্রকাশ করতে চান না সহজে। কিছুক্ষণ আগে যখন দাসী এসে সংবাদ দিল যে একজন পুরুষ বাইরে দেয়ালে হেলান দিয়ে তন্ময় হয়ে গান শুনছে, তখন আমি উপেক্ষা করতে পারিনি। কে জানে রাস্তার অগুনতি চলমান লোকের মধ্যে কার কি গুণ আছে। আপনাকে দেখেই বুঝেছিলাম আপনি সঙ্গীতপ্রেমী। অতএব আপনার সম্ভ্রান্ত মুখমণ্ডল এবং সাধারণ বেশ দেখে আমার ভক্তি হয়েছিল গুণী বলে, কিন্তু আপনি যে এতবড় গুণী তা আমি বুঝতে পারিনি।

—দেবি, যদি বলি আপনি অযোগ্যের শিরে প্রশংসা পুষ্প বর্ষণ করছেন, তাহলে আপনার বিশ্বাসের উপর আঘাত করা হবে। বীণা এবং সঙ্গীতের উপর শিশুকাল থেকে আমার অনুরাগ। সেটা সৌখিন নেশা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কিন্তু তুমি নিশ্চয় জানো পাটলিপুত্রে স্বর-শিল্পী কাকে বলে, তারপর গুণী শিল্পীর ত কথাই নেই।

তরুণী আমার সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে চাইলো, কিন্তু আমি শুধু বললাম, আমরা তিনজন দন্তধাতু দর্শন করতে এসেছি, এবং দন্তবিহারের পাশেই এক পান্থশালায় অবস্থান করছি। সিংহবর্মার পরিচয় এক তরুণ চিত্রকার এবং আমার ভাই বলেই দিলাম। বিদায় নেবার সময় তরুণী নম্রভাবে বললে,—আর্য! জানিনা তেমন সৌভাগ্য আমার হবে কি না যে আপনার আবার সাক্ষাৎ পাব। তবে যদি বিধেয় মনে করেন তাহলে নিজের ঘরের মতই আবার পদধূলি দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, আমি ততখানি হৃদয়হীনা নই যে নিষ্কলঙ্ক চাঁদকে জেনে শুনে কলঙ্কিত করবো। আগেই বলেছি যে আমি শুকনো পাতার মত একান্ত অসহায়। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অনিচ্ছাসত্ত্বেও রূপজীবিনীর পেশা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছি। তাই আপনাকে দর্শন দেবার কথা বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি। আমি নিজেই আপনার কাছে গিয়ে দর্শন করে আসতাম, কিন্তু সে অধিকারও আমার নেই।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম কিন্তু তরুণীর কথা শুনে আবার বসলাম। তরুণী একটু দূরে সরে দাঁড়ালো। ওর চেহারায় কেমন একটা উদাস ভাব।

—ভদ্রে! আমি কাউকে কলঙ্কিত বা অপরাধী ভাবি না। তোমাদের এই অবস্থার সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই। তুমি প্রথমেই আমার মুখের কথা শুষ্কপত্রের সঙ্গে নিজের অবস্থার তুলনা করেছ। তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যকার শুষ্কপত্রের সঙ্গে স্ত্রীদের তুলনা চলে।

—কুমার জীবিত থাকতে এসব আমি বুঝতে পারিনি আর্য,

তিনি রাজকুমার ছিলেন। রাজকুলের সঙ্গে আমাকে পরিচিত হবার সুযোগ দিয়েছিলেন। ভট্টারিকার অপার স্নেহের পাত্র ছিলেন কুমার। তাই কুমারের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে ভট্টারিকা প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন। আমি মনে করেছিলাম রাজপরিবারের কোথাও না কোথাও একটা আশ্রয় পাব। কিন্তু কুমারেব মৃত্যুর পর কেউ আমাকে বিশ্বাস করে রাজপরিবারে স্থান দিল না। আমার সামনে বিস্তীর্ণ পৃথিবী। কিন্তু সে পৃথিবী শূন্য। আমি যদি রাজকূলের সৌখিন রীতি রেওয়াজ না শিখতাম এবং ঈশ্বর যদি কোমল শরীরের মনকে এত উঁচু করে না গড়তেন তাহলে হয়ত কোনও সাধারণ ঘরে পরিচারিকার কাজ করে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম। যদিও রাজান্তপুরে পরিচারিকাদের কোন মান অপমানের বালাই নেই তবুও আমি মধ্যবিত্ত ঘরের অপমান সহ্য করতে রাজী ছিলাম। রাজকুমারের মৃত্যুর পর একদিন রাজোদ্যানে বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবছি, এমন সময় এক ভদ্রবেশী তরুণ নাগরিক আমার কাছে এলো। তাকে দেখলে অমায়িক সজ্জন বলেই মনে হয় এবং আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ভাবলাম। আমার পাশে বসে আমার দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করে নানাপ্রকার মিষ্টি কথা বলতে লাগলো। তখন বুঝতে পারিনি যে সেগুলি তার মনের কথা নয়। কথায় কথায় সেই তরুণ আমাকে বললো—যদি তুমি কিছু মনে না করো তাহলে যতদিন তোমার অন্য কোনও প্রবন্ধ না হয় ততদিন আমার বাড়ীতে থাকতে পারো। তার কথায় বিশ্বাস করে আমি তার আশ্রয়ে গেলাম। পিষ্টপুরের বাইরে তার এক উদ্যানবাড়ীতে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিল। কৃতজ্ঞতা বশে মধ্যে মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করে আমি তার সেবা করতাম। কিছুদিন পর সে আমার কাছে প্রেম নিবেদন করলো। আমিও মনে করলাম যে বিপদের সময় যে আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, সে যদি সত্যিই আমার সারাজীবনের ভার গ্রহণ করে তাহলে আমাকে আর কারুর কাছে মাথা নত করতে হবে না। আমি রাজী হলাম। কিন্তু

যেদিন আমি তার কাছে আমার সতীত্ব অর্পণ করলাম, তার পরদিন থেকে তার ব্যবহার বদলে গেল। সে মনে করল আমি তার গলগ্রহ তার ক্রীতদাসী। অতএব যা খুশি তাই করতে পারে। প্রথমে কুশ্রী ভাষায় গালিগালাজ কটুবচন, তারপর কারণে অকারণে আমাকে মারধর আরম্ভ করল। এমনি করে আমার জীবনটাকে অতিষ্ঠ করে তুললো। আমি পালিয়ে আসার উপায় খুজছিলাম এবং একদিন তারই এক বন্ধু আমাকে সাহায্য করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে নিয়ে এলো। এখানে এসে সেও আমার অসহায়তার সুযোগ নিল এবং তার বন্ধুর মতই ব্যবহার করতে লাগল। তখন নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার সঙ্কল্প করলাম। এমন সময় এক গণিকার সঙ্গে পরিচয় হলো। সে আমার দুর্দশার কথা শুনে বললে—অবলা অসহায়া নির্যাতিতা নারীর এই একমাত্র রাস্তা। এ রাস্তার শেষে পরলোকে কি আছে জানি না, তবে ইহলোকের এই সংসার নরক থেকে খানিকটা পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

সেই থেকে আমি দন্তপুরের রূপজীবা মধুমতী।

মধুমতী তার জীবন কাহিনী শেষ করে মাথা নত করে বসলো। আমি ভাবছিলাম, ও হয়ত ওর এই পরিণতির জন্য নিজেকে দায়ী ভাবছে। কিন্তু আমি আজকের সমাজকে জানি। একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে একজন অবলা নারী কতখানি শক্তির পরিচয় দিতে পারে। সে অবস্থায় মধুমতীর আত্মহত্যা ভিন্ন অন্য কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আত্মহত্যা সে করতে পারেনি। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন আত্মহত্যা মহাপাপ। তার এই পরিণতির পিছনে যে কারণগুলি রয়েছে তা জেনে শুনে মনের মধ্যে মধুমতীর প্রতি বিরূপ ভাব আনতে পারলাম না। গণিকা নিম্নস্তরের প্রাণী বলে সমাজে পরিচিত, কিন্তু কেন তারা এই বৃত্তি গ্রহণ করে তা একবারও কেউ ভেবে দেখা দরকার মনে করে না। আজ মধুমতীর কাহিনী আমাকে একটা নতুন চেতনা দিল।

মধুমতী হয়তো আমার কাছে একটা উত্তরের প্রত্যাশা করছিল।

রাত্রি অধিক হওয়ায় আর সময় নষ্ট না করে উঠে দাঁড়িয়ে মধুমতীকে বললাম,—ভদ্রে! আমি মানব পুজারী কলাপ্রেমী। মানুষকে আমি ঘৃণা করি না। তোমার দুঃখময় কাহিনী শুনে আমি মর্মাহত। দন্তপুরে বেশীদিন থাকবার জন্য আমরা আসিনি, তবুও কথা দিচ্ছি যে কয়দিন এখানে আছি তোমার কাছে আসতে দ্বিধা করব না।

মধুমতী দরজা পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়ে প্রণাম করল। আমি ফিরে। এসেই সিংহকে আর বৌদিকে সব কথা বললাম। আজকের নারী কত অসহায়, কত পরাধীন। কিন্তু শবর পল্লীতে কি এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাবে? একটিও না।

তারপর যে কদিন আমি দন্তপুরে ছিলাম প্রায় রোজই মধুমতীর কাছে যেতাম। ওর কাছে যতক্ষণ থাকতাম ওর গান শুনতাম, আর ওকে শোনাতাম।

॥ বারো ॥

কাঞ্চী-তে

দন্তপুর থেকে বিদায় নেবার সময় মধুমতীর জন্য ব্যথা অনুভব করলাম। মধুমতী গণিকাবৃত্তির জন্য জন্মায়নি, তাই বোধহয় সে বৃত্তিতে নাম করতে পারেনি। সে বৃত্তি করত নিজের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজন মত। তার অতিরিক্ত নয়। বাকি সময় সঙ্গীত চর্চা নিয়ে থাকতো।

এবার আমরা কলিঙ্গ দেশের রাজধানী পিষ্টপুরের দিকে রওয়ানা হলাম। যদিও প্রথমবার সমুদ্রযাত্রায় আমরা মরতে মরতে কোনও প্রকারে বেঁচে গেছি। কিন্তু তাতে আমরা কেউই ভয় পাইনি। এবারও পিষ্টপুরের যাত্রা জাহাজেই ঠিক করলাম।

ভেবেছিলাম পিষ্টপুর পৌঁছে আমাদের হয়ত খুব অসুবিধায় পড়তে হবে। এদের ভাষা জানিনা, তাছাড়া নতুন জায়গায় দু'চার দিন অসুবিধা হবেই কিন্তু শহরে এসে দেখলাম এখানে কলিঙ্গ ভাষার প্রচলন খুবই কম। মগধী ভাষাই এখানকার চলতি ভাষা। ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় পুরাণো মগধীতে কথাবার্তা বলে। আর রাজকূলের ত মাতৃভাষা এটা। এখানেও আমাদের পান্থশালায় আশ্রয় নিতে হল। এখানে ভিন্ন ভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন বিপনী-বীথি। সমগ্র মহাদ্বীপের সবরকম পণ্যদ্রব্যের বিপুল সমাবেশ দেখলাম এখানে।

এখানকার সমুদ্রের রূপ আরও ভয়ঙ্কর, কিন্তু এখানে যাতায়াতের একমাত্র সমুদ্রপথ ছাড়া আর কোন সুগম বা অল্প সময়ের রাস্তা নেই। কোথায় যবদ্বীপ আর কোথায় যবনদ্বীপ, কোথায় সিংহল আর কোথায় চীন, সূর্পার্ক আর তাম্রলিপ্ত ত ঘরের কাছেই, সকল জায়গার সকল রকম পণ্যের এমন আমদানী রপ্তানী আর কোথাও নেই।

হাজার হাজার নাবিক, বণিকের দেখা পাওয়া যায় এখানে, তাদের নানারকম ভাষা, পোষাক পরিচ্ছদ বা এক এক দেশের রীতি অনুযায়ী বিপনী বীথি সাজানো দেখবার মত। যদিও কলিঙ্গে মগধরাজের দিগ্বিজয়ের প্রভাব ততখানি দেখা যায় না কিন্তু কয়েকটা ক্ষেত্রে আবার মাগধী চাল চলন লক্ষ্যনীয়। মাগধী ভাষা ও বেশভূষাকে কলিঙ্গরা খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। মাগধী কারুশিল্প ও পাষাণ শিল্পীর খুব আদর এখানে। শৃঙ্গার ও প্রসাধনে মাগধী অনুকরন করবার মনোভাব নারীদের। বিদেশীদের সঙ্গে কেনাবেচার সময় মাগধী খারী, দ্রোণ, আঢ়ক, প্রস্থ এবং কুড়ব প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। কবিতা এবং কলাক্ষেত্রে মাগধীদের একচ্ছত্র অধিকার। মগধের কাছে কলিঙ্গ একবার সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হয়। সেই যুদ্ধে কলিঙ্গবাসী খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু মৌর্য অশোকের নির্দয়তার কাছে পরাজিত হল। এই কলিঙ্গ বিজয়ের পর চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিণত হয়েছিলেন। যুদ্ধের পরিণাম ও রক্তের নদী দেখে তার মনে প্রচণ্ড আঘাত লাগে এবং যুদ্ধের সময় তিনি যতখানি নির্দয় হয়েছিলেন, যুদ্ধের শেষে কলিঙ্গবাসীর প্রতি ততোধিক সদয় হয়েছিলেন এবং আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন তাদের ক্ষতিপূরণ করবার। আজও কলিঙ্গ দেশে বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার বিদ্যমান তার অন্যতম কারণ বোধহয় ধর্মাশোকের প্রভাব। সেই থেকে কলিঙ্গ চিরকাল মগধের বিদ্যার্থী হয়ে গৌরব অনুভব করেছে।

পিষ্টপুরে খোঁজ করলে হয়ত পাটলিপুত্রের অনেক জানা চেনা লোক পাওয়া যেত কিন্তু সে চেষ্টা করিনি, তাহলে হয়ত পরিচয় হতে হতে পরমভট্টারক এবং মহাদেবীর পরিচয়ের সূত্র বেরিয়ে পড়ত এবং লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তবুও তিন চারদিন পর সিংহবর্মার এক আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা। সিংহবর্মা কাঞ্চীর পল্লব রাজবংশের এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। কাঞ্চীর পল্লব বংশ অনেক পুরাণো হয়ে গেছে, তাই দু'তিন পুরুষ আগে পরের কারও সংবাদ আর কেউ রাখেনা। কিন্তু রাজবংশের অন্যান্য লোকদের

তাতে বিশেষ লোকসান নেই। তারা যেনতেন প্রকারে রাজসেবা পেয়ে থাকে। যেমন সেনা বিভাগে উচ্চপদ প্রভৃতি। যদিও কোন রাজবংশের পরমায়ু দু'একশো বছরের বেশী নয়। তবু তাদের পতনের পর তাদের বংশধরদের ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়নি। কারণ পরাজিত শত্রুকে কখনও ভিখারীর বেশে দেখতে চায়না কোন দুর্ধর্ষ বিজেতা। বড় জোর পরাজিত ঐ রাজাকে নিজের অধিকৃত কোন সামন্তপদ অর্থাৎ বিজেতার অধীনে কোন সম্মানজনক পদে নিযুক্ত রাখত। এমনি সংরক্ষণের অন্য আর একটা দিকও আছে। যদি কখনও সাধারণ জনতা বিজেতার বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করবার কথা চিন্তাও করে তাহলে ঐ সামন্ত রাজাকে দিয়ে সেই সকল গ্রামবাসীকে নির্বিচারে দমন করার সুবিধা হয়। সে জন্য বিজেতা বিজিতের সুখ-সমৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য বলে মনে করে। তারা ভাবে, আজ ঐ সামন্তকে আমি যদি হাতে না রাখি, তাহলে হয়ত কাল আমার চেয়েও শক্তিশালী কোন রাজা এসে আমাকে আক্রমণ করলে ঐ সামন্তকে দিয়েই সবচেয়ে বেশী উপকার হবে। সেজন্য তারা একে অপরের সঙ্গে বিবাহ-সম্বন্ধও বজায় রাখে। পিষ্টপুরের মহারাজা মহেন্দ্রর কন্যা, কাঞ্চীর বিষ্ণুগোপের কন্যা সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের রাজান্তঃপুরের শোভা বর্ধন করে আছে এখনও। ছোট ছোট রাজা ও সামন্ত রাজাদের তাদের চেয়ে বড় মহারাজাধিরাজ বা পরমভট্টারককে উপায়ন পাঠাতে যেমন রত্ন-সুবর্ণ প্রভৃতির প্রয়োজন হয়, তেমনি কন্যারত্নও উপায়নের একটি প্রধান এবং মূল্যবান অঙ্গ বলে গণ্য করা হয়। সেই জন্যে এক রাজার শত রাণী রাখাতে অনেক সুবিধা।

সামন্ত রাজাদের অবশ্য জাতি আলাদা বা রীতিনীতিও আলাদা। তারা নিজেদের মধ্যে স্বার্থের লড়াইও করে থাকে, কিন্তু সে লড়াইয়ের সীমাও নির্ধারিত। নিজের ভোগ বা স্বার্থরক্ষার বেলায় শত্রুর কাছে কৌরব ও পাণ্ডবদের মত একশত এবং পাঁচজনের নীতি অনুসরণ করে না বরং একশত পাঁচজনের নীতিই অনুসরণ করে।

পিষ্টপুরে সিংহবর্মার যে আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হল, তিনি একজন উচ্চ রাজকর্মচারী। তার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হল, তার ভগ্নী নিজের অসামান্য সৌন্দর্যের গুণে তরুণ রাজার প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তাদের আমন্ত্রণে সিংহবর্মা ও বৌদিকে যেতে হল সেই আত্মীয় বলবর্মার বাড়ীতে। তিনি ছিলেন অশ্বসেনাপতি। বাধ্য হয়ে ওদের সঙ্গে আমাকেও যেতে হল। সিংহবর্মা আমাকে তার বন্ধু এবং একজন সঙ্গীতাচার্য বলে পরিচয় দিল। অশ্বপতি বলবর্মা ও সঙ্গীত, সাহিত্য এবং অন্যান্য কলার প্রতি অনুরাগী। অবশ্য কলাপ্রেম থাকাটা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। কারণ পরমভট্টারক স্বয়ং কলাপ্রেমী। তাঁর এলাকায় যারা বাস করবে তাদের কলাপ্রেম না থাকাটা অশোভনীয়। অন্ততঃ অভিনয় করতেও হবে তাকে।

আমি লক্ষ্য করছিলাম পাটলিপুত্র ছেড়ে আসবার পর মূর্তিকার আচার্য এবং সঙ্গীতাচার্যের কাছ থেকে শেখা বিদ্যায় যতখানি উপকার হল আচার্য বসুবন্ধুর কাছ থেকে শেখা বিদ্যায় ততখানি লাভবান হতে পারলাম না। শিল্পবিদ্যা সর্বদেশীয় নগদ বিদ্যা। ভাগ্যিস পাটলিপুত্রে থাকাকালে এই বিদ্যার সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়েছিল নইলে আমাদের অনেক দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হত।

কয়েকদিনের মধ্যে সিংহবর্মা সমুদ্রে নিমজ্জমান জাহাজের একটা চমৎকার চিত্র তৈরী করে একদিন বলবর্মার সঙ্গে রাজদরবারে গিয়ে সেই চিত্রটি রাজাকে উপহার দিয়ে এলো। চিত্রটি সকলের প্রশংসা লাভ করল এবং আরও অনেক চিত্র তৈরী করবার আদেশ হল সিংহবর্মার উপর। আমি আমার পাথর কাটা বিদ্যার কথা প্রকাশ করিনি এখানে। তার চেয়ে সঙ্গীতাচার্যের পরিচয় অধিক লাভ ও সম্মানজনক।

এ যুগে সামন্ত বা শ্রেষ্ঠী সকল উচ্চকুলে কন্যাদের নৃত্য, গীত, ও বাদ্যের গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। নইলে তাদের সকল সৌন্দর্য গন্ধহীন কিংশুক পুষ্পের মতই অনাদৃত থেকে যাবে। এরই নাম কলাপ্রেম। যে কুলে কলাপ্রেম আছে তাদের প্রশংসায় অন্য

কুলের লোকেরা পঞ্চমুখ হয়ে থাকে। তাদের সম্মান, সমাদর অবিসংবাদী।

আমি নিজে শিল্পী মনোভাবাপন্ন, তাই যে কোনও শিল্পকে প্রশংসা করা আমার স্বভাব। কিন্তু এই সাধনাকে নিছক প্রশংসা পাবার জন্যে গ্রহণ করবার মনোবৃত্তিকেও আমি পছন্দ করি না। যতখানি গুণ তার নেই, তার চেয়ে সহস্রগুণে বাড়িয়ে বলাটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। অমুক শ্রেষ্ঠী বা ধনী ব্যক্তির কন্যা, ভগ্নী, বধূ, স্ত্রী প্রভৃতি এক একটি রত্ন। যেমন গানে, তেমনি নাচে, তেমনি বাদ্যে, তাদের তুলনা হয় না, অতএব ঐ বংশের কন্যাকে বধূরূপে পাওয়া সৌভাগ্যের কথা। এমনি করে শুধুমাত্র বিবাহের বাজারে দাম বাড়াবার জন্যেই মেয়েকে এই সব শিল্পকলা শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। অতএব সত্যকার গুণ না থাকলেও তাকে অভিনয় করতে হবে নইলে সুপাত্রে বিবাহ হয় না।

কয়েকদিনের পর বলবর্মার চৌদ্দ বৎসর বয়স্কা কন্যাকে সঙ্গীত শেখাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন তিনি। এর আগে অন্য শিক্ষকের কাছে সে শিক্ষালাভ করেছে, কিন্তু কন্যার আরও শেখবার আগ্রহ দেখে বলবর্মা নিজে প্রস্তাব করলেন। আমাকে সম্মত হতে হল। এই প্রথম আমি সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যাকে সঙ্গীত শেখাতে রাজী হলাম। কন্যার কণ্ঠ খুব মধুর এবং প্রতিভা আছে দেখে আমিও মন দিয়ে শেখাতে লাগলাম। কিছুদিনের মধ্যে ওর বাপ-মা জানতে পারল তাদের মেয়ের উন্নতির কথা এবং তার শিক্ষক মাগধ তরুণ বয়সে তরুণ হলেও গুণী। ছয় মাসের মধ্যে আমার শিষ্যার মারফত সমস্ত নগরীতে আমার গুণপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। বড় বড় রাজবল্লভ এবং উচ্চ পদাধিকারীদের কাছ থেকে তাদের কন্যাদের সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য আমার ডাক আসতে লাগল। প্রথম প্রথম আমি দু-এক জায়গায় সঙ্গীত শিক্ষা দেবার জন্য যেতে লাগলাম, কিন্তু ক্রমশ আমার চাহিদা এত বাড়তে লাগল যে সকলের ইচ্ছা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। অথচ কাউকে অসন্তুষ্ট করাও আমি পছন্দ

করি না। অতঃপর সিংহবর্মা ও বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে আমি একটি সঙ্গীত-শিক্ষালয় খুললাম, যেখানে একাধিক শিক্ষার্থী একসঙ্গে শিক্ষালাভ করতে পারে। অতঃপর সকলকে আমার অসুবিধা জানিয়ে সঙ্গীতালয়ের কথা বলতে খুশী হয়ে সকল অভিভাবকগণ তাদের কন্যাদের পাঠিয়ে দিলেন। ক্রমশ শিক্ষার্থীনীর সংখ্যা এমন বাড়ল যে দু-তিন মাসের মধ্যেই তিন-চার জন অধ্যাপক রাখতে হল। এই সময় বার বার মধুমতীর কথা আমার মনে হত। আজ মধুমতী থাকলে কত না উপকার হত। কিন্তু এ সমাজে মধুমতীর মত নারীর প্রবেশ নিষেধ তাও জানতাম। কয়েক মাসের মধ্যেই আমার সঙ্গীতশালার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক রাজবংশীয় কন্যাও আমার কাছে শিক্ষালাভ করতে আসতে লাগল। এবং তাদের মারফত রাজাদের কানে গিয়ে সংবাদ পৌঁছতে দেরী হল না।

একদিন মহারাজ'এর কাছ থেকে আমার ডাক এলো, ইচ্ছে না থাকলেও যেতে হল বাধ্য হয়ে। তারপর থেকে প্রায়ই আমার শিষ্যাদের নিয়ে মহারাজের সামনে নৃত্য-গীত প্রদর্শন করতে হয়েছে। একদিন মহারাজা প্রস্তাব করলেন আমার সঙ্গীত-শিক্ষালয় রাজ-সঙ্গীতভবনে তুলে নিয়ে যাবার জন্য। কারণ সেখানে আরও অধিক সংখ্যক ছাত্রীরা শিখতে পারবে। পিষ্টপুরে বাস করে এখানকার মহাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, অতএব মহারাজের ইচ্ছামত রাজ-সঙ্গীত ভবনে শিক্ষালয় তুলে নিয়ে গেলাম। এতদিন শুধু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাছ থেকেই আমার ডাক আসতো, কিন্তু রাজভবনে আসবার পর রাজ-অন্তঃপুরিকাদের অনেকে আসতে লাগলেন সঙ্গীত শিক্ষার ছল করে। ছয় মাস না যেতেই আমি আশ্চর্য হলাম শুনে আমার অনেক তরুণ শিক্ষার্থিনীর সঙ্গে মহারাজ গোপনে মেলামেশা করছেন। তখন আমার সুনামের উপর কলঙ্ক আসতে পারে ভেবে বলবর্মার কাছে সব কথা বললাম। তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্লেন 'এ অতি সাধারণ কথা'। তাছাড়া কুমারীদের মাতা-পিতা তাদের মেয়েদের রাজার

সঙ্গে মেলামেশায় অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং খুশীই হবে। আমার গুণের জন্য আমার প্রশংসা নিয়ে এখান থেকে মানে মানে সরে পড়াই মঙ্গল। শবর পল্লীতে আমি স্বাধীন প্রেম দেখেছি। সেখানে এদের মত কারুর প্রাসাদের লোভ নেই এবং অনিচ্ছায় বলাৎকারের আশঙ্কা নেই। অথচ এই শিক্ষিত সভ্য দেশে দিবারাত্র সেই ঘটনা ঘটছে। এবং সকলের চোখের সামনে। এমনি করেই মধুমতীর সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশ এবং তার জন্য দায়ী এই সমাজের প্রতিটি প্রাণী।

এমন অবস্থার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। একদিন সিংহবর্মা ও বৌদির সঙ্গে পরামর্শ করে কয়েক দিন বেড়িয়ে আসবার নাম করে আমরা পিষ্টপুর ছেড়ে পালিয়ে এলাম।

পিষ্টপুর থেকে আমরা উরগপুর যাবার জাহাজ ধরলাম। জাহাজে পল্লবদের সীমার মধ্যে পৌঁছে আমরা স্থলপথে পায়ে হেঁটে এগুতে লাগলাম। এখন ভাষার ঝামেলা নেই। সিংহবর্মা ভালো দ্রাবিড় ভাষা জানে। কাছাকাছি নগর বা গ্রামের কেউ কেউ প্রাচীন মাগধী ভাষায়ও কথা বলতে জানে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

এবার আমরা দ্রাবিড় দেশের গুড়িবল্লম নামে এক গ্রামের ভিতর দিয়ে চলেছি। শুনেছি এখানকার শিবমন্দির খুব প্রসিদ্ধ। সিংহবর্মাও শুনেছে কিন্তু কেউই আমরা দেখিনি। অতএব এদিকে যখন এসে পড়েছি তখন শিবমন্দির দর্শন করে যাব এবং সেই সঙ্গে এই মন্দিরময় দেশের মূর্তিকলার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করব।

দ্রাবিড় দেশের খুব নামকরা তীর্থ এটা। যদিও উৎসবের সময় নয় এখন, তবু নর-নারীর যথেষ্ট ভীড় এখানে। আমরা তিনজন ফুল ও মালা নিয়ে দর্শন করতে গেলাম। স্ত্রী-পুরুষ সকলে পূজা করছে। কেউ কেউ আসন লাগিয়ে বসে একদৃষ্টে মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছে, হয়ত ধ্যান করছে। কিন্তু মূর্তি কোথায়? মাত্র তিন হাত লম্বা একটি প্রস্তর খণ্ড। আমার মনে হতে লাগল কোন কুশলী শিল্পী ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তার শিল্পের দুরুপযোগ করবার জন্যেই এ কাজ করেছে। পুরুষের শিশ্ন-ইন্দ্রিয়ের হুবহু নকল করেছে

শিল্পী। লিঙ্গের পাশে আবার একটি মূর্তি তৈরী করে শিশ্ন-ইন্দ্রিয়কে আরও নগ্ন করে দেখানো হয়েছে। মূর্তি সুন্দর তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু বীভৎসতা ছাড়া আর কোন রূপ নেই। এ দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। বৌদিও এক নজর দেখে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিয়েছে। পান্থশালায় পৌঁছে আমি বললাম,—মানুষের বুদ্ধির উপর আমার আফশোষ হচ্ছে।

—ছোট বেলা থেকে এই মন্দিরের কথা শুনে মনে মনে ভাবতাম এমন পুণ্যময় তীর্থ কোন না কোনদিন নিশ্চয় দর্শন করব। আমার পরিবারের সকলে শৈব। জীবনে একবার এই তীর্থ দর্শন করাটাকে তারা পুণ্য বলে মনে করেন।

—তুমি নিশ্চয় একে পুণ্য বলে মনে করেছ।

—দেবর! আমি ঠিক বুঝতে পারছি না যে এই মূর্তিটা এখানে প্রতিষ্ঠা করবার আসল উদ্দেশ্য কি? বাসন্তী আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল।

—এতবড় মন্দির আর ঐ মূর্তি তৈরী করতে কমপক্ষে একলাখ দানার খরচ হয়েছে। লক্ষ দীনার ব্যয় করা কোনও গরীবের পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব ঐ বিশাল মন্দির হল ধনীদের অর্থ প্রাচুর্যের প্রতীক আর ঐ শিবলিঙ্গ তাদের জীবনের প্রতীক। এই সমাজের জন্য আমার দুঃখ হয় বৌদি, যখন মাতা পিতা ও কন্যা একসঙ্গে ঐ মূর্তির সামনে এসে দাঁড়াবে তখন কার মনে কি ভাবের সঞ্চার হবে তা ভাবতেও ঘৃণা বোধ হয়।

—জয়, এতদিন তুমি যখন ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনায় নানাধর্মের নানা গলদের কথা বলতে তখন আমার মনে হত তোমার দৃষ্টি একাঙ্গী। কিন্তু আজ এই মূর্তি দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ধর্ম মানুষকে ওপরে ওঠাবার জন্যে সৃষ্টি হয়নি বরং নিচেয় নামাবার জন্যেই ধর্মের প্রচার করা হয়ে থাকে। ঐ নগ্ন মূর্তির উপাসক হয়ে যদি শ্রেষ্ঠী ব্রাহ্মণবর্গ অতি নিম্নস্তরের কামুকতা প্রদর্শন না করে তাহলেই আশ্চর্যের কথা। আর ঐ লজ্জাহীন শিল্পীরও রুচির বাহবা না দিয়ে পারছিনা।

—শিল্পীর দোষ বিশেষ নেই সিংহ। সে বেতনের বিনিময়ে তার প্রভুর আজ্ঞা পালন করতে বাধ্য। অস্বীকার করলে হয়ত দণ্ডভোগের ভয় ছিল, তাই সে নির্দোষী। কিন্তু ঐ মূর্তি সপরিবারে পূজা করে যারা ব্রহ্মচর্য ও ইন্দ্রিয় নিগ্রহের উপদেশ দেয় তারা কতদূর নির্লজ্জ হতে পারে একবার ভেবে দেখত।

—শুধু নির্লজ্জ নয়, শিল্পের অপমান করছে তারা।

—তীর্থঙ্করের নগ্ন-মূর্তিগুলি আমি দেখেছি। যদিও সেগুলি আমার মনঃপুত হয়নি তবুও সেগুলিতে কামুকতার এমন নগ্ন-প্রচার বা উদ্দেশ্য নেই।

বাসন্তী এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল, তীর্থঙ্করের নাম শুনতে আমাকে উদ্দেশ করে বললো,—দেবর জয়, তোমাদের সব কথাই শুনলাম, আমরা অর্থাৎ স্ত্রীজাতি ধর্মের বিষয়ে আরও অন্ধ। তীর্থঙ্করের মূর্তিগুলি আমি বরাবর দর্শন করতে যেতাম। তোমার কথা ঠিক যে সেগুলি এত নগ্ন নয় তবুও তার দু' একটিতে শিল্পীকে পথভ্রষ্ট হতে দেখেছি। তাই আমার মনে হয় এই নির্লজ্জতার শুরু হয়েছিল সেখানে আর এখানে তার শেষ।

*　　　*　　　*

লিঙ্গালয় (গুড়িমল্লম) তীর্থ থেকে আমরা কাঞ্চী পৌঁছলাম। এইখানে সিংহবর্মার বাড়ী। সিংহবর্মার মাতা পিতা এতদিন পর পুত্রকে ফিরে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন, শুধু তাই নয় সঙ্গে পুত্রবধূকে দেখে ঘরে বাইরে খুশীর জোয়ার বয়ে গেল। বৌদি শ্বশুর শাশুড়ীর প্রাণভরা আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হল। সিংহবর্মা আমাকে পণ্ডিত, কলাকার এবং তার ধর্মভাই বলে পরিচয় দিতে আমাকেও পুত্রতুল্য আদর আপ্যায়ন করলেন তাঁরা।

সিংহবর্মা এবং বাসন্তী নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল। আমার গন্তব্যস্থল এখনও অনেক দূর। কাঞ্চী খুব পুরণো রাজধানী। বহু শত বৎসর ধরে নতুন নতুন মন্দির আর প্রাসাদ গড়ে উঠেছে এর আশেপাশে। কাঞ্চী দক্ষিণ দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী পল্লব

রাজধানী! সমগ্র দক্ষিণ পথের অন্যান্য রাজারা পল্লবরাজকে নিজেদের চক্রবর্তী বলে মান্য করে এসেছেন। যদিও বিষ্ণুগোপকে পরাজিত করে সমুদ্রগুপ্ত সে মহিমা খানিকটা কম করে দিয়েছেন, কিন্তু বর্তমানে আবার পল্লব রাজা সিংহবর্মাদের প্রতিপত্তি কলিঙ্গ থেকে দক্ষিণ সমুদ্রতট পর্যন্ত তেমনি বিস্তৃত।

কাঞ্চীকে অনায়াসে দক্ষিণের পাটলিপুত্র বলা যায়। শুধু রাজশক্তি এবং ধনবৈভবেই নয়, বিদ্যা এবং শিল্পেও কাঞ্চী পাটলিপুত্রের সমকক্ষ। দ্রাবিড় দেশে অন্যান্য জায়গায় মাগধী ভাষাভাষী লোক খুব কম দেখেছি, কিন্তু কাঞ্চীকে দেখলে মনে হয় পাটলিপুত্রের একটা খণ্ড। তবে এখানকার মাগধী আজকালকার মত নয়, আজ থেকে দু' চারশত বৎসর আগেকার ভাষা। দ্রাবিড় শ্রেণীর মানুষের গায়ের রং অধিকতর শ্যামবর্ণের হয়। কিন্তু পল্লব রাজবংশীয়রা গান্ধার এবং শকদের মত গৌরবর্ণ। সিংহবর্মাও তাই বলে, ওদের পূর্বপুরুষ শকবংশীয় ছিল। তারা বাইরের কোন দেশ থেকে অবন্তীতে এসে শক ক্ষত্রপদের কাছে চাকরী করতো। তারপর তাদের আত্মীয় সাতবাহনের দরবারে এসে বাস করতে লাগলো। যখন সাতবাহনদের রাজত্ব খণ্ড খণ্ড হয়ে যেতে লাগলো তখন পল্লব সেনাপতি কাঞ্চীতে স্বতন্ত্রতা ঘোষণা করে। সেই থেকে পল্লবজাতি স্বতন্ত্র রাজা।

যদিও কাঞ্চী আমার বাড়ীর মতই। সকল কিছুতেই সিংহবর্মার মত আমার অবাধ অধিকার ও সর্বত্র গতিবিধি ছিল। কিন্তু এখানে চিরকাল থাকবার জন্যে আমি যৌধেয়ভূমি এবং পাটলিপুত্র ছেড়ে আসিনি। আমার মনের মধ্যে সিংহল যাবার বাসনা এখনও তেমনি প্রবল হয়ে রয়েছে। এখনও সেখানে গিয়ে ভিক্ষুদের নিয়ক (বিনয়) গুলি জানবার আগ্রহ আমার এতটুকু কমেনি। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কাঞ্চী ছেড়ে যাবার প্রস্তাব করাও অসম্ভব।

এখানে আমি সঙ্গীতাচার্য বলে পরিচয় দিতে চাইনি, কারণ পিষ্টপুরের মত কাণ্ড হবার ভয় রয়েছে। মনে মনে ঠিক করলাম

মূর্তিকার শিল্পী হিসেবেই এখানে কাজ করবো। কিছুদিন পর এখানে একজন চার্বাক পণ্ডিতের সংবাদ পেয়ে তাঁর কাছে যাওয়া আসা করতে লাগলাম। চার্বাক মতাবলম্বীরা আত্মা পরমাত্মা বলে কিছু বিশ্বাস করে না। ধর্ম বা পুনর্জন্ম বলে কিছু মানে না। আমি চার্বাক দর্শন সম্বন্ধে কিছুটা শিখেছিলাম, কিন্তু কোনও চার্বাক পণ্ডিতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাত হয়নি। আচার্যের কাছে বৃহস্পতি সূত্র এবং চার্বাক দর্শনের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ দেখলাম। আজ অবধি চার্বাক-দর্শনের কথা অন্য গ্রন্থে পড়েছি, কিন্তু এখানে চার্বাকের স্বতন্ত্র গ্রন্থাবলী রয়েছে। সেগুলি প্রায় সব পড়লাম কিন্তু আমি চার্বাক পণ্ডিতের জীবন দর্শনের সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। চার্বাক পন্থীদের মতে "আমাদের এ জীবন আর কখনও ফিরে আসবে না। অতএব যত পারো খাও, পরো, আনন্দ করো। ঋণ করে ঘী খাও, মৃত্যুর পর আর কেউ তাগাদা করবে না।

যদিও পণ্ডিত মশায় আমাকে বলতেন যে এই ছিল আচার্য চার্বাক-এর মূল মত। কিন্তু এ বিষয়ে আমার সথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

চার্বাক পণ্ডিতের কাছে মিত্রভাবেই মাঝে মাঝে যাতায়াত করতাম, সেজন্য তাঁর দর্শনকে খণ্ডন করতে আমার দ্বিধাবোধ করবার কোনও কারণ ছিলনা। পৈতৃক সম্পত্তি এবং প্রচুর অর্থ ছিল তার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুরা ও নারী সর্বদা প্রস্তুত থাকতো তার ভোগ বিলাসের জন্য, অতএব জীবিকার জন্যে চিন্তা করতে হতনা। আমাকে বার বার তিনি বলতেন,—মিত্র জয়! এমন অপূর্ব যৌবন-লাভ করে তাকে ভোগ করছ না কেন? একে অকারণ নষ্ট হতে দিও না, যৌবন বসন্ত একবার চলে গেলে আর ফিরে আসেনা।

—মিত্র! আমি আপনার মত চার্বাক দর্শনের অর্থ গ্রহণ করতে পারছিনা। চার্বাক ঈশ্বরকে অস্বীকার করেছেন এইজন্য যে, মানুষ স্বয়ং নিজের ভাগ্যবিধাতা হোক। কারও হাতের খেলার পুতুল হয়ে থাকবে না। চার্বাক জীবনকে অজর অমর স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলে প্রচার করেননি এইজন্য যে মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে নতুন রূপ বদলাবার

অবসর পাওয়ার জন্য। চার্বাক পরলোক এবং পুনর্জন্মকে এইজন্যে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছেন, যে মানুষ পরলোকে যে সব কামনা করে তা এই জন্মেই অর্জন করুক, ভোগ করুক। পরলোকের কল্পনাকে এই জন্মেই সার্থক করে তুলুক।

—তাহলে তুমি বলতে চাও যে আমরা ইহলোককে স্বর্গে পরিণত করতে করতে মরে যাই, আর যা কিছু আছে তাকে ভোগ করবার অবসর না হোক।

—না। যা কিছু মজুদ রয়েছে তাকে ভোগ করতে মানা করছি না। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে ভোগ সকলের প্রচেষ্টার ফল। তাকে একা ভোগ করবার কোন অধিকার নেই। সমস্ত পৃথিবীকে ভোগবিলাসে সকল রকমে সমৃদ্ধশালী করা যায় যখন সকলে সম্মিলিত ভাবে চেষ্টা করবে। আমি যতটুকু বুদ্ধি অন্যের বপন করা ক্ষেত কেটে নিয়ে ভোগ করবার আশায় থাকা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের জীবন তখনই সুখী হবে, যখন আশেপাশের সকলে সুখী হবে। নিজেকে দিয়ে বিচার করে দেখুন, যদি আপনার পরিবারের অন্য লোকেরা অনাহারে উপবাসী থাকে তাহলে আপনি এমনি করে স্ফূর্তি করতে পারবেন? আপনার পুত্র যদি ঘোর ব্যথায় ছটফট করতে থাকে তাহলে আপনি এমনি করে খুশী মনে রঙ্গীন স্বপ্ন দেখতে পারেন?

—হাঁ মিত্র, কিছু কথা সত্যি বটে। আমার মনে হয় আচার্য চার্বাক বোধ হয় ভাবতেন যে এই জীবনে আজ এবং নিজের ভোগই জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা নিজেদের ততখানি সবল বলে ভাবতে পারিনা।

—মানুষ কখনও পাথর দিয়ে তৈরী হয়না মিত্র। তাদের হৃদয় যেমন কোমল তেমনি আদর্শও কোমল। নিরপরাধীর উপর অত্যাচার হচ্ছে দেখলে কারও মনে সমবেদনা না জেগে পারে না।

—কিন্তু আমি ত কোন চার্বাক গ্রন্থে এমনি ধরনের জীবন দর্শন লেখা দেখিনি।

—চার্বাক-দর্শন পুস্তক-দর্শন নয়। মুনি ঋষিদের নাম করে আমাদের বুদ্ধিভ্রংশ করবার একটা কৌশল মাত্র। পুস্তকরূপে যে চার্বাক দর্শন আমাদের সামনে এসেছে, এটা নিছক সামন্ত এবং শেঠদের তৈরী দর্শন।

—শেঠ সামন্তদের মধ্যে তুমি কত লোক চার্বাক পন্থী দেখেছ?

—আমার বলার উদ্দেশ্য তা নয় মিত্র। চার্বাকের নামে আপনি যে জীবন-দর্শন প্রচার করছেন সেগুলি শেঠ সামন্তদের নিজেদের ভোগ বিলাসের জন্যে তাদের তৈরী করা দর্শন। বিনা প্রতিবাদে তারা আজ অবধি এই রাস্তায় চলে আসতে পেরেছে, তাই আজ তাদের মতকেই চার্বাকের নামে চালিয়ে দিয়ে নিজেরা মহাসুখে দিন কাটাচ্ছে। যেমন, তুমি কারও তোয়াক্কা করো না, নিজের খুশী অনুযায়ী কাজ করো। তোমার খাওয়া, পরা, ভোগ বিলাসের পথে যদি মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, কেউ বাধা হয় তবে তাকে যেন-তেন প্রকারে হত্যা করে নিজের সুখ-সমৃদ্ধির পথকে কণ্টকমুক্ত করতে দ্বিধা করো না। এ ছাড়া শ্রেষ্ঠী সামন্তদের জীবনে আর কোন দর্শন আছে বলতে পারেন?

—কিন্তু তারা আমার উপদেশকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়।

—তা দেবেই, তবু তারা আপনার জীবনের অনুকরণ করে। আপনার মতকে তারা খোলাখুলিভাবে স্বীকার করতে পারে না তার কারণ চুরির মালের উপর তাদের জীবন নির্ভর করে। চোর অমাবস্যার অন্ধকারে থাকতেই ভালবাসে, পুর্ণিমার আলো অসহ্য লাগে তাদের।

—বড্ড কঠোর শব্দ প্রয়োগ করলে মিত্র।

—কিন্তু ভেবে দেখুন মিথ্যা বলিনি। এই পৃথিবীতে নরক সৃষ্টি করেছে কারা? যদি তারা নিজেরা পুরোপুরি পরলোকবাদী হতে পারত এবং পার্থিব জগতের কোনও জিনিসের লোভ না করে জল-হাওয়া এবং জঙ্গলের ফল-মুল পাতা দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো, তাহলে আজ সাধারণ জনতার জীবন এমন দুঃখময়

হত না, এত খুন খারাপী হিংসাদ্বেষ থাকত না। কিন্তু তারা শুধু পরলোকবাদী হবার উপদেশ দেয় অন্যকে। যাতে লোক তাদের চোর বলে সন্দেহ করতে না পারে। তারা অন্যের অপহরণ করে এনে প্রচার করে যে তারা পূর্বজন্মের নিজেদের রোজগার এই জন্মে ভোগ করছে, আর তোমরা পূর্বজন্মের কৃতকর্মের জন্যে এ জন্মে দুঃখভোগ করছ।

—কিন্তু মিত্র, এ অপবাদের ভাগ যে আমাকেও নিতে হচ্ছে।

—হবে বৈকি। আপনিও তাদের দলের একজন। কারণ আপনাদের সকলের জীবন দর্শন এক। প্রথম চার্বাক বিচারক ভোগ-উপার্জনকারীদের পরলোকবাদের প্রলোভন দেখিয়ে বঞ্চিত করতে দেখে, বঞ্চনাকারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর সকলে সুখে থাক। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হোক।

—তুমি কোন চার্বাক মতের কথা বলছ?

—যে চার্বাক মত কেবল বুদ্ধিকেই নিজের পথপ্রদর্শক বলে ভাবতো। ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়, চেষ্টা কখনও নিষ্ফল হয় না, এই তত্ত্বকেই সত্য বলে মানতো। আপনারা প্রথমে একরকম পুঁথিপত্র এবং ঋষি-মুনিদের গোলাম ছিলেন আর এখন আর একরকম পুঁথিপত্র আর আচার্যের গোলাম হয়ে আছেন। দুয়ের মধ্যে এতটুকু প্রভেদ নেই। আপনিও সেই তথাকথিত 'খাও দাও স্ফুর্তি করো' পথের পথিক এবং পল্লবকুমাররাও সেই পথের পথিক। এই নির্দয় জীবন যাপন করতে ঈশ্বর বা পরলোকের কোনও চিন্তা নেই। পল্লবকুমারদের কাছ থেকেও এই একই উত্তর পাবেন। অতএব আপনাদের দুজনের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। ঈশ্বর এবং পরলোকবাদ অস্বীকার করবার এই পন্থা অনুসরণ করেন বলে আপনাদের বুক গর্বে ফুলে ওঠে। আপনারা নিজেদের বড় বুদ্ধিবাদী বলে মনে করেন।

—তাহলে মিত্র তুমি কি বলতে চাও যে আমরা বুদ্ধিবাদ প্রচার করে কোনও কাজই করিনি ?

—কোনও কাজ করেছেন বা করেন নি সেটা প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন হল যা করেছেন সেটা সোজা না উল্টো।

—সোজা। ভোগবাদ এবং বুদ্ধিবাদকে মিলিয়ে আমরা পৃথিবীকে অন্ধকারে ঘুরে মরবার হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছি।

—বেশ, আপনি লিঙ্গালয় (গুড়িমল্লম) মহাতীর্থের কথা জানেন ?

—নিশ্চয়, আমি কয়েকবার দর্শন করতেও গেছি।

—দর্শন করবার জন্য না পূর্ণার্জন করবার জন্য ?

—মিত্রদের দেখাবার জন্য যে ভোগবাদই ধর্মের একমাত্র সার। ভোগ-ইন্দ্রিয়ই দেবাদিদেব মহাদেব।

—বেশ, আপনার মিত্ররা তাহলে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠার আগে একথা মানত না ?

—মানত, কিন্তু স্বীকার করত না।

—আর এখন স্বীকারের ঘোষণা করে বেড়াচ্ছে ? ঐ তীর্থ শুধু এইটুকু বলতে পারে যে পরলোকবাদ এবং পরমশক্তি কেবল ধর্মের উপমামাত্র। ভোগবাদই তার প্রধান উদ্দেশ্য। সে ভোগবাদ মানবতাসুলভ ভোগবাদ নয় পশুদের চেয়েও নিকৃষ্ট ধরনের ভোগবাদের শিক্ষা দেয় ঐ ধরনের যুক্তি। ভোগবাদ আমিও মানি, কিন্তু সে ভোগবাদ মানব হৃদয়ের অনুকুল। সে ভোগবাদ মানুষের পথ-প্রদর্শক। চুরি করে, লুকিয়ে একার ভোগবাদ নয়। সেই ভোগবাদে সারা মানবজাতি সম্মিলিত থাকবে এবং আগামী বংশধরেরাও তা থেকে বঞ্চিত হবে না।

—তুমি যা বলছ, সে রাস্তায় সারা মানবজাতি চলবে কি ?

—সারা মানবজাতি চলবে যদি পৃথিবীর আর সব চোর ঠগবাজ সকলে চলতে রাজী হয়।

—তারা ত সংখ্যায় মুষ্টিমেয়।

—সংখ্যায় তারা যত কমই হোক, তাদের বিছানো জাল অনেক

শক্ত, তাদের হাতিয়ার অনেক মজবুত। কেননা তাদেরই হাতে রাজ্যভার, তারাই অন্য সকলকে শাসন করে থাকে।

—বুঝলাম মিত্র, সবই সম্ভব, কিন্তু সে আশা অনেক দূরে, অনেক পরের কথা, আমার কাছে আমার ইহজীবনেই আজ এই মুহূর্তে এই লাল দ্রাক্ষীসুরার চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। এত কাছে আর কিছু নেই।

*   *   *   *

পিষ্টপুরের মত কাঞ্চীতেও বহু দূর দূর দেশের জন সমাগম হয়। আমি বিশেষ কিছু কাজ করি না। সিংহবর্মার বাড়ীতে দু-চার বৎসর থাকলেও তাদের কোন অসুবিধা হবে না। নিজের মনোরঞ্জনের জন্যে মূর্তি তৈরী করতাম। এখানে কোনও কল্পিত মূর্তি তৈরী করিনি। নিষ্ঠুর বাস্তবের দৃশ্য, দাস ক্রয় বিক্রয়ের নানাপ্রকার মূর্তি তৈরী করতাম। কাঞ্চী যেমন দক্ষিণাপথের সবচেয়ে বড় রাজধানী, তেমনি দাস ক্রয়-বিক্রয়ের সবচেয়ে বড় হাট।

ধনী লোকেরা বেতনভোগী কর্মচারী রেখে সন্তুষ্ট হতে পারে না, নির্দিষ্ট সময়ে বেতন না দিলে তারা কাজ করবে না। অতএব একসঙ্গে কিছু অর্থব্যয় করে গরু মহিষের মত সারাজীবনের জন্যে যদি মানুষ পাওয়া যায়, সেইটাই লাভ। অনেক দূর দূর থেকে এখানে দাস ব্যবসায়ীরা আসে। কারো চেহারা চীনদেশের লোকদের মত, কারও বা যবনদের মত, কারও মুখে লম্বা দাড়ি কারও বা একেবারে পরিষ্কার মুখ। সমুদ্রতট থেকে তারা দাস-দাসীদের এমনভাবে ঘিরে হাট অবধি নিয়ে আসতো, যেমন আমরা ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি পশুদের নিয়ে আসি। দাস বণিকদের নিজেদের বীথি ও পণ্যশালা আছে। যদিও এদের অন্য পণ্য বস্তুর মত রাস্তার উপর সাজিয়ে রাখা হয় না, কিন্তু ঘেরা খোঁয়াড়ের মধ্যে গেলেই বোঝা যায় মানবতার মূল্য কতখানি। বণিকরা তৎপরতার সঙ্গে খরিদ্দারকে ভিতরে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটি বিক্রেয় দাসদাসীর কাছে গিয়ে বাড়িয়ে বাড়িয়ে তাদের গুণাগুণ বর্ণনা করে গ্রাহকদের লুব্ধ করবার চেষ্টা করে।

দাসীর বয়স যদি চল্লিশ বৎসর হয় তাহলে জোর গলায় তাকে কুড়ি বলে চালিয়ে দেবার প্রচেষ্টাও বাধে না। বন্ধ্যাকে বলবে প্রসূতি— দুর্বলকে সবল খর্বকে দীর্ঘ। দরাদরি হবে অন্য পণ্যবস্তুর মতই। দশ দীনার দাম কষাকষির পর পাঁচ দীনারে দাঁড়াবে।

দাস নানা জাতির। নানাবর্ণের। তার মধ্যে হাবসী জাতিই বেশী, এদের সাগর পার থেকে আমদানী করা হয়। এদেশী দাসও আমি অনেক দেখেছি। এদের সন্তান সন্ততি সকলেই জন্ম দাস হয়ে থাকতে বাধ্য। কখনও বা মাতাপিতা বিক্রি করে আর কখনও রাজদণ্ডভোগী দাস হতে বাধ্য হয়। বিদেশ থেকে আগত দাসদের সম্বন্ধে আমি জানতে চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু ওদের ভাষা না বোঝবার জন্য সব কথা জানতে পারিনি। এইটুকু শুধু জানতে পেরেছিলাম যে পাখী ধরবার মত তাদের ধরা হয়। দল বেঁধে আক্রমণ করে লুঠ করে নিয়ে আসা হয় তাদের।

বড় বড় কুলে যাওয়ার উপযুক্ত দাসীদের পণ্যবীথি ভিন্ন। তাদের কেনা বেচার দেরী হয় না। আজ যে যবন দাসীকে দেখে এলাম, কাল আর তাকে দেখতে পাইনি। এরা একে ত গৌরবর্ণ তার উপর যদি দেহের সৌন্দর্য থাকে তাহলে ত কথাই নেই। সে তখুনিই রাজঅন্তপুরে চলে যাবে। এই সব দাসীদের পণ্যশালার মধ্যে মলিন শরীরে অর্ধনগ্ন হয়ে থাকতে হয়না, বরং মনি-মোতি দিয়ে তৈরী লাল চীনাংশুকে মুড়ে রাখা হয়। আর যারা কুশ্রী দেখতে তাদের অর্ধনগ্ন অবস্থায় মাটিতে ফেলে রাখা হয়। মানব শরীর নিয়ে এই বীভৎস নাটক দেখে অনেক ধর্মাত্মা বলে থাকে 'ও হল পূর্বজন্মের কর্মফল', যে একজন দাসীকে এমন সাজিয়ে গুছিয়ে যত্নে রাখা হয় তার থাকা, খাওয়া, পরার অমন সুবন্দোবস্ত, আর একজনকে নগ্নাবস্থায় ধূলোর মধ্যে ফেলে রাখা হয়। অতএব অধিক মূল্যে বিক্রী হবার আশায় ব্যবসায়ীরা তাদের পণ্যদ্রব্যকে যে সাজিয়ে রাখে যত্নে রাখে সেটাও দাসীদের পূর্বজন্মকৃত কর্মফল।

একদিন একজন মিস্ত্রি দাসের সঙ্গে আমার কথা হল। সে

বললো—শিশুকাল থেকে এক ভারতীয় বণিকের ঘরে লালন-পালন হয়েছিলাম। সমুদ্রতটে আমার গ্রামে একদিন ডাকাত পড়ল। গ্রামবাসীরা সাধ্যমত বাধা দিল কিন্তু ডাকাতরা অধিক শক্তিশালী থাকায় গ্রামবাসীরা অর্ধেকের বেশী নিহত হল, কিছু জঙ্গলের দিকে পালিয়ে গেল আর বাকী সবাই ধরা পড়ল ডাকাতদের হাতে। ডাকাতরা তাদের বেঁধে নিয়ে জাহাজে তুলে রওয়ানা হল। তারা আমাদের দাস ব্যবসায়ীদের হাতে বিক্রী করে দিয়েছিল। আমার সাথীদের মধ্যে কিছু কিছু সিংহল প্রভৃতি পথিমধ্যে বন্দর সমূহে বিক্রী হয়েছে এবং আমি এখানে বিক্রি হবার জন্যে আনীত হয়েছি।

বেচারী বিদেশীরা কেমন করেই বা বিশ্বাস করাবে যে তারা দাস নয়, তাদের জোর করে ধরে আনা হয়েছে। সন্ধ্যা হলেই দাস্গুলিকে একটা কুঠরীতে পশুর মত বন্ধ করে দেওয়া হত, কখনও খুব বেশী গরম পড়লে শিকল দিয়ে বেঁধে খোলা জায়গায় ফেলে রাখত দাস ব্যবসায়ীরা। একদিন আমি দুজন দাস ও তিনজন দাসীকে একটা শিকলে বাঁধা অবস্থায় দেখে ব্যবসায়ীর কাছে প্রার্থনা করলাম ওদের মূর্তিটা পাথরে খোদাই করব অতএব দু তিনদিন ওদের বাইরে রাখুন। দাস ব্যবসায়ীর অমতের কিছু ছিলনা। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সেই মূর্তিটি খোদাই করলাম। শিকলে বাঁধা দাস-দাসীদের একদিকে ক্রুর মুখ বণিককে এবং গ্রাহক হিসেবে সিংহবর্মার মূর্তি উৎকীর্ণ করলাম। মূর্তি শেষ হয়ে গেলে আমি সেই চার্বাক মিত্রকে ডেকে এনে তাকে দেখিয়ে বললাম,

—দেখুন, পরলোকবাদের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এবং আপনাদের কথিত ভোগবাদের নিষ্ঠুর সত্য।

মোটা ঠোঁট, কুঞ্চিত কেশ ও কালো রংয়ের দাসদের কথা শুনেছি, তাদের ধরবার জন্য দাস ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী সেনা বেতন দিয়ে পুষে রাখে। জানিনা এর কতটা সত্য কতটা মিথ্যা। কিন্তু সেই সঙ্গে শবরপল্লীর কথা মনে পড়ল আমার। সেই গভীর জঙ্গলে অথবা সমুদ্র তটে তারাও তালপাতার পর্ণকুটিরে বাসকরে। তাদেরও

নিশ্চয় এমনি করে ক্রুর সৈনিকরা ঘিরে বন্দী করে নিয়ে আসে।

দাস ব্যবসার সবচেয়ে নিচের দৃশ্য হল এই। তাছাড়া সুন্দরী দাসী রাণীরূপে হাজার হাজার রয়েছে রাজাদের অন্তঃপুরে। আমার এতদিনকার যাত্রার পথে আমি যে সকল দেশে গেছি সে সব দেশে এমন দাস শিকারের নিয়ম নেই বলে হয়ত আমরা রক্ষা পেয়ে এসেছি।

ধনীদের মধ্যে ভগবানের ভক্তের অভাব নেই। আমার পরিচিতদের মধ্যেও এমন ভক্তেরা অনেক রয়েছে। তারা যখন আমার অনিশ্বরবাদী নাস্তিক চার্বাক হবার কথা শুনত, তখন জোর গলায় তর্ক করে তাদের ভগবানকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করত,—তারা বলত,—প্রত্যেক কাজের পিছনে একটা না একটা কারণ নিশ্চয় আছে। কুমোর যখন ঘড়া তৈরী করে তখন যেমন সে একজন সৃষ্টিকর্তা এবং সেই সৃষ্টির একটা কারণ থাকে, তেমনি এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তাও সেই ঈশ্বর আছেন এবং তার একটা কারণ আছে।

আমি বললাম—তাহলে এই নিরপরাধ মানুষগুলিকে ধরে এনে যারা দাস তৈরী করছে তারাও ঈশ্বর।

এই কথার যথাযথ উত্তর না পেয়ে পূর্বজন্মের কথা তুলে তারা নিজেদের অপরাধ চাপা দিতে চেষ্টা করে। আমি বলতাম,—বেচারী চোরদের শুধু শুধু আপনারা হাত পা কেটে শাস্তি দেন। তারা সাহস করে পরিশ্রম করে তাদের পূর্বজন্মের রোজগারের ফল নিতে এলে আপনারা তাদের ধরে হাত পা কেটে, শূলে চড়িয়ে, পাহাড়ের উপর থেকে ফেলে দিয়ে শাস্তি দেন, এটা কতখানি অন্যায় বিচার বলুন ত?

দক্ষিণাপথের এই অংশের সঙ্গে উত্তর ভারতের নানাবিষয়ে পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয়। শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের এখানে খুব সম্মান করা হয়। শ্রমণদের চেয়ে ব্রাহ্মণদের সম্মান বেশী। কারন তারা সংখ্যায় খুব কম, রাজা এবং সামন্তদের উপর তাদের আধিপত্য বেশী।

কাউকে উচ্চ জাতি বলে স্বীকৃতি পেতে হলে ব্রাহ্মণ ভিন্ন গতি নেই। শ্রমণদের মধ্যে সকলজাতির লোক রয়েছে অতএব তারা জনসাধারণ। যদিও ভিক্ষুদের নিজের মধ্যে খাওয়া দাওয়া প্রভৃতি বাপারে কোন ভেদ নেই, তবুও বাইরের অনেক দেশে কিছু কিছু ভেদ ভাব দেখা যায় ছোট বড় জাতির বেলায়। পল্লবরা ভিক্ষুদের জন্যে অনেক বিহার তৈরী করে দিয়েছে, অনেক গ্রাম দান করেছে এবং বিদ্বান ভিক্ষুদের যথেষ্ট সম্মান করে, তবুও মনে প্রাণে তারাও ব্রাহ্মণদের উপর বেশী নির্ভরশীল।

কাঞ্চীতে এক বৎসর কেটে গেল। এখনও আমার আসল পরিচয় প্রকাশ পায়নি। সেই ভয়ে বেশীর ভাগ সময় আমি পাণ্ডিত্য, কলাবিদ ও কলাপ্রেমীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় থাকতাম। সময়ের অভাব ছিল না তাদের সঙ্গে মেলামেশা করবার। কখনও সন্ধ্যেবেলা বাড়ীতে বসে সিংহ আর বৌদির সঙ্গে গল্প করতাম, গান বাজনা ও পানাহার করতাম।

চার্বাক বন্ধুর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা যথেষ্ট ছিল। যদিও চার্বাক'এর ভব্য দর্শনের সে যা অর্থ বোঝাতে চাইত আমি বরাবর তার বিরোধিতা করতাম। কাঞ্চীর মহাবিহারে আমি প্রায়ই যাওয়া আসা করতাম। সেখানে পণ্ডিত ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়মিত শাস্ত্রচর্চা করতাম। তারা অবাক হতেন যে তথাগতকে দ্বিপদ উত্তম (সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ) মানতে আমি তাদের চেয়ে বেশী আগ্রহী অথচ কথায় কথায় আমি তাঁর প্রচারিত ধর্মের খুঁত ধরি। যেমন করে হোক, তাদের সঙ্গে আমার মিত্রতা বজায় ছিল, তার মধ্যে একটা কারণ ছিল যে আমি আচার্য বসুবন্ধুর প্রিয় শিষ্য। আচার্য বসুবন্ধুর পাণ্ডিত্যের সংবাদ সমুদ্র পার অবধি পৌঁচেছে এবং সর্বদেশে তাঁর প্রশংসায় পণ্ডিতকূল পঞ্চমুখ।

গত ছয়মাসে এক তরুণ ভিক্ষুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি আনন্দিত হলাম এমন এক তরুণ বন্ধু পেয়ে।

তার প্রতিভা যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি অধ্যবসায়ী। তরুণ আমার

কাছে আচার্য বসুবন্ধুর 'বাদ বিধান' প্রভৃতি দু'একটি গ্রন্থ পড়ে আরও জানবার জন্য উৎসুক হয়ে উঠল। আমি বললাম—আচার্য বসুবন্ধু আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ বিচারক। তরুণ আচার্যের সঙ্গে দেখা করবার আগ্রহ প্রকাশ করতে আমি বললাম—আচার্য এখন গান্ধার দেশে আছেন, যদি তাঁর কাছে যেতে হয় তাহলে অবিলম্বে রওয়ানা হও। তার কয়েকদিন পরে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তরুণ উত্তর দিকে রওয়ানা হল। পরে আমি জানতে পেরে খুশী হয়েছিলাম যে সেই তরুণ যুবকের নাম দিঙনাগ। সে আচার্যের কাছ থেকে যথাযথ শিক্ষালাভ করে প্রসিদ্ধ হয়েছে এবং পুঁথি-পত্রধারী ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য জাতির ধর্মধ্বজারা দিঙনাগের পাণ্ডিত্যের প্রভাবে ভয়ে কাঁপতো।

অবশেষে সেইদিন এলো, যেদিন কাঞ্চী ছেড়ে যাবার জন্য আমি প্রস্তুত হলাম। তিনবৎসরেরও বেশী হল আমি, সিংহ এবং বাসন্তী একসঙ্গে রয়েছি। শুধু জীবনে নয় মৃত্যুর সম্মুখে, সুখে দুঃখে আমরা অভিন্ন হৃদয় ছিলাম। এমন আত্মীয়কে ছেড়ে যাবার কথা ভাবতেও চোখে জল আসে। অতি কষ্টে বাসন্তী বললো,—দেবর জয়! সবচেয়ে ভালো হত যদি আমরা আমৃত্যু সেই শবরপল্লীতে থাকতে পারতাম, তাহলে এই বিচ্ছেদ বেদনা ভোগ করতে হোত না।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য কথার মোড় ঘুরিয়ে বললাম, —বৌদি! তোমার সেই বেশের কথা মনে আছে?

—আছে জয়, সে কথা কোন দিন ভুলতে পারবো দা। প্রথম যেদিন তুমি আমাকে ঐ বেশ ধারণ করতে বলেছিলে সেদিন আমার যে কতখানি দুঃখ এবং আনন্দ হয়েছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না।

—হুঁ, আনন্দও হয়েছিল তাহলে?

—তা হবেনা, দেবরের মুখ দিয়ে প্রস্তাবটা বেরিয়েছিল যে। ঠাট্টা করে বলল সিংহবর্মা।

—হ্যাঁ দেবর, আজ ভাবছি সেই জীবন কত মধুর ছিল। যদিও এই জীবন ভোগ সুলভ, কিন্তু এর আর একটা দিক কত ক্রুর। তোমারই হাতে তৈরী ঐ দাস বিক্রীর দৃশ্য কত মর্মান্তিক। শবর-পল্লীর লোকগুলি অসহায় অবোধ জংলী হতে পারে কিন্তু দাস মনোবৃত্তি সেখানে কেউ ভাবতেও পারে না। বার বার আমার শ্যামাকে মনে পড়ে। কত সরল কেমন নির্ভয়। সেখানে ও এখানে আমার জীবনে অনেক সঙ্গি-সাথীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে, কিন্তু শ্যামার মত কাউকে আজ অবধি পাইনি আর পাবও না।

—কেন আবার চলো জাহাজে উঠি গিয়ে। আর জাহাজ ডুবুক এবং আবার সেইখানে গিয়ে পৌঁছাই। কি বল জয়।

—একবার ভাংলে তা যেমন আর জোড়া লাগে না তেমনি সেও আর পাবার নয় সিংহ। কিন্তু মানুয়ের মন তাই চায় বটে। নইলে আমরা মানুষ না হয়ে গাছ হতাম। একই সঙ্গে জন্মাতাম, একই সঙ্গে বড় হতাম। একই সঙ্গে ঝড় ঝাপটা সহ্য করে সুখী থাকতাম।

সেই দিনই আমি কাঞ্চি থেকে বাসন্তি আর সিংহবর্মাকে ছেড়ে রওয়ানা হলাম। বিদায় নেবার সময় আমাদের কারও মুখে ভাষা ছিল না; চোখে শুধু জল আর মুখে একটু হাসি।

॥ তেরো ॥

সিংহলে

ইচ্ছে করলে স্থলপথে অনেকদূর অবধি যাওয়া যায়। অর্থাৎ যেখানে সিংহল এবং ভারতের সীমা খুব কাছাকাছি মাত্র কয়েক যোজনের একটা খাড়ি, সেই অবধি স্থলপথে গিয়ে বাকি ঐ সামান্য পথটুকু জাহাজে গেলেই সিংহল যাবার পথে ভারতের অনেক দেশ দেখে যাওয়া যেত। তাহলে পাণ্ড্যদেশের রাজধানী মথুরাও (মাদুরা) দেখে যাওয়া যেত। কিন্তু এই পথে বিপদাশঙ্কা বড্ড বেশী। স্থলপথে দুর্গম জঙ্গল পার হয়ে যেতে হয়, আর চোর ডাকাতের ভয়ও খুব বেশী। অতএব আর বিপদের ঝুঁকি না নিয়ে কাবেরীপত্তন পর্যন্ত স্থলপথে গিয়ে সেখান থেকে সিংহল যাওয়ার জাহাজে উঠলাম।

জাহাজের দিনগুলি একলা কাটানো খুবই কঠিন। মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়া মোটেই কঠিন নয়। যখন একজন আর একজনের ভাষা বুঝতে পারেনা তখন একজনের প্রতি অপরজনের মূক-স্নেহ জাগে। আমি যে জাহাজে চলেছি এই জাহাজেও অনেক সিংহলী চলেছে নিজ দেশে। আমি ভাবছিলাম প্রথমে পল্লবদের রাজত্বে গিয়েই যে রকম ভাষা সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম এবার তার চেয়েও সঙ্কট বেশী হবে। তাছাড়া সিংহলের সম্বন্ধে অনেক জনশ্রুতি। ছোটবেলায় শুনতাম সিংহল নাকি রাক্ষসীদের দেশ, ভুলেও কেউ কখনও সেখানে গিয়ে পৌঁছলে রাক্ষসীরা যাদু করে তাদের পশুতে পরিণত করে রাখে আর কখনও সেখান থেকে ফিরে আসা যায় না। পরে বয়স ও বুদ্ধি হবার পর এবং নানা দেশ ভ্রমণ করবার পর অবশ্য সেসব কথা বিশ্বাস হত না। তবুও মনে মনে একটা চিন্তা ছিল, নতুন দেশ, নতুন পরিবেশ কেমন না জানি হবে।

জাহাজে যে সকল সিংহলীরা নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলছিল আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তা আমি অনায়াসে বুঝতে পারি। কিন্তু অন্যান্য যে সব পল্লব বা পাণ্ড্যদেশবাসী-যাত্রীরা কথাবার্তা বলছিল তার একবর্ণও বোধগম্য হল না। যদিও কাঞ্চীতে আমি এক বৎসরেরও বেশী থেকে এলাম কিন্তু দ্রাবিড় ভাষা এতটুকুও আয়ত্ব করতে পারিনি। কারণ সেখানে যাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা করতাম তারা প্রায় সকলেই উত্তরদেশ থেকে আগত ব্রাহ্মণ বা রাজবংশী। জাহাজে ভারত বা সিংহল ছাড়া অন্যান্য বহু দেশের বহু জাতির যাত্রী ছিল। অনেক দ্বীপের লোক ছিল যে সকল দ্বীপের নামমাত্র শুনেছি। যবদ্বীপবাসী এক তরুণ ব্রাহ্মণ যুবকের সঙ্গে আমার মিত্রতা হল। আর একজন সিংহলী তরুণও আমার সঙ্গে এসে মিত্রতা করল। সিংহলী তরুণের নাম রোহন, আর যবদ্বীপের তরুণের নাম অর্জুন।

ইতিমধ্যে আমারা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। একে অপরের দেশ কাল রীতি, নীতির বিষয়ে জানছি। কথার শেষ নেই। তিনজনেই আমরা তিনজনকে পেয়ে খুব খুশী। আমি রোহনকে জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমাদের বাড়ী থেকে বাড়বানল (সমুদ্র থেকে উত্থিত একপ্রকাব আগুন—সমুদ্রাগ্নি) কতদূর ? যেখানে সমুদ্রের মধ্য থেকে দিবারাত্র ধ্বক ধ্বক করে আগুন জ্বলছে ?

—সিংহলের উত্তর দিক থেকে বাড়বাগ্নি দেখা যায় না। দক্ষিণ প্রদেশের নাম রোহন, সেখান থেকে দেখা যায়। কিন্তু দেখতে হলে হয় কোনও উঁচু গাছ অথবা কোনও পাহাড়ের উপর উঠে দেখতে হয়। লোকে বলে ঐ আগুন দেখবার সময় যদি কোনও দেবতা দেখে ফেলে তাহলে জীবন নিয়ে আর কেউ নাকি ফেরে না। রোহনের কথা শুনে অর্জুন বললো,—আমাদের দেশেও এমনি সব কিংবদন্তী শোনা যায় রোহন। লোকে বলে আমাদের যবদ্বীপ থেকেও দক্ষিনে ঐ সমুদ্রাগ্নি। সেখানেও রাত্রে দেখা যায় কিন্তু কেউ দেখতে চায় না। কথিত আছে ঐ আগুনে চোখ পড়লেই

নাকি আগুন তাকে টেনে নেয়। কিন্তু আমার মনে হয় লোকের অজ্ঞানতা বশতঃ এই সব কাহিনী তৈরী করে। আমার বাড়ী হল যবদ্বীপের দক্ষিণ তটে।

—যবদ্বীপের লোকেরা কেমন? প্রশ্ন করলাম আমি।

—লোক আবার কেমন হবে, যেমন আমি তেমনি।

—তা নয়, আমাদের দেশের মত সেখানকার লোকদেব মধ্যেও কি ভেদ-ভাব ও কুসংস্কার আছে?

—নিশ্চয় আছে তবে ভারতের লোকদের মধ্যে।

—তা হলে ওখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র প্রভৃতি বর্ণভেদ নেই?

—যা আছে তা ঐ ভারত থেকে গিয়ে যারা বাস করছে তাদের মধ্যে, কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব কম।

—মিত্র অর্জুন, ক্ষমা করো। আমি লক্ষ্য করছিলাম তোমার মুখের আকৃতি যবদ্বীপ বাসীর মত, গালের হাড়গুলি উঁচু এবং শ্মশ্রু-বিহীন মুখ। অথচ···

—হ্যাঁ মিত্র, তুমি ঠিকই বলেছ। ব্রাহ্মণরা যবদ্বীপে গিয়ে খানিকটা উদারতা দেখিয়েছে এ তারই পরিণাম। আমার ঠাকুরদা কাঞ্চী থেকে গিয়ে যবদ্বীপ তীরে বাসিন্দা হয়েছিলেন। আমি তাই কাঞ্চী গিয়েছিলাম পূর্বপুরুষদের জন্মভূমি দর্শন করবার জন্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলাম আমার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি এখন ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি। তার একমাত্র কারণ আমার মুখের আকৃতি, যা ভারতীয়দের চেয়ে চীনদেশীয় লোকদের সঙ্গে বেশী সাদৃশ্য রাখে।

এবার রোহন আশ্চর্যভাব দেখিয়ে বললো,—কিন্তু ভাই অর্জুন, এমন হবার কারণ কি? আমরা অর্থাৎ সিংহলীরা হাজার বৎসর আগে উত্তরভারত থেকে এসে সিংহলে বাস করছি।

—এখনও আমরা ঘরে সেই ভাষাতেই কথা বলি যে ভাষায় এখানে বলছি। আর মিত্র জয় সাক্ষী রয়েছে যে এই ভাষা এখনও

মগধে চালু রয়েছে। কিন্তু আমাদের মুখ-মুদ্রায় ত কোন তারতম্য ঘটেনি।

—তোমাদের সঙ্গে আমাদের অনেক প্রভেদ আছে ভাই রোহন। যবদ্বীপ দেশটা বেশ বড়। সেখানকার অধিবাসীরা আমার মত মুখাকৃতির। সিংহলে হয়ত তোমাদের লোক অধিক সংখ্যক বাস করে অথবা অন্য কোন কারণ থাকতে পারে যে জন্য তোমাদের মুখাকৃতি বদলায়নি। কিন্তু যবদ্বীপে ভারতবাসী যে কয়জন আছে তারা সংখ্যায় এত কম যে সমুদ্রের বুকে বুদ্‌বুদের মত। তাও সকলে তাদের স্বদেশীয় স্ত্রী নিয়ে আসেনি। যেমন আমার ঠাকুরদা। রাজা একসময় যজ্ঞ করতে চেয়েছিলেন এবং সেই যজ্ঞে কর্মকাণ্ডী ব্রাহ্মণ প্রয়োজন ছিল, অথচ যবদ্বীপে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা খুবই কম। তখন ভানুদত্তশর্মা যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন। যজ্ঞের দক্ষিণা বাবদ অন্য কিছু তেমন তিনি পাননি, কিন্তু রাজা মহেন্দ্র বর্মার কন্যাকে লাভ করেছিলেন।

—যবদ্বীপবাসীদের নামও কি ভারতীয়দের মতই?

—ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে প্রায়ই এই রকম নামই হয়। তাই বলে তারা সকলেই ভারত থেকে যায়নি। তাদের কারো কারো পূর্বপুরুষ ভারতীয় ছিলেন। ওখানকার রাজাও নিজেকে কোনও ভারতীয় রাজবংশীয় বলে পরিচয় দিয়ে থাকেন। কিন্তু আমি পল্লব রাজবংশীদের দেখেছি তাদের সঙ্গে মুখাকৃতির কোনও মিলই নেই। মায়ের দিক থেকে আমি তিনপুরুষ রাজকন্যাদের সন্তান! তাতে আমার মুখাকৃতির মধ্যে যদি ভানুদত্তশর্মার মুখের আকৃতি লুপ্ত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য দায়ী ঐ রাজকন্যারা। আমি বললাম,—অতএব সবকথার সার কথা হল যবদ্বীপের রক্তের সঙ্গে ভারতীয় রক্তের সংমিশ্রন হয়েছে, যেমন এক পুকুর দুধের মধ্যে দুই ফোঁটা টক ফেলে দিয়ে সমস্ত দই নিজের বলে দাবী করা গোছের।

—কিন্তু আমাদের সিংহলে তেমন কোনও নিয়ম নেই। আমাদের ব্রাহ্মণকুমাররা পাটলিপুত্র উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা

করতে যায় এবং সেখানকার বড় বড় কুলের কন্যাদের বিবাহ করে নিয়ে আসে। তার জন্যে নিজ নিজ পূর্বপুরুষদের পরিবারে তাদের সম্মানের এতটুকু হানি হয় না।

—অর্জুন। আমি বিষয়টাকে আরও একটু সরলভাবে বোঝাবার জন্য বললাম,—আমাদের দুজনের মুখের আকৃতিতে কোনও পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ কি ?

—এমনি ত প্রত্যেক মানুষের মুখই ভিন্ন ধরণের হয়ে থাকে। তবে জাতির পার্থক্য হিসাবে মুখাকৃতির কোনও পার্থক্য নেই, শুধু তোমার গায়ের রংটা ওর চেয়ে একটু বেশী গৌরবর্ণ।

—তাহলে আমাদের দুজন ক্ষত্রিয় কুমারের মধ্যে যেমন কোন পার্থক্য দেখতে পাচ্ছ না তেমনি সিংহলী ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ কুমারদের মধ্যে কোনও পার্থক্য এখনও সৃষ্টি হয়নি। শুধু যে দুই দেশীয় ব্রাহ্মণরা একই ভাষায় কথা বলে সেজন্য ভারতীয় ব্রাহ্মণকন্যা সিংহলী ব্রাহ্মণকুমার বিবাহ করবার অধিকার পায় তা নয়। তোমার মত যদি ওদের মুখাকৃতি বদলাতো আর ভাষা ঠিক থাকতো তাহলেও ওদের সাধ্য ছিল না কোন ভারতীয় ব্রাহ্মণকুমারীকে বিবাহের প্রস্তাব পর্যন্ত করবার, সে যত নিকট ভারতীয় বংশধর হোক না কেন।

—যবদ্বীপে আমি নিজেকে ব্রাহ্মণকুমার বলে গর্ব করতাম। আমি বেদ কণ্ঠস্থ করেছি, বহু ব্রাহ্মণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি। তারুমা নগরীতে রাজাধিরাজ পূর্ণবর্মার ত্রৈলক্য সুন্দরী কন্যা এখনও আমার প্রতীক্ষায় দিন গুনছে। তবুও মনে হল একবার পূর্বপুরুষদের ভিটে মাটিটা দেখে আসি আর সম্ভব হলে একজন ব্রাহ্মণকন্যাকেও বিবাহ করে নিয়ে আসার অভিলাষ মনে মনে ছিল।

—তাই নাকি ? তা তোমার পরিণীতা কোথায় ?

—সে ইচ্ছা কাঞ্চীতে গিয়ে ত্যাগ করেছি বন্ধু জয়। ব্রাহ্মণরা আমাকে তাদের ঘরে ঢুকতে দিতেও কুন্ঠিত হয় দেখে আমি মনে মনে খুবই দুঃখ পেয়েছি। তবে একটা সুখের বিষয় যে কাঞ্চীতে

ঢোকবার আগেই আমি জানতে পেরেছিলাম যে হরবোলার মত সংস্কৃত বলতে পারলে, লম্বা ধূতি আর যজ্ঞোপবীত পরলেও আমার চেহারা দেখলেই ব্রাহ্মণদের মনে ঘৃণাভাব জেগে ওঠে। দু' এক জায়গায় আত্মবিস্মৃত হয়ে আমি ওদের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তারা আমাকে "ম্লেচ্ছ" বলে দূর দূর করেছে। তারপরে কাঞ্চীতে যে ক' দিন ছিলাম আমি সাবধানে রাস্তা চলতে ভুলিনি। ভানুদত্তশর্মার গোত্র এবং পরিবারের সন্ধান পেয়েছিলাম। তার ভাইদের ও সন্তানদের দেখে এসেছি।

—তারা তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছে?

—ব্যবহার আর কি করবে। আমি নিজের পরিচয় দিইনি। আমি তাদের শুধু বলেছিলাম যে, তোমাদের কুলের ভানুদত্তশর্মা যবদ্বীপে গিয়ে মহান্ কীর্তি স্থাপন করেছেন। খুব সম্মানী ব্যক্তি বলে পরিচিত হয়েছেন। এখনও তার সন্তান সেখানে সুখেই বাস করছে।

—বুদ্ধিমানের কাজ করেছ অর্জুন। ভানুদত্তের পরিচয় দিলে তোমার কোন লাভই হতনা। ভানুদত্তবংশী যবদ্বীপে গিয়ে যত সম্মান বা উচ্চস্থানই লাভ করুন না কেন, এখানে তিনি চিরকালের জন্য ভ্রষ্ট হয়েছেন।

—আমার সকল সম্মান ধূলোয় মিশে গেছে জয়। এখন থেকে আমি নিজেকে একজন সাধারণ যবদ্বীপ সন্তান বলেই মনে করব। আজ আমার সেই সকল ভারতীয়দের উপর ঘৃণা বোধ হচ্ছে, যারা ভারত থেকে যবদ্বীপে গিয়ে আমাদের যবদ্বীপবাসীর মধ্যে ভেদভাবের বীজবপন করছে। যবদ্বীপবাসী কখনও জানত না যে মানুষের মধ্যে ছোট বড় জাতির পার্থক্য থাকতে পারে।

—হুঁ! তাহলে এবার বুঝতে পেরেছ যে ব্রাহ্মণদের চাটনী কত মিষ্টি?

—শুধু তাই নয় ভাই অর্জুন, জাতিকে টুকরো টুকরো করে ভাংতে ব্রাহ্মণদের মত ওস্তাদ আর কেউ নেই। মন্তব্য করলো রোহন।

—এখন আমি বুঝতে পারছি যে আমরা নিজেদের খণ্ড খণ্ড করে ভেঙ্গে নিজেরাই নিজেদের অপমান ও লাঞ্ছনার পাত্র করেছি। আমি আমাদের ব্রাহ্মণদের বোঝাতে পারি কিন্তু কাঞ্চীতে গিয়ে আমি যে অপমান সহ্য করেছি যতক্ষণ তেমনি কোনও আঘাত তাদের উপর না আসছে তারা হয়ত মানবে না। সমাজে বড় হওয়ার জন্য মোটা মোটা দক্ষিণার লোভ অত সহজে কেউ ত্যাগ করতে পারবে না।

—তুমি এক কাজ করো অর্জুন। তোমার দেশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার কর। বৌদ্ধধর্মে জাতি বিচার নেই এবং ভারতীয় ভেদভাবও অন্যদেশে ছড়াতে চায় না বৌদ্ধরা।

—কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধরা ত জাতিভেদ মুক্ত নয়।

—হাজার হাজার বছরের সমাজ ব্যবস্থাকে বৌদ্ধরা ভাঙ্গতে সমর্থ হয়নি তাই নিজেরাও জড়িয়ে পড়েছে, ওদের জন্যে আমার দুঃখ হয় বন্ধু। নয়শত বৎসর যাবৎ লড়াই করে শেষকালে ওরা হাতিয়ার ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু তাদের নয়শত বৎসরের প্রচেষ্টা একেবারে নিস্ফল হয়নি।

—তোমার কথাই ঠিক জয়। সিংহলেও আমরা জাতিভেদভাব একেবারে বন্ধ করতে না পারলেও ততখানি উগ্রতা নেই যতখানি ভারতবর্ষে দেখা যায়। এবং সবটুকুই বৌদ্ধদের চেষ্টার ফলে সম্ভব হয়েছে।

—আর তোমরা যদি তোমাদের হাতিয়ার না ছেড়ে দাও, তাহলে তোমরাও একদিন সফল হবে, রোহন।

—তবে আমাদের একটা সুবিধা এই যে, আমাদের জাতির জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধধর্মই আমাদের পথ প্রদর্শন করে থাকে, অতএব আমরা অন্যের ফাঁদে অত সহজে পড়ব না।

অর্জুন এতক্ষণ চুপ করে রোহন ও আমার কথা শুনছিল। ওর মুখে চোখে ঘৃণা ও বেদনার ভাব দেখে আমার মনে খুব কষ্ট হচ্ছিল। অর্জুন বললো,—ভারত ঘুরে এসে আমার সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল যে,

ব্রাহ্মণদের ধর্ম কোন জাতির কখনও মঙ্গল করেনি এবং করবে না। অভারতীয় জাতির পক্ষে ওরা বিষবৎ ভয়ানক।

—আর তার সঙ্গে যদি ভারতীয় রাজাদের ধর্ম দু' একফোঁটা যোগ করতে পারো তা হলে ত সোনায় সোহাগা। আজ তোমার এই উপদেশের জন্যে অন্যরকম ব্যবস্থা হত এতক্ষণে।

জাহাজে আমরা পাঁচদিন ছিলাম। জাহাজের উপরেই আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কাবেরী পত্তন থেকে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ঐ জাহাজেই যাচ্ছিলেন। তাঁরা নিজেরাই নিজেদের খাবার ব্যবস্থা করতেন। অন্যের ছুঁয়াছুঁৎ যাতে না লাগে সে দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি তাদের। আমরাও সুযোগমত টিপ্পনি কাটতে ছাড়তাম না। ব্রাহ্মণরা বলতো নৌকোর উপর কাঠ আর মাটীতে কোন তফাৎ নেই। তাত হবেই, ওটা ব্রাহ্মণের শাস্ত্র। ওদের তৈরী শাস্ত্রে ওদের সুবিধামত নিয়ম তৈরী করতে দেরী হয়না।

আজ বার বার মনে হচ্ছে তাম্রলিপ্ত থেকে যেদিন আর একবার আমরা সমুদ্রযাত্রা করেছিলাম। সেদিন সমুদ্র শান্ত ছিল। সেদিন যদি মাঝপথে দুর্ঘটনা না হত, তাহলে সিংহল যাত্রা শেষ করে এতদিন ফিরে যেতাম। কিন্তু সেই দুর্ঘটনা আমার জীবনে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। নইলে শবরপল্লীর দেড় বৎসরের অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও লাভ করতে পারতাম না। আজ নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে সিংহলে এসে পৌঁছালাম। এক যাম দিন বাকি থাকতে আমরা সিংহলের মাটিতে পা রাখলাম।

সময়টা গ্রীষ্মকাল, এখানে গরমটা বেশী বোধ হচ্ছে। কিছু কিছু তাল ও জঙ্গলী গাছ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। শুধু বালী আর কাঁকর। স্ত্রীদের পোষাক বলতে কটিদেশের নিম্নভাগে একটা অন্তরবাসক। উচ্চকূলের রমণীরাও উত্তরাসঙ্গ (চাদর) কমই ব্যবহার করে। এখন এদের অর্ধনগ্ন শরীর দেখে আমি মোটেই আশ্চর্য হইনি। বস্তীর বাইরে বেশ বড় একটা বিহার রয়েছে, সেখানে দুইশতের বেশী ভিক্ষু বাস করে। সেখানে যাওয়ার জন্য

আমার কোনও আগ্রহ ছিল না। যাত্রীদের থাকার জন্য অনেক পান্থশালা রয়েছে, এবং আহার গৃহও আছে। সেদিনকার মত আমরা পথিপার্শ্বে এক পান্থশালায় আশ্রয় নিলাম। অর্জুন যবদ্বীপের জাহাজে উঠবে কিন্তু এই কয়েকদিনে আমাদের অন্তরঙ্গতা এত বেড়েছে যে হঠাৎ ও আমাদের ছেড়ে যেতে পারল না। আমি ও রোহন সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর যাব বলে ঠিক করেছি, অর্জুনও অনুরাধাপুর দেখে যাবে বলে আমাদের সঙ্গেই রয়ে গেল।

রোহনের নিজের দেশ বলে আমাদের কারুরই ভাষা বুঝতে অসুবিধা হল না। আমি এখানে পাটলিপুত্রের পোষাকেই ছিলাম। দেখলাম এই পোষাককে এখানকার লোক খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখে। সিংহলের লোকদের মগধের লোকের মতই মনে হয়। দ্রাবিড় জাতিও কিছু কিছু আছে এখানে, কিন্তু তারা সকলে ব্যবসাদার অথবা শিল্পী। সংখ্যায় খুবই কম।

পরদিন আমরা সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর পৌঁছুলাম। অনুরাধাপুর সিংহলের সবচেয়ে বড় এবং পুরানো নগর। কাঞ্চীর তুলনায় এখানকার বিশেষত্ব হল, এখানে বহু বৌদ্ধমন্দির আছে। রাস্তা ঘাট খুব ভালো এবং পরিস্কার। প্রতি চৌরাস্তায় মোড়ে মোড়ে ধর্মোপদেশের জন্যে ধর্মশালা রয়েছে। প্রতি অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে ভিক্ষুরা এখানে ধর্মোপদেশ দিয়ে থাকেন। এখানকার নর-নারীদের বৌদ্ধধর্মের উপর অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাস। তাই বলে প্রভুবর্গ সাধারণ জনতার সুখ সুবিধার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেন না। রাজা এবং রাজপরিবারের বিলাস-ব্যসন ভারতের মতই। এই জন্যে অনেক লোক অত্যন্ত গরীব। রোহনগিরিতে পদ্মরাগ, পুষ্পরাগপ্রভৃতি মণির খনি আছে কিন্তু সে সকল রাজা সামন্তদের জন্যে, সাধারণের কোনও প্রকার সুখ সুবিধা নেই বললেই হয়। তবে এখানকার রাজার সুনাম করতে হবে। চাষের সুবিধার জন্য খেতের কাছে বিরাট জলাশয় তৈরী করে দিয়েছে। যৌধেয় ভূমিতে এমন জলাশয় থাকলে সেখানকার চাষের উন্নতি হত আরও

সহস্রগুণে। অনুরাধাপুরের আশে পাশে একাধিক জলাশয় রয়েছে, এখানকার লোকেরা সেগুলিকে বাপী বলে। এই বাপীর জল খাল দিয়ে নগরের মধ্যে গেছে। এত অধিক সংখ্যক বিহার চৈত্য পৃথিবীর আর কোথাও নেই। রত্নমাল্য এবং পাহাড়গিরির চৈত্য আকারে একটা ছোট খাট পাহাড়ের মত। এটিকে সাজাবার জন্যে মুক্তহস্তে দীনার ব্যয় করা হয়েছে নিঃসন্দেহ। প্রতি সকাল-সন্ধ্যায় পূজার জন্য হাজার হাজার নর-নারী ফুল ও মালা নিয়ে এখানে আসে।

রোহনের বাড়ীতেই আমরা আশ্রয় নিলাম। প্রথমে আমি ভুলেই গেছিলাম যে আমি কেন সিংহলে এসেছি। সিংহল আসবার কথা প্রথম আমার মনে হয়েছিল যখন আমি আচার্য বসুবন্ধুর শিক্ষার্থী। তারপর কতদিন চলে গেছে, আমার মনের এবং দেহের পরিবর্তন হয়েছে অনেক। তাই এখন ভাবছি সিংহল আসবার প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল আমার। সেই যাত্রার দিন থেকে কত দেশ-দেশান্তর ঘুরেছি, চলার পথে থেমেছি কতবার, আবার চলেছি। চলতে চলতে আজ সিংহলে এসে পড়লাম। যতদূর মনে হয়, হয়ত আমার মনের অন্তস্থলে যাযাবরের অতৃপ্ত বাসনা কোথাও লুকান ছিল, যার আকর্ষণে আজ এতদূর এসেছি।

একমাত্র বিশাল জলাশয়সমূহ, চৈত্য ও বিহার ছাড়া অন্য সকল দিক দিয়ে অনুরাধাপুরকে পাটলিপুত্রেরই একটা অংশ বলে মনে হয়। এখানেও গন্ধবণিকদের পণ্যবীথি, জহুরী, শিল্পি, গণিকাদের তেমনি সারি সারি দোকান সাজানো। যদিও এসকল জায়গার গুরুত্ব বা বিশেষত্ব কিছু নেই তবুও মাঝে মাঝে যেতাম।

একসপ্তাহ পরে অর্জুন যবদ্বীপ রওয়ানা হয়ে গেল। এখন শুধু রোহন আর আমি। রোহন খুব সাদাসিধে প্রকৃতি তরুণ যুবক। যদিও ওর কোনদিকে বিশেষ রুচি তা আমি জানতে পারিনি, তবুও আমি যখন যেখানে যেতাম, সব সময় আনন্দে রোহন আমার

সঙ্গে যেত। তবে একটা রুচির পরিচয় আমি পেয়েছিলাম, সেটা হল বার বার ও বলত কেমন করে আমাদের পূর্বপুরুষরা কোন এক সময় জাহাজে করে ঘুরতে ঘুরতে তাম্রপর্নী (সিংহল) এসে পৌঁছেছিল। তখন সিংহলের শাসন ছিল শ্যাম জাতিদের। তার মধ্যে শ্যামবর্ণের মানুষ আগন্তুকদের প্রধানের সঙ্গে বন্ধু পাতিয়ে শ্যামজাতির গুপ্তখবর সব বলে দিয়েছিল এবং তারপর দুইদলে খুব লড়াই হয়। এই লড়াইতে শ্যামবর্ণ জাতি পরাজিত হয় এবং সেই থেকে এই দ্বীপ সিংহলীদের অধিকারে। আমি নিজের কথা ভেবে আনন্দ পাই যে শবর পল্লীতে শ্যামার প্রেমের দুরুপযোগ করিনি। রোহন অনেকবার সেই শ্যামবর্ণ জাতিদের বংশধরদের দেখাতে চেয়েছে। দক্ষিণের গভীর জঙ্গলে তারা বাঘ, হাতী প্রভৃতি হিংস্র পশুদের চেয়েও ভয়ানক মানুষদের অত্যাচারের হাত থেকে বেঁচে রয়েছে। এজন্যে আমি দুঃখ করতাম না বরং প্রসন্ন ছিলাম। তাদের বেঁচে থাকবার কারণ সিংহলীদের দয়া বা তাদের বুদ্ধির প্রয়োজন হয়নি, তবুও তারা বেঁচে আছে। সিংহল এতবড় দ্বীপ যে এখানকার লোকেরা এখনও এর সবটুকু অংশের খবরও জানে না।

॥ চৌদ্দ ॥

প্রেম ও ত্যাগ

মহাবিহার ও অভয়গিরির পণ্ডিত ভিক্ষুদের কাছে প্রায়ই যাওয়া আসা করতে লাগলাম, কিন্তু সেখান থেকে নতুন শিক্ষা কিছু পাচ্ছি না। কখনও কখনও আমার বিদ্যাপ্রেমের আগ্রহ দেখে হয়ত একটা দুটো উপদেশ শোনাতেন কিন্তু তার জন্যে আমি এতদূর আসিনি। আচার্য বলেছিলেন তথাগত ভিক্ষু সঙ্ঘের নির্মাণ করেছিলেন লিচ্ছবীগণের অনুসারে। সঙ্ঘের পরিচালনার জন্যে যে নিয়ম প্রবর্তন করেছিলেন, তাও লিচ্ছবি গণসঙ্ঘের অনুরূপ। লিচ্ছবিগণ জীবিত নেই, তাই তাদের গণসঙ্ঘের সমস্ত কথা জানবারও কোন সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া একমাত্র ভিক্ষুদের ছাড়া আর কারও বৌদ্ধ নিয়ম প্রকাশ করবার অধিকার নেই। অতএব একদিনের মধ্যে নিজেকে তৈরি করে নিয়ে মহাবিহারের মহানায়কের কাছে গিয়ে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। স্থবির আমার কুল-গোত্র প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করে বললেন,—আমি শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি যে তুমি যৌধেয়গণের কুলপুত্র। কিন্তু ভিক্ষু হতে হলে মাতা-পিতার অনুমতি চাই।

আমি বললাম—ভন্তে! আমার এক বৎসর বয়সে আমি মাতৃহারা, আর পিতার অনুমতি নিয়েই এসেছি আমি।

—বেশ! কিন্তু আমার বা কারো একলার ক্ষমতা নেই কাউকে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দেবার। সঙ্ঘের স্বীকৃতি সবচেয়ে বেশী দরকার। তোমার কাছে আমি যতদূর জেনেছি, তাতে আমার মনে হয় সঙ্ঘের কোন আপত্তি হবে না।

—কিন্তু ভন্তে! আপনিই তো সিংহলের পঞ্চাশ হাজার ভিক্ষুর মহানায়ক।

—নিশ্চয় আয়ুষ্মান! আমি শুধু মহানায়ক, সঙ্ঘের রাজা নই।

সঙ্ঘের আজ্ঞাবহ। ভিক্ষু হবার উদ্দেশ্য হল সঙ্ঘের সদস্য হওয়া, আর সদস্য হবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি অন্যান্য ভিক্ষুদের মত ক্ষমতা, কর্তব্য ও অধিকার পাবে। এর আগে তুমি কি আর কোনও ধর্মের অনুগামী ছিলে?

—না ভন্তে! আমার কুল চিরকাল ভগবান বুদ্ধের সেবক।

—বেশ, আমি সঙ্ঘের জরুরী সভায় তোমার বিষয় উত্থাপন করব, তারপর পরীক্ষা নেবার পর তোমাকে দীক্ষা দেওয়া হবে।

কয়েকদিন পর সঙ্ঘের সভা হল। বন্ধু রোহন আমার ব্যবহারের জন্য আট সামগ্রী দান করল। তিনটি চীবর (বস্ত্র), লোহার ভিক্ষাপাত্র, অস্তুরা, সূঁচ, পরিস্রাবণ (জল ছাকনী) এবং কোমরবন্ধ। সেগুলি নিয়ে আমি মহাবিহারে উপস্থিত হলাম। সামনে ভিক্ষু-সঙ্ঘ আসীন। মহানায়ক সুমন প্রভৃতি প্রমুখ স্থান দখল করে বসেছেন। সভার কাজ আরম্ভ হলে একজন ভিক্ষু আমাকে প্রশ্ন করলেন—আয়ুষ্মাণ! তোমার দেহে কুষ্ঠ আদি কোনও প্রকার পৈতৃক রোগ আছে কি?

—না ভন্তে।

—তুমি পুরুষ?

—হাঁ।

—তুমি দাস নও তো?

—না।

—তুমি রাজসৈনিক তো নও?

—না।

—তোমার মাতা-পিতা তোমাকে ভিক্ষু হবার আজ্ঞা দিয়েছেন?

—হ্যাঁ।

—তুমি বয়সে বিশ বৎসরের উপরে তো?

—হ্যাঁ।

—তোমার কাছে সকল পাত্র-চীবর প্রভৃতি আছে?

—হ্যাঁ।

অতঃপর উক্ত অনুশাসক ভিক্ষু অনেক প্রশ্ন করলেন এবং সঙ্ঘের সামনে বন্দনা করতে বলে বললেন—আয়ুষ্মাণ জয়! এবার তোমাকে যা প্রশ্ন করা হবে তার যথাযথ উত্তর 'হাঁ' এবং 'না'তে দেবে। আশা করি তুমি সঙ্ঘের সামনে সত্য কথাই বলবে। অতঃপর সঙ্ঘের দিকে মুখ করে ভিক্ষু বললেন—ভন্তে সঙ্ঘ! এই যুবক জয় ভিক্ষু হতে চায়।

আমিও করজোড়ে প্রার্থনা জানালাম সঙ্ঘকে,—ভন্তে! আমি সঙ্ঘের কাছে উপসম্পদা (ভিক্ষুত্ব) প্রার্থনা করছি। পূজ্য সঙ্ঘ অনুগ্রহ করে আমাকে উদ্ধার করুন।

পর পর তিনবার এমনি করে প্রার্থনা করবার পর আরও কিছুক্ষণ প্রশ্ন করা হল আমাকে। সঙ্ঘের তরফ থেকে আমাকে বলে দেওয়া হল যে শরীরযাত্রার জন্যে (১) ভিক্ষা করে খেতে হবে। এছাড়া নিমন্ত্রিত ভোজন স্বীকার করতে পারো। ছেঁড়া কাপড় জুড়ে অথবা দানের বস্ত্র দিয়ে চীবর তৈরি করবে। (২) কার্পাস, উল অথবা রেশমের বস্ত্রও প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করতে পারো। (৩) থাকবার জন্যে বৃক্ষের ছায়া অথবা সঙ্ঘের বিহারে থাকতে পারো। (৪) অসুখ হলে গোমূত্র তোমার একমাত্র ওষুধ। এছাড়া ঘী, মাখন, তেল, মধু এবং খাঁড় (কাঁচা-চিনি) যদি পাও তো ব্যবহার করতে পারো।

সঙ্ঘের সকল নিয়ম-প্রথা জানবার পর আমি বুঝলাম ভিক্ষু-সঙ্ঘ একপ্রকার সংস্থা। এর অনেক নিয়ম এখনও আমাদের যৌধেয়গণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে।

আমি ভিক্ষুদের নিয়ম (বিনয়) প্রভৃতি খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলাম। সবচেয়ে লক্ষ্য করবার মত হল কোন একজন লোকের হাতে ক্ষমতা না যায় সেদিকে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে ভিক্ষু নিয়মের মধ্যে। একমাত্র ঐ আটপ্রকার পরিষ্কার (সামগ্রী) ভিন্ন কোন ভিক্ষুর পৌদগলিক (ব্যক্তিগত) সম্পত্তি বলে কিছু

থাকবে না। সঙ্ঘের হাতে অনেক বড় বড় বাড়ী, খেত এবং আরও বহুপ্রকার মূল্যবান জঙ্গম সম্পত্তি রয়েছে কিন্তু তা শুধু বর্তমান বা ভবিষ্যতে সমস্ত সঙ্ঘের সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এত নিয়ম থাকা সত্ত্বেও খুব কড়াকড়ি ভাবে সেগুলিকে পালন করা হয় না দেখে আমি খুবই আশ্চর্য হলাম। বিশেষ করে অভয়গিরি বিহারের অনেক ভিক্ষুদের নিজস্ব ধনসম্পত্তি রয়েছে। কিন্তু ভদন্ত সুমন তেমন ভিক্ষু ছিলেন না। এ বিষয়ে তাঁর কাছে একদিন প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন—আয়ুষ্মান জয়, তোমার প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। ভিক্ষুদের নিয়ম পালনের এই অবহেলা, খুবই পরিতাপের কথা। ভগবান বলেছিলেন ভিক্ষালব্ধ এক মুঠো উদ্বৃত্ত অন্ন আর একজন ভিক্ষুর সঙ্গে ভাগ করে খেতে। কিন্তু, রাজা যেমন প্রজাদের লুঠ করে তাদের গরীব করে রাখে উপরন্তু নানা-প্রকার কর বোঝা চাপিয়ে তাকে হাত করে রাখে, তাদের দেখাদেখি শ্রেষ্ঠী সার্থবাহরাও নানাপ্রকারে ধনবৃদ্ধি করে চলেছে। দান-পুণ্যও তারাই করে, কিন্তু সেই দানের বেলায়ও তারা পক্ষপাত-হীন হতে পারে না। আগত-অনাগত (বর্তমান-ভবিষ্যত) সঙ্ঘকে দান না করে তাদের স্নেহের পাত্র বিশেষকে দান করে। কালে সেই বিশেষ ভিক্ষুটির লোভের মাত্রা বাড়ছে এবং সে ভিক্ষুধর্ম থেকে ক্রমশ চ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে সঙ্ঘ আর কি করতে পারে।

—বুঝেছি ভন্তে! অর্থাৎ সঙ্ঘের হাতে রাজশক্তি নেই যে সঙ্ঘের নিয়মকে অমান্য করবার মত অন্যায়কারীকে সে শাস্তি দেয় এবং নিয়ম মানতে বাধ্য করে।

ভিক্ষু হবার পর আমি নিয়ম করে নিলাম শুধু ভিক্ষা করেই জীবনধারণ করব। প্রথম দিন যখন কষায় চীবর পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে করে প্রথম ঘরের সামনে দাঁড়ালাম, তখন আমার ভীষণ সঙ্কোচ হচ্ছিল। জীবনে ভিক্ষা করবার কথা কখনও কল্পনাও করিনি। আমার আগে আগে ভদন্ত সুমন চলেছেন।

আমি তাঁর পিছনে পিছনে চলেছি, যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে কেউ।

প্রথম এক ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে সেখানকার গৃহপত্নী আমার ভিক্ষাপাত্রে ভাত, মাছ, শাক প্রভৃতি দিয়ে মাথা নিচু করে বন্দনা করলেন। লজ্জায় আমারও মাথা নিচু হয়েছিল। তারপর লজ্জা সঙ্কোচ কেটে যেতে আরও কয়েক বাড়ী থেকে ভিক্ষাপাত্র ভর্তি করে বিহারে ফিরে এলাম। বিহারে এসে ভদন্ত সুমনের সামনে ভিক্ষাপাত্র রেখে দিতে তিনি আগে রোগী ও বৃদ্ধ ভিক্ষুদের অন্ন পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সকলের ভিক্ষালব্ধ অন্ন সকলে মিলে ভাগ করে খেলাম। খাবার সকলের মধ্যে সমবিতরণের নিয়মটা আমার খুব ভাল লাগল।

এমনি প্রায় এক মাস কাটল। এমন সময় পাটলিপুত্রের এক সার্থবাহের কাছে সংবাদ পেলাম, মহাদেবীর দেহান্ত হয়েছে। অজ্জুকার মৃত্যু সংবাদে আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়লাম। মনকে প্রবোধ দিতে চাইলাম। চেষ্টা করলাম, কিন্তু চোখের জলকে কোনমতেই বাধা দিতে পারলাম না। এমন অবস্থায় ভিক্ষুদের সামনে যাওয়া আমার পক্ষে মুশকিল হয়ে দাঁড়ালো। অগত্যা সঙ্ঘ মহানায়কের আজ্ঞা নিয়ে আমি চৈত্য পর্বতে (মিহিতলে) চলে এলাম। অনুরাধাপুর থেকে প্রায় এক যোজন দূরে এই পর্বতে অশোক পুত্র ভিক্ষু মহেন্দ্র থাকতেন। আজ যদিও শত শত ভিক্ষুদের আবাসের জন্যে এটা আর নির্জন নেই, তবুও একান্ত-প্রেমী ভিক্ষুদের জন্যে অভয়গিরি বিহারের চেয়ে অনেকটা নিরালা। আমি পূর্বাহ্নে একবার কিছুক্ষণের জন্যে বাইরে বেরুতাম ভিক্ষার জন্যে। তারপর সারাক্ষণ আমার লেনা (গুহা)তে সময় কাটাতাম। অন্যান্য ভিক্ষুরা মনে করত আমি হয়ত একান্তে যোগ-ধ্যান অভ্যাস করি। কিন্তু আমি যতক্ষণ ওখানে থাকতাম আমার চোখের জলকে কিছুতেই রোধ করতে পারতাম না।

মায়ের কথা আমার মনে নেই, থাকবার কথাও নয়। পিতার

দেহান্ত হলে আমি খুব মানসিক আঘাত পাই, কিন্তু একমাত্র অজ্জুকার স্নেহে সব ভুলে ছিলাম। তার গর্ভে থাকিনি শুধু, তাছাড়া আর সকল দিক দিয়ে তিনি মায়েরও বেশী ছিলেন। একমাত্র ভ্রাতা আমি, আমার চেয়ে আপনজন তাঁর কেউ ছিল না। আমার চেয়ে বেশী তাঁর নিজের সন্তানকেও স্নেহ করতেন না। আমার যখনই মনে হত আর অজ্জুকাকে দেখতে পাবো না, তখন আমি ছোট শিশুটির মত কাঁদতাম। এমনি একমাস এখানেও কাটল। আবার অনুরাধাপুর ফিরে এলাম।

আমি যখন অনুরাধাপুরে ফিরে এলাম তখন আমার মস্তক মুণ্ডিত, ছেঁড়া কাপড়ের ও বিশ্রী রংয়ের চীবর পরনে, নগ্নপদ প্রভৃতি মানুষের রূপকে বিকৃত করবার রকমারী প্রচেষ্টা, কিন্তু তবুও রূপ যেন ঢাকা পড়বার নয়। এই সকল চেষ্টা যেন আমার যৌবন ও সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে দিল শতগুণে। আমি যে সময় পাড়ায় ভিক্ষা করতে যেতাম, সেখানে আরও কয়েকজন ভিক্ষু যেত। কিন্তু আমি ভিক্ষাশেষে ফিরে এসে দেখতাম আমার পাত্রে নানাপ্রকার সুস্বাদু খাদ্য সামগ্রী উপচে পড়ছে যা আর কেউ পেত না। আমার পাত্রে ঘি ও মসলা সহযোগে রান্না করা শূকরের মাংস, মোদক, অপূপ (মালপেয়ো) প্রভৃতি নানারকম সুস্বাদু খাবার, আর সকলের পাত্রে শুধু শাক-অন্ন। আমি আশ্চর্য ও লজ্জিত হয়ে পরদিন অন্য পাড়ায় ভিক্ষায় যেতাম; সেখানেও ঐ এক অবস্থা। এমনি করে রোজই নতুন নতুন জায়গায় যেতাম, কিন্তু সে আর কতদিন চলে। আবাসস্থানের একটা সীমা আছে, অগত্যা ঘুরে ফিরে আবার পুরানো জায়গায় আসতে হত বাধ্য হয়ে।

পরের বৎসর শেষ হতে না হতে সিংহল ত্যাগ করলাম। ইতি-মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগুপ্তকে হত্যা করে চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসন অধিকার করেছে।

চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণের সংবাদে আমি বেশ কিছুটা বিচলিত হয়ে ছিলাম। কারণ শৈশব থেকে চন্দ্রগুপ্তের স্বভাব চরিত্রের সঙ্গে আমি বিশেষ পরিচিত। বার বার চন্দ্রগুপ্তের কথা আমার মনে পড়তে লাগল। চন্দ্র বলত সে মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্যের অনুগামী হবে। তার প্রথম প্রমাণ পেলাম রাজগুপ্তকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করবার সংবাদে। রামগুপ্তকে হত্যা করে তার স্ত্রী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেছে চন্দ্র। আর এই সকল ঘটনার পিছনে যে নাটক অভিনীত হয়েছে, সে সম্বন্ধে নানাপ্রকার অতিরঞ্জিত সংবাদ শুনেছিলাম অনুরাধাপুরে। ধ্রুবদেবীকে আমি দেখিনি। আমি যখন পাটলিপুত্র ছেড়ে এসেছিলাম, তখনও ঐ নামের কোন রাজকন্যার সঙ্গে রামগুপ্তের বিবাহের খবর জানতাম না। বিদেশে বসে ধ্রুবদেবীর রূপের যা বর্ণনা শুনতাম তাতে আশ্চর্য হবারই কথা। কেউ বলতো ধ্রুবস্বামিনী নাগকন্যা, কেউ বলতো গন্ধর্ব বা অপ্সরা। রম্ভা, তিলোত্তমা, উর্বসীর চেয়েও নাকি রূপসী সে। যাই হোক কিছুদিনের মধ্যেই যখন স্বয়ং পাটলিপুত্রে যাচ্ছি তখন নিজের চোখেই দেখতে পাবো।

আগেই বলেছি যে ভিক্ষু বেশ আমার সৌন্দর্যকে এতটুকু কমাতে পারে নি, বরং বাড়িয়েছে। যেখানেই ভিক্ষায় গেছি সেখানেই দেখেছি ভিক্ষাদাত্রী সকলেই তরুণী। শুধু তরুণী বল্লে তাদের খর্ব করা হয়। সকলেই আশ্চর্য সুন্দরী যাদের রূপের খ্যাতি বহু প্রচলিত ও বহু প্রশংসিত। যতখানি সম্ভব মাথা নীচু করে এবং সম্ভ্রমের দূরত্ব বজায় রেখে আমি ভিক্ষা গ্রহণ করতাম। কিন্তু অন্যের দৃষ্টিকে বাধা দেবার শক্তি আমার ছিল না। দৈবাৎ দৃষ্টির সজ্ঘর্ষ হত। তাদের মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে কামনার শিখা জ্বলছে। তাদের পুষ্পিত দেহ নির্লজ্জ চাঞ্চল্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

পণ্ডিত বলে আমার খ্যাতি ছিল। অনুরাধাপুরের রাজঅন্তঃপুর থেকে নগরীর সকল চৈত্যে, বিহারে এমন কি প্রতি চৌরাস্তায় চৌরাস্তায় সপ্তাহের কোন না কোনদিন ধর্মসভা বসত যেখানে

তথাগতের ধর্মোপদেশ শেখান হোত। সঙ্ঘের তরফ থেকে ধর্মোপদেশ শোনাবার ভার পড়ত আমার উপর এবং আমাকে নিয়মিতভাবে উপদেষ্টার আসনে গিয়ে বসতে হত। অন্তঃপুরে যাবার জন্যেও আমার ওপর আদেশ হয়েছিল, কিন্তু আমি কৌশলে অন্তঃপুরের পরিবর্তে অন্য এক ধর্মশালার জন্যে অনুমতি নিলাম। কোনও এক সময় এই ধর্মশালাটি শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদের একটি চবুতরা ছিল, কিন্তু আজ অনুরাধাপুরের সবচেয়ে সুন্দর ধর্মশালায় পরিণত হয়েছে। সুন্দর সুন্দর মুর্তি উৎকীর্ণ করা রয়েছে থামগুলোতে, সুবর্ণ রঞ্জিত তামার ছাদ, সুবর্ণ জড়িত চন্দন কাঠের ধর্মাসন। উপদেশের সময় এই ধর্মাসনের ওপর মহার্ঘ আস্তরণ এবং ওপরে রত্নজড়িত ঝালরওয়ালা রেশমী চাঁদোয়া টাঙানো হোতো। রাত্রির প্রথম যাম থেকে শুরু হোত এবং কখনও অন্তিম যাম পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলতো। প্রায়ই এক এক যাম পর্যন্ত এই ধর্মাসনে বসে আমাকে উপদেশ দিতে হোত। উপদেশগুলির সবটুকুই মুখস্থ বুলি। কখনও কখনও তার সঙ্গে আমার নিজের আদর্শ ও বিচার আমি প্রকাশ করতাম। আমি লক্ষ্য করতাম সেই সময়ে সকল প্রৌঢ়া শেঠানী এবং শ্রেষ্ঠী কুমারীরা আমার উপদেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনছে। শ্রোতাদের কাউকে কখনও অধৈর্য হতে দেখিনি, অন্যান্য উপদেশগৃহে আমি দেখেছি উপদেশ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই বেশীর ভাগ শ্রোতারা হয় ঘুমিয়ে পড়ত নতুবা উঠে যাবার জন্যে ব্যস্ত হোত। নিজের সাফল্যে আমি আনন্দিত হতাম।

এখানে যে-সব স্ত্রীরা আসত তারা সকলেই উপোসথ ব্রত নিয়ে আসত, যে জন্যে তারা কেউই অধিক আভূষণ-শৃঙ্গার করে আসত না, কিন্তু নিসর্গ সুন্দরীদের তাতে সৌন্দর্যের কোন হানি হোত না। শেঠানীদের অধিকাংশই গৌরবর্ণা। তার মধ্যে যবনদের মত মহাশ্বেতার সংখ্যাও কম ছিল না। যদিও উপোসথ ব্রতের জন্যে শরীরের ঊর্ধ্বভাগ উত্তরাসঙ্গ (চাদর) দিয়ে ঢাকা থাকত, কিন্তু তরুণী কুমারীরা অনেকে তা করত না। উপদেশের সময় উপদেষ্টা

শ্রোতাদের ওপর সব সময় দৃষ্টি রাখতে পারে না, কোন একটি বিশেষ স্থানে তার দৃষ্টি বিশ্রাম নিতে চায়, বয়স্ক এবং অভ্যস্ত উপদেশকরা উপদেশের সময় তাদের অর্ধ নিমীলিত চোখের দৃষ্টি সামনে এবং দূরের বস্তুর দিকে নিবদ্ধ রাখেন। আমি উপদেশের সময় আমার ডানদিকে একটি থামের উপরে আমার দৃষ্টি রাখতাম। আমার বিশ্বাস ছিল, এখানে নিত্য নতুন শ্রোতারা আসেন। কিন্তু আমি সেই থামের নিচে প্রত্যহ অপূর্ব একটি মূর্তিকে উপবিষ্ট দেখতাম। যতক্ষণ আমি উপদেশ দিতাম ততক্ষণ আমি লক্ষ্য করতাম সেই পরিচিত মুখটি অনিমেষ লোচনে আমার দিকে চেয়ে আছে।

সে এক অলোকসুন্দর রূপসী তরুণী। তার চিকণ গৌর মুখের উপর ঘনকৃষ্ণ চিকুর-দাম মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত। নিপুণ তুলিতে আঁকা ধনুকের মত তার ভ্রূযুগল। সুডৌল আননে বিশাল মৃগনেত্র, পাতলা অধর, স্ফটিক স্বচ্ছ কপোল তার সৌন্দর্য সুষমাকে অতুলনীয় করে তুলেছে। তরুণীটির বয়স বিশ বছরের কাছাকাছি হবে। সাত-আট দিন দেখবার পর আমার মনে হোল সত্যিই তরুণী আমার উপদেশের একজন মর্মজ্ঞানী শ্রোত্রী।

প্রতি অষ্টমী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে উপোস ব্রত গ্রহণ, পূজা এবং ত্রি-শরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘের শরণ) গ্রহণ করবার জন্যে বিহারে যাওয়া প্রতি গৃহস্থর কর্তব্য। সেই তরুণী, অনুরাধাপুরের এক সম্ভ্রান্ত সার্থবাহের পত্নী। যেদিন বিহারে আসত নিষ্ঠার সঙ্গে পূজার উপকরণের সঙ্গে নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনত। আমার উপর তার অতিশয় ভক্তি লক্ষ্য করতাম। আমি এবং অন্যান্য ভিক্ষুরা তার এই ভক্তিভাবকে স্বাভাবিক ভাবেই দেখতাম অর্থাৎ ধর্মকথিক ভিক্ষু জয়ের প্রতি এক উপাসিকার (বৌদ্ধ নারী) স্বাভাবিক শ্রদ্ধা, বিজ্ঞ ধর্মকথিকদের প্রতি সংকার-সম্মান হওয়া স্বাভাবিক।

কয়েক মাস পর একদিন সার্থবাহ পত্নীর দাসী এসে গৃহস্বামীনির অসুস্থতার সংবাদ দিল আমাকে। দাসী বললো,—ভন্তে উপাসিকা খুব অসুস্থ। তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন, পরিত্রাণ (বুদ্ধসূত্র পাঠ)

এবং উপদেশ দানের জন্যে আপনাকে এবং আরও চারজন ভিক্ষুকে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে।

আমি বিহার-মহানায়কের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আর চারজন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে সার্থবাহের গৃহে পৌঁছলাম। যথাবিধি মঙ্গলকলস স্থাপন করে আমাদের বসবার জায়গা করে দেওয়া হল। আমরা উপাসিকার ঘরে সুতো টাঙ্গিয়ে বুদ্ধ-সূত্র পাঠ করলাম। এমনি রোজই পাঠ চলতে লাগল। তিন-চার দিন পরে উপাসিকা জানাল 'তার অবস্থা অনেকটা ভাল', অতএব পরিত্রাণ-দেশনা একমাস পর্যন্ত চালাবার মনস্থ করল। আমাদের কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে গৃহস্বামিনীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সদাজাগ্রত। মৎস-মাংস এবং নানাপ্রকার ব্যঞ্জন সহযোগে খাবার ব্যবস্থা। উপাসিকা নিজ হাতে আমাদের খাবার পরিবেশন করতো। প্রায় অর্ধরাত্রি পর্যন্ত আমরা পাঠ করতাম, তারপর বিহারে ফিরে যেতাম। আবার পরদিন সকালে এসে পাঠ শুরু করতাম। উপাসিকার প্রশ্ন শুনে আমরা বুঝতে পারলাম সে রীতিমত বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা মহিলা। বৌদ্ধ-সূত্র তার কণ্ঠস্থ। কখনও কখনও প্রতীত্ব সমুৎপাদ (একের শেষ হওয়ার পর দ্বিতীয়ের উৎপত্তি), অনাত্মবাদ (আত্মা নাই এমন সিদ্ধান্ত), নির্বাণ প্রভৃতি বিষয়ক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতো। এ সকল বিষয়ে আমার পূর্বেকার শিক্ষা বা বিচারের কোনও পরিবর্তন হয়নি, তবুও ভিক্ষু হিসেবে আমাকে জবাব দিতে হত।

উপাসিকা একদিন প্রশ্ন করল,—ভন্তে! সংসারময় লোকের মুখে শুধু দুঃখ, দুঃখ শব্দটাই বেশী শোনা যায়। এই পৃথিবীতে একমাত্র দুঃখ ছাড়া কী আর কিছু নেই?

—উপাসিকা! একসময়ে ভগবান নিজে বলেছিলেন যে, এই জীবন যদি শুধুই দুঃখময় হত, তাহলে মানুষের মন থেকে বাঁচার প্রবৃত্তি উঠে যেত।

আমার মন্তব্যে উপাসিকার চোখ-মুখ প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

—ভন্তে! অন্য ভিক্ষু হলে এই সকল প্রশ্নের অনুমতিও দিতেন

না। আপনি জম্বুদ্বীপের (ভারত) ভদন্ত হয়ে আমার প্রশ্নের এমন সমাধান করলেন। আপনার আন্তরিকতার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

—কারো প্রশ্নে বাধা দেওয়া উচিত নয় উপাসিকা। বুদ্ধের ধর্ম, মূঢ়-শ্রদ্ধার ধর্ম নয়।

ক্রমশ উপাসিকার ভক্তি-শ্রদ্ধা বাড়তে লাগল। সার্থবাহ সামুদ্রিক বাণিজ্যে নিপুণ ছিলেন। ব্যবসা করে কী উপায়ে দীনার সঞ্চয় করতে হয় তা তিনি ভালভাবে জানেন, কিন্তু অন্য সকল বিষয়ে তিনি একেবারে অজ্ঞ। স্ত্রীর অনুরোধে প্রায়ই আমার কাছে আসতেন তিনি। বেশীর ভাগ সময়ই ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা করতেন এবং প্রশ্ন করতেন। তার ব্যবহারে মনে হত আমাকে তিনি রীতিমত জ্ঞানী এবং যোগাচার্য বলে ভাবেন। উপাসিকা স্বার্থবাহ মহলে নিজের জ্ঞানবুদ্ধির জন্য শ্রদ্ধার পাত্রী। নিজের স্বামীর কাছে আরও বেশী। এমন কি রাজ-অন্তঃপুরের কয়েকজন রাণীও স্বার্থবাহ পত্নীকে শ্রদ্ধা করতেন। পরিণামে এই হল যে, এক বৎসর যেতে না যেতেই আমি অনুরাধাপুরের সবচেয়ে গণ্যমান্য ভিক্ষুদের একজন বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করলাম। চীবর এবং অন্যান্য সামগ্রীর পাহাড় জমে যেত কোনও সময়। অগত্যা সেগুলিকে সঙ্ঘের ভাণ্ডারে পৌঁছে দিয়ে নিজেকে হাল্কা করতে হত। একদিন সার্থবাহ পত্নী চীনাংশুকের বহুমুল্য একখানি চীবর নিয়ে এলো। সেটি আমার হাতে দিয়ে করজোড়ে বললো,—ভন্তে, আজই চীনদেশ থেকে এই বহুমূল্য চীনাংশুক এসে পৌঁছেচে। আমি উপাসকের কাছ থেকে চেয়ে, নিজের হাতে সেলাই করে এনেছি, কৃপা করে এটি গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন।

আমি বল্লাম—উপাসিকা! আমি পাংশুকুলিক হয়ে থাকতে চাই, তাই তো রাস্তার ছেঁড়া ফাটা কাপড়ের টুকরো সেলাই করে নিজের চীবর তৈরী করে নিই। এত মুল্যবান জিনিসে আমার কোনও আগ্রহই নেই।

উপাসিকা বার বার অনুরোধ করতে লাগলো। যখন কোনমতেই

আমি রাজী হলামনা, তখন শেষবারের মত অনুরোধ করল—অন্ততঃ একটি বার আপনি এটিকে পরিধান করুন, কিছুক্ষণের জন্য আমি দেখি। দয়া করে এতটুকু প্রার্থনা মঞ্জুর করুন।

আমি উপাসিকার মনে আঘাত দিতে পারলুম না। অগত্যা চীবরটি নিয়ে পাশের ঘর থেকে পরে উপাসিকার সামনে এসে দাঁড়ালাম। বিস্ফারিত নেত্রে আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার দুনয়নে আনন্দের অশ্রু, অথচ মুখাবয়বে প্রসন্নতার ঝিলিক।

—ভন্তে, আর আমি কিছু চাই না, আমার নয়ন সার্থক হয়েছে। মনে বড় সাধ হয়েছিল ভগবানকে এই চীবর ধারণ করিয়ে নয়ন ভরে দেখবো। আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

আমার কাছে অস্বস্তিকর হলেও, ভক্তের কাছে এটা একান্ত স্বাভাবিক। আমি কখনও নতুন চীবর পরতে রাজী হইনি, কিন্তু উপাসিকা ধীরে ধীরে আমাকে এ-সবে অভ্যস্ত করাতে লাগল। সঙ্ঘের কাছে ও নিজে আবেদন করে অনুমতি নিল, যে আমি নিয়মিত ওর বাড়ীতে অন্ন গ্রহণ করব। আমার প্রবল অনিচ্ছাসত্ত্বেও সঙ্ঘের ইচ্ছাকে সম্মান করতে হল। সঙ্ঘকে ও এত বেশী দান করতে আরম্ভ করেছিল যে ওর কোন আবেদনই সঙ্ঘ অস্বীকার করত না, উপরন্তু আমাকে সকলে বলত "শ্রদ্ধাপ্রসন্ন উপাসিকার মনে আঘাত করলে সঙ্ঘের মোটা আয়ে ব্যাঘাত হবে।" আমি জানতাম সঙ্ঘের আয়ে ব্যাঘাত করা ভিক্ষুদের পক্ষে মহাপাপ। নিজের ভোজনের নিমন্ত্রনকে স্বীকার না করলে সঙ্ঘের আয়ের হানি হয় কি না তা নিয়ে তর্ক না করে আমি তারপর থেকে প্রত্যহই মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য উপাসিকার বাড়ীতে যেতাম।

এর পূর্বে উপাসিকার ভক্তিভাবের মধ্যে অন্য কোন ভাবের আভাষ পাইনি। উপাসিকা নিঃসন্দেহ একজন বুদ্ধিমতী ধর্মকামী নারী। সে যেমন আমার বিদ্যা এবং প্রতিভার প্রতি অনুরক্ত হয়েছিল, তেমনি আমার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা এবং নিস্পৃহতা তাকে

প্রচণ্ড আকর্ষণ করেছিল। আমাকে আহার পরিবেশণ করে একাগ্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকত। আমি বুঝতেও পারিনি যে অলক্ষ্যে তার সেই ভক্তিভাব এক মধুরভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আমি ওর অদ্ভুত সংযম শক্তির প্রশংসা করতে বাধ্য। সবচেয়ে আশ্চর্য হতাম তার বাক সংযমে। সে স্বল্পভাষিণী। শুধু অনুরাধাপুরে নয়, সমস্ত সিংহলে কখনও শীত পড়ে না। একমাত্র বর্ষাকালে গরম কিছুটা কম থাকে, বাকী সকল সময়ে গরম। তাই আমি খেতে বসলে সারাক্ষণ আমাকে সে ব্যজন করতো এবং স্থির নয়নে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো। ওর দিকে তাকাতে আমারও কোন সঙ্কোচ ছিল না। ওর চোখের অতলে এক বিশেষ ধরণের অন্তর্লীন সৌন্দর্য লক্ষ্য করতাম। ভাবতাম ধর্মপ্রাণ বলেই ওর দৃষ্টিতে এত ঐশী ঐশ্বর্য।

সার্থবাহ তখন চম্পক দ্বীপে বাণিজ্য করতে গেছেন। আমি নিত্য মধ্যাহ্ন ভোজন করতে যাই। সেদিন খাওয়ার শেষে উপাসিকা আমাকে বিশ্রাম করে যেতে অনুরোধ করল। এমনি আরও দু-চার দিন অনুরোধ করেছে, আমিও বিশ্রাম করে গেছি। তখন দাস-দাসীরা ব্যজন করতো আমাকে গৃহস্বামিনীর আদেশে। আজ তার ব্যতিক্রম দেখলাম। উপাসিকা নিজে পাখা হাতে কাছে এসে বসল। আমি ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। ওর চোখের কোণে জল, বিষণ্ণ মুখ দেখে জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার ম্লান মুখে অশ্রু কেন উপাসিকা?

—ভন্তে! মাসাধিককাল আমি এক দুঃসহ অন্তর্বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি। আমি নিজেকে অনেক প্রকারে সংযত রাখার চেষ্টা করেছি ভন্তে। স্ত্রীজাতির প্রেম পুরুষের চেয়ে অনেক প্রবল ও প্রখর। সঙ্কোচ সেই অনুপাতে আরও বেশী। জানিনা কবে এর জন্ম হলো, কিন্তু এই দু-তিন মাস থেকে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। আপনার প্রেমে আমি অভিসারিকা। আপনি ছাড়া আর আমার গতি নেই।

আশ্চর্য হবারই কথা। যোগ-বৈরাগ্য, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে আমি সিদ্ধপুরুষ নই। কিন্তু আমার জীবনে নিজস্ব একটা আদর্শ ছিল। স্বকীয়তা ছিল। সুন্দরীর কটাক্ষ আমার শরীরে রোমাঞ্চ জাগায় না এমন নয়। তাদের প্রেম নিবেদন জীবনের সম্পদ মনে হয়। আমি কামজয়ী মহাপুরুষ নই। তবু আমি আদর্শ ভ্রষ্ট হতে চাই না। আমার আদর্শের কোন গোপন সত্তা নেই। কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে আমি বললাম,—ভদ্রে! আমি যোগ-বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য-নির্বাণের প্রতি হয়তো আস্থাবান নই। আমি এও মানি না যে আমার কর্মফল বিচারকর্তা অর্থাৎ ভগবানরূপী এক অদৃশ্য মহাশক্তি আমাকে চালনা করছেন এবং সব কিছু দেখছেন। এও বিশ্বাস করি না যে মরবার পরে আমাকে আবার জন্ম নিতে হবে। তবুও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার প্রেম করবার অধিকার নেই।

আমার প্রথম কথাগুলি শুনতে শুনতে উপাসিকার চোখের জল শুকিয়ে এসেছিল, মুখে খানিকটা প্রসন্ন ভাব ফুটে উঠেছিল। কিন্তু শেষ কথা শুনেই নিরাশায় মুখ বিবর্ণ ও পাংশু হয়ে গেল। মাথা নিচু করে ধীর স্বরে বললো উপাসিকা,

—ভদ্র! আমি যা কিছু করি নিজে বুঝে শুনে বিচার করে করি, এবং আমার বিশ্বাস আজ পর্যন্ত আমি কোনও ভুল বা অন্যায় করিনি। সমাজের সদাচারকে আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এসেছি। কিন্তু জানেন আমার বয়স কত?

—চেহারা দেখে বলতে গেলে পনের, ষোল বলা যায়, কিন্তু তোমার জ্ঞান বুদ্ধি অনুপাতে কুড়িও বলা যেতে পারে।

—না, আমার বয়স পঁচিশ বছর। আমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত?

—সর্বদেশের ও সর্বকালের শ্রেষ্ঠা সুন্দরীদের মধ্যে স্থান দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে।

—ভদ্র! মরুকচ্ছ নগরীতে একাধিক সুন্দরী শক বা যবন কুমারী আছে কিন্তু নগরীর শ্রেষ্ঠা সুন্দরী বলে আমার খ্যাতি ছিল।

আমার পিতা সেখানকার একজন সাধারণ শ্রেষ্ঠী। আমার সার্থবাহ স্বামীরও সেখানে কারবার ছিল। তিনি স্বেচ্ছায় আমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব করেন এবং আমার পিতা সম্মত হন। বিবাহের ব্যাপারে যদিও কন্যার মতামতের কোনও মূল্য নেই তবুও আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমিও সম্মতি দিতাম। বয়সে আমার চেয়ে তের চৌদ্দ বছরের বড় হলেও তিনি সুন্দর স্বাস্থ্য ও অগাধ ধন-ঐশ্বর্যের অধিকারী। আমি তখন সতের বছরে পা দিয়েছি। বিবাহের পর পতীর গৃহে এসে দেখলাম চারিদিকে লক্ষ্মীর অজস্র দান। আমার কল্পনার চেয়েও বেশী সুখ সম্পদ পেলাম কিন্তু দাম্পত্য জীবনের যা কাম্য সেই পতিসুখ থেকে আমি চিরবঞ্চিতা।

—কেন তোমার পতি তো বর্তমান।

—হ্যাঁ, তাঁর আচার-ব্যবহারে কোন ত্রুটি পাইনি। প্রথম প্রথম তাঁর কথায় আমি জানতাম যে তিনি কোন ব্রত উপলক্ষে রত আছেন। পরে তিনি বলেছিলেন কোনও মহাপুরুষের কথামত অপুত্রযোগ দূর করবার জন্য তিনি স্ত্রী-সঙ্গ কিছুকালের জন্য বন্ধ রেখেছেন। এমনি বহুদিন তিনি আমাকে ভ্রমে রেখেছিলেন। এমনি করেই আমার দিন কাটছিল। আমার স্বামীর দুই-তিনজন তরুণ বন্ধু ছিলেন যারা প্রায়ই এ বাড়ীতে আসা যাওয়া করত। সার্থবাহ বিদেশে বাণিজ্যে গেলেও তারা আসত। অবশ্য আমার স্বামীর অনুমতি নিয়েই তারা আসত। প্রায়ই তারা এসে আমাকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করত, আমিও মাঝে মাঝে দু-একটা গান গাইতাম। কখনও পানাহারে তাদের আপ্যায়িত করতাম। আমি নিঃসঙ্কোচে তাদের সামনে সুরার-কুতুপ এগিয়ে দিতাম। তাদের মধ্যে একজন তরুণ খুব সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান ছিল। তার চোখে অন্য দৃষ্টি দেখলাম, এবং একদিন প্রকাশ্যে সে আমাকে ভোগ করবার বাসনা জানাল। আমার স্বামী তখন বিদেশে, মনে করলাম তিনি আসা অবধি চুপ করে থাকি। সেই দিনই তাদের বিদায় করে দিলাম বাড়ী থেকে। কিছুদিন পর আমার স্বামী ফিরে এলে

তাঁর বন্ধুদের দুর্বিনীত আচরণের কথা বললাম। তিনি আমার কথা শুনে ক্রোধের পরিবর্তে হেসে ফেললেন।

—কেমনতর স্বামী সে? আমি উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—হ্যাঁ ভন্তে! তারপর আমি যখন খুব রেগে গেলাম তার ব্যবহারে, তখন তিনি হেসে কি বললেন জানেন?

—কী?

—বললেন, সুন্দরী আমি তোমাকে বিবাহ করেছি আমার বংশ-রক্ষার জন্য। নইলে আমার এই কোটি কোটি দীনার সম্পত্তি সকলই রাজার হাতে চলে যাবে।

আমি আরও চটে গিয়ে বললাম—বংশ রক্ষাই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয় তাহলে আমার কাছ থেকে দূরে দূরে পালিয়ে বেড়াও কেন? তখন তিনি স্পষ্ট বললেন—আমি পুরুষত্বহীন। একথা শুনে আমি প্রচণ্ড আঘাত পেলাম। ক্রোধে জ্ঞান হারালাম। ইচ্ছা হল গলা টিপে ওকে হত্যা করি। কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিলাম। এ অবস্থায় আমি রাজবিধান অনুযায়ী সার্থবাহকে ত্যাগ করে অন্য বিবাহ করতে পারতাম, কিন্তু আমার বিবেক তাতে সায় দিল না।

—তাহলে সত্যিই ভালো করতে।

—ভালো না হলেও অন্যায় করতাম না। কিন্তু ভিক্ষুণী জীবনকে আমি খুবই শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম। ভাবলাম এমনি করেই বাকী জীবনটা ভিক্ষুণী সেজে কাটিয়ে দেব। কিন্তু—

আমি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার পানে চাইলাম। সে বললো, কিন্তু আজ আর সে শক্তি নেই আমার। যেদিন উপদেশগৃহে আপনাকে প্রথম দেখলাম, সেইদিন থেকে বার বার আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করত। তাই প্রতিদিন আপনাকে দর্শন করতে যেতাম। তখন এই আকাঙ্ক্ষাকে আধ্যাত্মিক অনুরাগ ভাবতাম। মনে ছিল না কোন আবিলতা। কিন্তু এখন বুঝছি আগুনের মত এ প্রবৃত্তিকে চিরদিন চাপা দিয়ে রাখা চলে না। একদিন সে শিখা বিস্তার করে জ্বলে উঠবেই।

—অর্থাৎ বেশিদিন আত্মবঞ্চনা করা চলে না।

—ঠিক বলেছেন। আমিও পারিনি। আপনাকে দেখবার পর থেকে আমার মনের ধূমায়িত কামনাবহ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। বহু চেষ্টা করেও তাকে চাপা দিয়ে রাখতে পারলাম না। আমার এ অন্তর্দ্বন্দ্ব হয়তো আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন। সেদিন চীনাংশুকের চীবর-পরা আপনার নবরূপ আমার সংযমের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। আমি নিজেকে উৎসর্গ করবার জন্য অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিলাম বোধ হয় আপনি বুঝতে পেরেছিলেন।

—না উপাসিকা, আমি বুঝতে চেষ্টা করিনি। তোমাকে আমি নিষ্ঠাবতী সাধিকার চোখেই দেখেছি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবার জন্যই আমি তোমার চীবর পরিধান করেছিলাম। তোমাকে লুব্ধ করবার জন্য নয়।

—তাহলে আপনি আমাকে এখন পতিতা বলে মনে করেন ?

—না, আমি কোনও নারীকেই পতিতা ভাবি না। বরং পুরুষদের আমি পতিত মনে করি।

—পুরুষদের প্রতি আপনার এই মনোভাবের কারণ ?

—নারীর উপর পুরুষের নির্মম স্বেচ্ছাচারিতা আমাকে এই মনোভাব দিয়েছে। পুরুষ নিজেকে নারীর বিধাতা মনে করে। তোমার সেই বিধাতা তোমার হাত-পা বেঁধে এই কারাগারে নিক্ষেপ করেছে।

—পুরুষই আমার এই দুর্দশার জন্যে দায়ী।

—প্রাচীন নিয়মানুযায়ী তুমি ঐ নপুংসক স্বামীকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে স্বচ্ছন্দে বিবাহ করতে পারতে। কিন্তু তোমার জীবনের এই আট বৎসর নীরবে তুমি, ঐ পুরুষের পত্নীত্ব স্বীকার করে এসেছো। নিজের সম্মান অক্ষত রেখেছো। প্রাণপণ চেষ্টা করেছো নিষ্কলুষ জীবনযাপন করবার। কামজয়ী হবার। তোমার এই দুশ্চর সাধনার কি কোন মূল্য নাই ?

—এই আট বৎসরের মধ্যে আজকের এই দুর্বলতা প্রকাশ করা

ছাড়া এমন কোনও কাজ করিনি যার জন্যে আমি লজ্জিত বোধ করতে পারি।

—আজিকার ঘটনাকে আমি দুর্বলতা বলিনা, ভদ্রে!

উপাসিকা দৈবাৎ আমার পাদুখানি নিজের কোলের উপর তুলে নিয়ে ভক্তিভরে আমাকে ডাকল—প্রিয়তম!

আমি ধীরে ধীরে আমার পা দুখানি সরিয়ে বললাম—সুমুখী। ব্যস্ত হয়োনা, আমার কথা শোনো। আমি বিবাহ-ব্যবস্থাকে বিশ্বাস করি না। আমার যতদূর জানা আছে, দেবকন্যাদের মত মানব-সমাজেও এককালে বিবাহ ব্যবস্থার প্রথা ছিল না। আগামী ভবিষ্যতেও আমি তেমনি দিনের আশা করি।

—অর্থাৎ মুক্তপ্রেম? চমকে উঠলো উপাসিকা।

—হ্যাঁ, মুক্তপ্রেমকে আমি অন্যায় মনে করি না।

—আপনি মুক্তপ্রেমকে স্বীকার করেন?

—হ্যাঁ, কিন্তু মুক্তপ্রেমের জন্য মুক্তসমাজ চাই। তাই আজকের এই বহুজনকে যেমন মুক্ত বলা যায়না, তেমনি মুক্তপ্রেমও এখানে অন্যায় বলে ধরে নিতে হবে।

—অন্যায়? কেন, রাজাদের প্রেম কী মুক্তপ্রেম নয়? তারা খুশীমত যে কোনও শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ সামন্ত পুরোহিতের পরিনীতা পত্নীকে একরাত্রের জন্য নিজের প্রেয়সীর মত ভোগ করতে পারে। তাতে কেউ অস্বীকার করে না।

—অস্বীকার করে না এই জন্যে যে তারা নিজেরা মুক্ত নয়। স্বীকার করলে ধনলাভ, পদলাভ। আর অস্বীকার করলেই সর্বনাশ। পর্দার অন্তরালে একথা চিরন্তন সত্য যে রাজা বা তার কৃপাপাত্রেরা কেউই বিবাহ বন্ধন মানে না। তাই বলে তাঁকে মুক্তপ্রেম বলা যায় না।

—তাহলে? উপাসিকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমার দিকে তাকাল।

—যদি মুক্তপ্রেমের যুগ হত, তাহলে আমি তোমাকে নিরাশ করতাম না।

—তাহলে আপনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন? পায়ে ঠেলে ফেলবেন অভাগীকে?

—পায়ে ঠেলবার কথা বলে নারী অপমানের অপবাদ দিওনা আমাকে।

—আমাকে নিরাশ করবেন না।

—উপাসিকা, আমি বাধ্য হচ্ছি তোমাকে নিরাশ করতে। তোমার আশা পূরণ করতে আমাকে গোপনে প্রেম করতে হবে, গোপনতা আমাদের মিলনের সব মাধুর্য নষ্ট করে দেবে।

—প্রিয়তম, আপনি এতক্ষণে নিশ্চয় আমাকে বুঝতে পারছেন, আমার প্রেম ক্ষণভোগ্য বিলাস নয় ভদ্র! আজও আমি নিষ্পাপ অনাহত কুমারী। আমি আপনার সঙ্গে যে কোনও দেশে যেতে রাজী। আমরণ আপনার সেবা করতে প্রস্তুত। আমাকে দয়া করুন। আমার প্রেমকে অপঘাত থেকে বাঁচান।

—তা হয়না উপাসিকা। তোমাকে নিয়ে গেলে অনুরাধাপুরে আমি কি রেখে যাব তা ভেবে দেখেছ? লোকে কি ভাববে আমাকে? আমার অনুরোধ তুমি আমাদের উভয়ের হিতের দিকটা বিবেচনা করে দেখ। আজ আমি চলি, ভয় নেই আমি তোমাকে ত্যাগ করে যাচ্ছি না। যতদিন অনুরাধাপুরে থাকবো আমি পূর্বের মতই তোমার কাছে আসব।

উপাসিকার কাছ থেকে বিষণ্ণ মনে বিদায় নিয়ে এলাম। এখানকার অন্যান্য ভিক্ষুরা এই ধরণের প্রেমকে দোষনীয় মনে করে না। এমন বহু ভিক্ষুণী আছে যারা নিজের নীরস জীবনকে সরস করে তোলবার জন্য এই পথ অবলম্বন করেছে। কিন্তু আমি তাদের একজন হতে চাই না। যদি প্রেম করতেই হয় তাহলে প্রকাশ্যে করবো। উপাসিকা আমার মনে অভ্রভেদী হয়ে উঠল।

তখনও উপাসিকা সমস্যার জট খুলতে পারিনি, এমন সময় সংবাদ পেলাম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছে। এবার যৌধেয় ভূমিতে আমার প্রকৃত প্রয়োজন হবে, অতএব যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগলাম।

॥ পনেরো ॥

মিত্রলাভ

সিংহল থেকে শুপার্ক যাওয়ার জাহাজে রওয়ানা হলাম। শুপার্ক অপরান্ত (আরব) সাগর তটে অবস্থিত। কোনও একসময়ে পূর্বে তাম্রলিপ্তর মতই পশ্চিমে শুপার্কই ছিল সবচেয়ে বড় বন্দর। এখন আর সে খ্যাতি নেই এ বন্দরের। শুপার্ক এখন বিদর্ভরাজ বাকাটক, পৃথ্বিসেনের রাজত্বের মধ্যে।

এখনও আমি নিজের প্রকৃত বেশ ধারণ করিনি। নানা চিন্তায় মন বিপর্যস্ত। এখানকার রাস্তায় ডাকাতের ভয় আছে শুনেছি, তাই জাহাজের মধ্যেই জানতে চেষ্টা করি কতদূর অবধি বাকাটক রাজত্বের সীমানা এবং তার প্রতাপ কেমন।

শুপার্ক থেকে উত্তর দিকে যেতে হবে আমাকে। এদিক দিয়ে আবার কোনও সুগম পথ নেই। অতএব এখানে আর দেরী না করে একদিন পরেই রওয়ানা হলাম উত্তর দিকে। তিন যোজন দক্ষিণে যাবার পর কনেরী নামক জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বিহারে গিয়ে পৌঁছলাম। এই বিহারে পঞ্চাশটিরও বেশী বড় বড় কুঠরী ও একটি সুবৃহৎ উপোসথ গৃহ। পাহাড় কেটে তৈরী এই বিহার। একমাত্র উপোসথ গৃহেই একসঙ্গে এক হাজারেরও বেশী লোক বসতে পারে। পাহাড় কেটে তৈরী এই বিশাল বিহারকে জড়িয়ে নানা দেশে নানা কিম্বদন্তী। কেউ বলে ময়দানব নিজে হাতে তৈরী করেছিল পাহাড় কেটে। নতুবা মানুষের সাধ্য কি অতবড় পাহাড়টাকে কাটতে পারে। এখানকার রাজারা ভিক্ষুদের খুব সম্মান করে থাকেন। শ্রেষ্ঠী সার্থবাহদেরও অগাধ ভক্তি এই বিহারের উপরে। তাদেরই দানে পাহাড় কেটে এত বড় বড় প্রাসাদ ও মহলের সৃষ্টি হয়েছে। চৈত্যশালার সামনে দাতাদের চারটি মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। দুটি পুরুষের আর দুটি নারীর।

এই চৈত্যশালার বয়স দু'শো বৎসরের বেশী হয়নি। এই রাজা ও রাণীদের এখানকার লোকেরা খুব ভাল করেই জানে। কিন্তু সেই কথাই সিংহল ও গান্ধারে পৌঁছে ময়দানব ও অসুরদের কথায় পরিণত হয়েছে।

এখানকার বিশেষ দ্রষ্টব্য হল, প্রতিটি গুহার নিচে জল মজুত রাখবার বিরাট জলাধার। বর্ষার সময় পাহাড়ের গা বেয়ে জল গড়িয়ে এই সকল চৌবাচ্চায় জমা হয়, আর সারা বছর সেই মধুর ও শীতল জলের উপর নির্ভর করে থাকে এখানকার অধিবাসীরা। এই রকম জলের ব্যবস্থা না থাকলে এখানে কোনও লোক বসবাস করতে পারতো না। নিচের শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীতে বারো মাস জল পাওয়া যায়না। এখানকার গুহার গায়ে নানাপ্রকার মূর্তি খুব চমৎকার। এখানকার ভিক্ষুরা বিদ্যা-প্রেম ও বিনয় অনুপানের জন্য সকল দেশে প্রসিদ্ধ।

কেউ বলেন, বোধিসত্ত্ব (পূর্বজন্মের বুদ্ধ) যিনি নাগকুমারের রূপে জন্মেছিলেন এবং অন্যের প্রাণরক্ষার জন্যে নিজের শরীরকে ভক্ষ হিসাবে গরুড়ের কাছে অর্পণ করেছিলেন। যেখানটায় তিনি শরীর দান করেছিলেন সে জায়গাটা এই পাহাড়ের আশেপাশে কোথাও।

সিংহলত্যাগ করার পর (ঝুমি) প্রতিষ্ঠান পৌঁছাতে পুরো দু'বছর সময় লেগেছে। এই সময়টা বাকাটক (বিদর্ভ রাজবংশ) এবং মহাক্ষত্রপ (মানবরাজ) শাসিত দেশগুলি ঘুরে ফিরে দেখতে লেগেছিল। বাকাটক এবং মহাক্ষত্রপ দুই রাজাকেই সমুদ্রগুপ্ত পরাস্ত করেছিলেন। মহাক্ষত্রপ রুদ্রসেন যুদ্ধক্ষেত্রেই নিহত হয়েছিলে, কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত তাদের রাজবংশকে উচ্ছেদ করেননি। তাঁর বৃদ্ধ বয়সে শাসন ব্যবস্থা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়েছিল এবং সেই সুযোগে বাকাটক আবার স্বতন্ত্রতা ঘোষণা করে রাজত্ব করছে। বাকাটক খুব বলশালী রাজ্য। নর্মদা থেকে কৃষ্ণা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাদের রাজ্যসীমা। তারও দক্ষিণে কাঞ্চীর পল্লবদের প্রবল প্রতাপ।

উত্তরাপথে (পাঞ্জাব) এখনও দেবপুত্রশাহী কুষাণ শাসন করছেন, পূর্বে গুপ্তরা শাসন করেছে, আর মালব গুজরাটে শক—মহাক্ষত্রপ। এই পাঁচটি মহাশক্তিশালী রাজাদের মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষে যৌধেয়রাই একমাত্র জাতি যারা এখনও গণশাসন প্রথা কায়েম রেখেছে।

চলার পথে অন্ধ্র রাজাদের সময়ের তৈরী অনেক গুহা বিহার দর্শন করলাম। সেই সকল গুহা বা বিহারের অনেকগুলিতে এখনও বাশিষ্টি পুত্র পুলুমারী (খৃঃ ১৫৪), যত্র, সাতকর্মী প্রভৃতি রাজাদের শিলালিপী রয়েছে। এই সকল কীর্তি খুব বেশী হলে পাঁচশ' বছরের কাছাকাছি। কিন্তু এরই মধ্যে দূর দূরান্তের লোকদের কাছে দেবতা বা অসুরদের তৈরী কীর্তির প্রবাদের রূপ নিয়েছে।

রাস্তায় উজ্জয়িনীতে পৌঁছে কয়েক মাস ছিলাম। শকরা এই নগরীটাকে সাজাতে এতটুকু কার্পণ্য করেনি। সমুদ্রগুপ্ত অবশ্য পূর্বে মহাক্ষত্রপদের বাধ্য করিয়েছিলেন তাঁর অধীনতা স্বীকার করতে, কিন্তু তাঁর বৃদ্ধকালে এই ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ স্বতন্ত্রতা ঘোষণা করেছিল। তারপর যখন চন্দ্রগুপ্ত দেবপুত্রশাহীকে হত্যা করে আবার গুপ্তবংশের রাজলক্ষ্মীকে প্রতিষ্ঠা করেছে, তখন থেকে এই মহাক্ষত্রপদের মনে ভয় ধরে গেছে। তাই তারা শুধু তাদের সেনাই নয় কোষ বৃদ্ধি করছে পুরাদমে, এবং তাদের প্রজাদের সর্বরকমে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছে।

মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের সময়ে অবন্তীপুরের অন্তঃপুর যেমন ছোট ছিল, তেমন আর কারও সময় ছিল না।

যৌধেয় ভূমিতে এখুনিই ফিরে যাওয়ার খুব তাড়া নেই আমার। আগে আমাকে দেখতে হবে প্রতিবেশী রাজ্যের আমাদের সম্বন্ধে কি মনোভাব, তাদের শক্তি, আর্থিক ও শাসন ব্যবস্থা প্রভৃতি।

পল্লব যৌধেয় ভূমি থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাদের কোনও সম্বন্ধও নেই। অতএব বাকী রাজ্যগুলির আভ্যন্তরিক ও পারিপার্শ্বিক আবহাওটা আমাকে দেখতে হবে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজনীতি থেকে দূরে থাকে। শতাব্দীর অনুভূতি দিয়ে তারা বুঝে নিয়েছে যে রাজবংশের চিরাচরিত উত্থান পতনের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগ রাখা সবদিক দিয়েই ক্ষতিকারক। তবে দেশদেশান্তরের ভিক্ষুদের ভ্রমণের অন্ত নেই। তাদের উদ্দেশ্য শুধু বৌদ্ধ বিহারগুলি পরিদর্শন করা। উজ্জয়িনীর যে বিহারে আমি থাকতাম সেখানে তুগার, কুস্তন (খাতন) পারস্য থেকে শুরু করে সিংহল, যবদ্বীব ও চীন দেশের ভিক্ষু এসে থাকতো। তাদের মধ্যে অনেক অধিকারচ্যুত রাজকুমারও ছিল। কিছু ছিল রাজনৈতিক শরণার্থী। নানা রাজ্যের গুপ্তচররা ভিক্ষুর বেশে এই সকল বিহারে বাস করতো। সিংহল ছাড়বার পর থেকে আমার শরীরের চীবরটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য ছিল। সিংহল বিহারের ভিক্ষু বলে সকলে আমাকে খুব সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতো। কারণ একমাত্র সিংহল বিহারের ভিক্ষুরাই বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে কঠিন নিয়ম গুলি পালন করে এবং অন্যান্য বিষয়ে তারা সকলেই উচ্চজ্ঞান সম্পন্ন। আমি কথা বলতাম কম, শুধু কান দুটিকে সজাগ রেখে সব কিছু লক্ষ্য করতাম। সকলে ভাবতো আমি দ্বীপান্তরীর ভিক্ষু, তাই আমার উপর গুপ্তচরদের দৃষ্টি পড়েনি কখনও। তাছাড়া বিদ্বান বলে ভিক্ষু জয়ের একটা খ্যাতি ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল ভিক্ষুমহলে। বসুবন্ধুর কাছ থেকে অর্জন করা বিদ্যা এখানে আমি প্রকাশ করলাম না, তাহলেও বিদ্যার জন্যেই আমি বেশী সম্মান পেতে লাগলাম এবং অনেক ভিক্ষুরা আমার বিনয় শিক্ষা করবার জন্য আসতে লাগল। তাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল মাধব সেন।

মাধব সেন মালবগণের ক্ষত্রিয় কুমার ছিল। যেমন সুস্থ ও বলিষ্ঠ চেহারা তেমনি প্রখর বুদ্ধির অধিকারী। তীব্র বৈরাগ্য সাধনার জন্য ও ভিক্ষু হয়েছিল এবং ওর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে তথাগতের সকল শিক্ষা সকল বিষয় ও নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে। ধীরে ধীরে মাধবের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় হলো।

ভিক্ষুসঙ্ঘ এবং তার বিনয়ের মধ্যে গণতন্ত্রের ছাপ রয়েছে বলেই

মাধব সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বাড়তে লাগল। একদিন মাধব সেন আমাকে প্রশ্ন করে বসল—ভাই জয়, প্রথম প্রথম গণতন্ত্রের বিশ্লেষণ করবার সময় মনে হত তুমি যেন নির্বানের মত কোনও লোকোত্তর-ব্যবস্থার পর্যায়ে গণতান্ত্রিক ব্যাখ্যা করছ। অথচ নিজের দেশের তুলনা একবারও শুনিনি। যৌধেয়গণের নামটি এমন তৎপরতার সঙ্গে চেপে যাওয়া সত্যিই প্রশংসনীয়। আমি মাধবকে একলা পেয়ে নিচুস্বরে বললাম—মাধব! তুমি ত জানো যে এই বিহারে শুধু ক্ষত্রপ বা বাকাটপ ভিক্ষুরাই বাস করে না। এই সব ভিক্ষুর ছদ্মবেশে এখানে দেবপুত্রশাহীরও গুপ্তচর সর্বদা লক্ষ্য করছে আমাকে। যার জন্যে আমাকে অনেকখানি সাবধানে কথা বলতে হয়। যদিও সকলে জানে যে একজনও যৌধেয় যতক্ষণ বেঁচে থাকবে ততক্ষণ যৌধেয় ভূমিতে গণতন্ত্র অটুট থাকবে।

—ঠিকই বলেছ তুমি। বৈরাগ্যের চিন্তায় আমার বুদ্ধি বিভ্রম ঘটেছিল। এখন বুঝতে পারছি যে মালব গণরাজ্যের পতনের একমাত্র মূল কারণ হল মালবীয় নেতাগণের স্বার্থান্ধতা এবং গণরাজ্যের উপর ঘোর সন্দেহ। বাস্তব জগতে বিতৃষ্ণা আসতেই আমি কোনও লোকোত্তর বস্তুর মধ্যে শান্তি খুজছিলাম।

—পায়রা যেমন বিড়ালের সামনে পড়লে বাঁচবার জন্য চেষ্টা না করে চোখ বুজে বসে থাকে। তেমনি করে চোখ বুজে মরা ভালো না বাঁচবার জন্য চেষ্টা করা ভাল?

—কিছু একটা করে মৃত্যুবরণ করাই ভালো।

অবন্তিপুরে একবৎসর বাস করে আমার লাভ হয়েছিল দুটি। একটি হল দেশের রাজনীতিক অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, অপরটি মাধবসেন।

চন্দ্রগুপ্তের মনের ইচ্ছা কিছু কিছু জানতে পারছিলাম। প্রথমে আর্যাবর্তে (যুক্ত প্রান্ত-বিহার) নিজের শক্তিকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তার প্রথম প্রচেষ্টা দেখেই প্রতিবেশী রাজ্য সকলেই বুঝতে পেরেছিল যে তার পরবর্তী পদক্ষেপ হবে বাইরের

সকল সামন্ত রাজাদের গ্রাস করা। আমার জানবার দরকার ছিল যৌধেয় সম্বন্ধে ওর মনোভাব। যার জন্যে ওর সঙ্গে একবার দেখা করা অবশ্য দরকার।

এবার আমার চলার পথের সাথী হল মাধব সেন। দুইজনের উদ্দেশ্য এক। এক বৎসরেরও কিছু বেশী একসঙ্গে থাকায় আমরা একে অন্যের অভিন্নহৃদয় হয়ে উঠেছিলাম। অবন্তীপুর থেকে আমরা কাকনাদবোট (সাঁচী) মহাবিহারে এলাম। এখানকার মহাবিহারের সুন্দর নির্মাণ কৌশল দেখে আমার শিল্পীমন আনন্দে ভরে গেল। শিল্পীরা মূর্তিকলার মাধ্যমে যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করতে চেয়েছে তার তুলনা হয়না। বিদিশা (মেলসা) এখান থেকে এমন কিছু দূর নয়, সেখানেও দন্তকারের অভাব নেই। কিন্তু পাঁচশো বৎসর আগে তাদের পুর্বপুরুষরা যে তোরণদ্বার তৈরী করে গেছেন তা আজ কেন, আরও পাঁচহাজার বছর পরেও তার মহিমা লুপ্ত হবে না। বিশেষ করে স্ত্রী-মূর্তি গঠনে এরা অতুলনীয়। এগুলি দেখলে আমার যবন শিল্পীদের কথা মনে পড়ে। মাধবসেন প্রশ্ন করলো—এই চৈত্য ভিক্ষুদের বিহার, নির্বাণ এবং বৈরাগ্যের প্রেরণা দেয়। কিন্তু স্ত্রী-মূর্তিগুলির এই বিলোল সৌন্দর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

—তোমার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় এরা পৃথিবী ছেড়ে শূন্যে উড়তে চায়, কিন্তু পার্থিব কামনা বাসনা এদের মাটিতে টেনে রাখে।

—এই সৌন্দর্যকে ওরা নির্বাণের চেয়েও শ্রেয়ঃ মনে করে। তা ছাড়া লক্ষ্য করে দেখ, সম্প্রতি মূর্তিগুলি তৈরী হয়েছে, তার মধ্যে নারীদেহের লাস্য ও মদিরতা ফুটে উঠেছে। কিন্তু পাঁচশো বছর আগে তৈরী ঐ মূর্তিগুলিতে একটা স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র্যভাব ফুটে রয়েছে।

—বেশ ভূষাতেও অনেক পার্থক্য লক্ষ্য করবার মত। সে সময়েও কি নারীরা উষ্ণীষ ব্যবহার করতো?

—হ্যাঁ, শুধু উষ্ণীষ নয়, হাতে কতগুলি চুড়ি রয়েছে, কোমরে

রয়েছে রসনাদাম। পায়ে ঐ রকম মোটা কড়া পরতে আজকার মেয়েরা কখনই রাজী হবে না। পুরুষরাও কানে কত মোটা মোটা কুণ্ডল ব্যবহার করতো তখন। কাঁধের উপর অবধি ঝুলে পড়াতে কি এমন সৌন্দর্য বেড়েছে তাত বুঝি না।

—ওগুলির ঐরকমই নিয়ম। আভূষণ চিরকাল ছোট থেকে বড় হতে হতে যখন বোঝা হয়ে ওঠে তখন আবার ছোট হয়ে আসে। পরিবর্ত্তনের নিয়মই এই।

কাকনাদবোট থেকে আমরা বিদিশা, এরিকন হয়ে পূব দিকে এগিয়ে চললাম। মনিঘর (ম্যাহর) নামক স্থানেও কাকনাদবোটের মত আর একটি সুন্দর চৈত্য দেখলাম। এই চৈত্যটিও সুন্দর মূর্তি ও তোরণ দিয়ে সাজানো। বহু রকমের মূর্তি দেখলাম, কিন্তু দুই জায়গার কোথাও বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখতে পেলাম না। মাধব আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করল—তখন কি বুদ্ধের মূর্তি তৈরীর কোনও নিয়ম ছিলনা ?

—না। তাহলে বিনয়-পিটক পড়বার সময়ে জানতে পারতাম। বিনয়-পিটকের মধ্যে কোথাও বুদ্ধমূর্তির কথা লেখা নেই। সিংহলে আমি দেখেছি ভিক্ষুরা উপোসথ-এর সময় যখন একত্র হয়, তখন কোনও মূর্তি বন্দনা করেনা। মূর্তির বদলে ধর্মাসনকে বন্দনা করে।

—এই সকল মূর্তিগুলি দেখলেও তাই মনে হয়। কোনও মূর্তি খালি আসনকে বন্দনা করছে হাত জোড় করে। কোথাও বা বোধি-বৃক্ষের গোড়ায় কিন্নর মিথুন ফুল দিয়ে অঞ্জলি দিচ্ছে।

—এতে শুধু এই মনে হয় যে এই চলসংসারে ধর্মও অচল হয়ে থাকে না।

—কিন্তু ব্রাহ্মণরা যে বলে তাদের ধর্ম অচল হয়ে আছে।

—ওদের মিথ্যা বলতে লজ্জা হয় না। ব্রাহ্মণদের যে ত্রিমূর্তি যথা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, তা কোন প্রাচীন বেদে লেখা আছে বলতে পারো ? বেদের প্রথম কর্তা বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্রের সঙ্গে আজকালকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ দেখতে পাবে। আজ

গুপ্তরা নিজেদের গো-ব্রাহ্মণ পূজক বলে প্রচার করে থাকে আর গাভী রক্ষার জন্য যে তৎপরতা আজ দেখছ এ প্রথাটা খুব বেশী দিনের নয়।

—তা আমি জানি। এখনও উত্তরাপথে অতিথি বাড়িতে এলে গোমাংসের সঙ্গে মধুপর্ক দেবার নিয়ম আছে।

—আমিও তাই বলছি। ব্রাহ্মণরা যখন নিজেদের ধর্মকে অচল সনাতন বলে তখন তাকে 'সত্যের হত্যা' ছাড়া আর কোন আখ্যা দেওয়া যায় না।

এরপর আমরা সহজাতিয় (ভিটা) নামক স্থান হয়ে যমুনার তীরে পৌঁছে, সেখান থেকে প্রতিষ্ঠান রওয়ানা হলাম।

আমাদের প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে দেখা করা। তবুও প্রথমে আমরা বিহারে গিয়ে আশ্রয় নিলাম।

মাত্র চার বৎসর হল চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে বসেছে। এরই মধ্যে সে প্রমাণ করতে চায় যে সে একদিকে যেমন মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মত যুদ্ধ কুশলী, তেমনি কুটনীতির ক্ষেত্রেও সে কৌটিল্যকে ডিঙ্গিয়ে যেতে চায়। বিহার হোক আর দেবালয় হোক, অথবা পানশালা বা গণিকালয় হোক, এমন কোন জায়গা নেই যেখানে চন্দ্রগুপ্তর গুপ্তচর মজুদ নেই।

সমুদ্রগুপ্ত যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু নম্রশত্রুর প্রতি তিনি খুব উদার ছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যের বিস্তার করেছিলেন বহুদূর পর্যন্ত তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা শুধুমাত্র কতকগুলি টুকরো শক্তির একটা আলগা সংগঠন ছাড়া আর কিছু নয়। যার ফলে সমুদ্রগুপ্তর বৃদ্ধ বয়সে আর্যাবর্তের বাইরে সকল সামন্ত রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করে পৃথক হয়ে গেছে। চন্দ্রগুপ্ত এমনি দিগ্বিজয়ের পক্ষপাতি নয় এবং মৌখিক স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হবার পাত্র নয়। চন্দ্রগুপ্ত চায় সমস্ত রাজ্যগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে একটা মজবুত সংগঠন তৈরী করতে।

তার জন্যে সে ইতিমধ্যেই মথুরা থেকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন (পূর্ববাংলা) পর্যন্ত মজবুত করতে সংগঠনি কাজ প্রায় শেষ করে এনেছে।

আমরা যে বিহারে বাস করছি এখানে আমার পরিচিত ভিক্ষু অনেক ছিল। আর আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্যের সংখ্যাও অনেক। তা ছাড়া আমি আচার্যের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য এবং পরম ভট্টারিকা দত্তাদেবীর অনুজ বলেও প্রসিদ্ধ ছিলাম। অতএব চন্দ্রগুপ্তও গুপ্তচরের কাছে নিশ্চয় জয় যৌধেয়'র সংবাদ গোপন থাকবে না আমরা জানতাম।

হলও তাই। কয়েকদিনের মধ্যেই চন্দ্রগুপ্ত নিজে ধ্রুবদেবী ও সেনাপতিকে নিয়ে বিহারে এসে উপস্থিত হল। হঠাৎ আবির্ভাব এবং এত সৈন্য সামন্ত ও চর দেখে লোকে আতঙ্কিত হল। ওরা তিনজনে আমাদের ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াতে আমি বেরিয়ে এলাম।

চন্দ্রগুপ্ত মাথার মুকুট খুলে প্রতিহারীর হাতে দিয়ে নতমস্তকে ও যুক্তকর হয়ে বললো—ভন্তে! আমার মন জয় অথবা মামা বলে ডাকবার জন্যে আনচান করছে। কিন্তু ঐ বেশকে সম্মান করাও আমার সর্বপ্রধান কর্তব্য।

ধ্রুবদেবী ও সেনাপতি নত হয়ে আমাকে প্রণাম করল। চন্দ্রগুপ্ত সেইদিনই দুপুরে ভোজনের জন্য এবং কিছুক্ষণের জন্য অন্তঃপুরে ওর সঙ্গে আলোচনার জন্য আমার স্বীকৃতি নিয়ে গেল। চন্দ্রগুপ্ত বিগত নয় বৎসরের পুঞ্জিত সকল কথা আমাকে বলবার জন্য উৎসুক হয়ে আছে।

পাটলিপুত্র এখনও রাজধানী রয়েছে, তবু চন্দ্রগুপ্ত একটা রাজধানীতে সন্তুষ্ট নয় তাই প্রতিষ্ঠান ও মথুরায় নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া ক্ষত্রপদের উচ্ছেদের পর উজ্জয়িনীতে আর একটা রাজধানী প্রতিষ্ঠা করবার ইচ্ছা রাখে।

প্রতিষ্ঠানের অন্তঃপুরে পাটলিপুত্রের সকল ছাপই রয়েছে। আমি একা অন্তঃপুরে গেলাম। চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রের বিশেষত্ব হল

ও নিজের অন্তঃপুরের সংখ্যা বাড়াতে চায় না। ও বলতো আমি রাজা দশরথ ও শ্রীকৃষ্ণের অনুকরণ করতে চাইনা। কি হবে হাজার হাজার রাণী পুষে, মাত্র একদিন দুদিন স্পর্শ করে সারাজীবনটা বন্দী করে রেখে। তবে রাজনীতিক স্বার্থের খাতিরে ও বড় বড় রাজাদের কন্যাকে বিবাহ করে সম্বন্ধ স্থাপন করবার পক্ষপাতী ছিল। ধ্রুবদেবীকে চন্দ্রগুপ্ত আদর করে ধ্রুবস্বামীনি বলে ডাকে। তাকে ত্রৈলক্যসুন্দরী বললেও অত্যুক্তি হয়না। আমার সংবাদ পাওয়ার পরে ও নিশ্চয় ধ্রুবস্বামীনিকে আমার সম্বন্ধে অনেক কথাই বলেছে।

অজ্জুকার মৃত্যুর আগেই ধ্রুবদেবীর সঙ্গে রামগুপ্তের বিবাহ হয়েছিল। অজ্জুকার মুখেও ধ্রুবদেবী শুনেছে যে তিনি তার ছোট ভাই জয়কে কতখানি স্নেহ করতেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত একদিনও জয়কে ভুলতে পারেননি। মৃত্যুর সময়েও পরমভট্টারককে অনুরোধ করেছিলেন—আর্যপুত্র! একটিবার আমার জয়কে আমার সামনে এনে দাও। একটিবার তাকে প্রাণভরে দেখতে দাও। তা না হলে আমি শান্তিতে মরতে পারছি না। পরমভট্টারক আমার অবস্থান না জানায় অজ্জুকার মন রাখতে বলতেন—আমাদের অশ্বারেহী সৈন্য বহুদূর পর্যন্ত জয়কে খুজে আনবার জন্যে গেছে।

ধ্রুবস্বামীনিও আমাকে কখনও দেখেনি কিন্তু সে জানত যে জয় তার স্বামীর বাল্যমিত্র, বুদ্ধিমান ও সাহসী। তাছাড়া আরও একটি কারণ ছিল যে জন্যে আমাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখত ধ্রুবস্বামীনি। সেটি হল ধ্রুবস্বামীনি নিজে মালবগণের কন্যা ছিল। প্রতিষ্ঠানে থেকে রাজঅন্তঃপুরে না খেয়ে উপায় নেই কিন্তু যতরাত্রি হোক আমি বিহারে ফিরে আসতাম, এবং মাধবের সঙ্গে আলোচনা করতাম। ধ্রুবস্বামীনি নিজে হাতে পরিবেশন করে আমাকে রোজ খাওয়াতো। রাজকার্য থেকে অবসর সময়েই চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে কথাবার্তা হত।

কিন্তু ধ্রুবস্বামীর হাত থেকে রেহাই ছিলনা। আমি যদিও সম্বন্ধে চন্দ্রগুপ্তের মামা ছিলাম কিন্তু বয়সে তার ছোট ভাইয়ের মত।

তাই ধ্রুব আমাকে চন্দ্রের দৃষ্টিতেই দেখত। আমার ভিক্ষুবেশ দেখে ও প্রায়ই বলতো—মাতুল ভট্টারক! এখন এই কষায় বস্ত্র ত্যাগ করো। অনেক পুণ্য অর্জন করেছো যার জন্যে স্বর্গে গিয়ে অপ্সরাদের থেকে বঞ্চিত হবেনা, কিন্তু এই মাটির দেশের অপ্সরা তোমার মত বীরকে না পেয়ে কাপুরুষদের শরণ নিতে বাধ্য হচ্ছে।

আমি বুঝতাম যে কাপুরুষ শব্দ উচ্চারণ করবার সময় তার রামগুপ্তর কথা মনে হত। চন্দ্রগুপ্ত নিজে আমাকে সেই কাহিনী শুনিয়েছে।

—তুমি ত জানো জয়, আমার জিদ ও খামখেয়ালী স্বভাব। কিন্তু আমার মনেই হয়নি যে এত তাড়াতাড়ি সে অবসর আমি পাব। পিতার শেষ অবস্থা তুমি নিজে দেখে গেছ। একমাত্র সুরা আর নারী ছাড়া আর যেন কিছুই চাইতেন না তিনি। ফলে আমাদের শাসিত শত্রুরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। আমাদের সেনাপতি আর অমাত্য সকলে অযোগ্য, নিষ্কর্মা ছাড়া আর কিছুই নয়। শকরাজ দেবপুত্র পশ্চিম দিকে আগেই নজর রেখেছিল, তারপর পরমভট্টারকের মৃত্যুর খবর পেয়েই আমাদের সীমা আক্রমণ করল। রামগুপ্ত স্বয়ং যুদ্ধ পরিচালনা করবার জন্য গেল। কিন্তু সেও পিতার বৃদ্ধ জীবনের শিক্ষালাভ করেছিল। যদিও আমি সুরা সুন্দরীকে জীবনের একমাত্র উপাস্য মনে করি, কিন্তু তার জন্য মূল্য শোধ করবার পর।

—এ দুটোই পরস্পর বিরোধী চন্দ্র।

—এ জীবনটাই পরস্পর বিরোধী জয়। যে সময় গুপ্তবংশের ভাগ্য টল টল করছে এবং রামগুপ্ত নিজের সমস্ত সেনা নিয়ে দেবপুত্রের মত শত্রুর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেছে তখনও রাম তার বিলাসিতা ছাড়তে পারেনি। এসব যদিও আমার খুব অসহ্য লাগতো, কিন্তু আমার করবার কিছুই ছিল না। এদিকে বাকাটক আর ক্ষত্রপ অন্য সীমান্তে তৈরী হচ্ছে। বেশীর ভাগ সেনা সীমান্ত রক্ষার কাজে নিযুক্ত। ওদিকে শকরাজ সীমান্ত পার হয়ে ঢুকে

পড়েছে। রামগুপ্তের সেনা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছে। আমাদের সেনাপতি এবং যুদ্ধমন্ত্রী পরমভট্টারকের সামনে বড়ই নিরাশা পূর্ণ ভাব দেখিয়ে সন্ধি করতে পরামর্শ দিল। যা কিছু বাঁচে যে কোনও সর্তে সেগুলিকে বাঁচাবার পরামর্শ। এমন সময় শকরাজের দূত রামগুপ্তের সামনে সর্ত পেশ করলো "দেবপুত্রশাহী রামগুপ্তকে অভয় দিতে পারে যদি রামগুপ্ত তার পাটরাণী ধ্রুবদেবীকে দেবপুত্রশাহীর হাতে তুলে দেয়।" আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগল জয়, যে সমুদ্রগুপ্ত এবং দত্তাদেবীর মত মাতা পিতার রামগুপ্তের মত সন্তান জন্মাতে পারে। কাপুরুষ রাম শকরাজের সর্ত শুনে ধ্রুবদেবীকে তার কাছে পাঠিয়ে দেবার জন্য কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে কথা তুমি ধ্রুব'র কাছে শুনতে পাবে।

ধ্রুব বললো—বড়ই দুই দুঃখের কথা মাতুল ভট্টারক, যখন রামগুপ্ত আমাকে বললেন 'দেবী' প্রবল শত্রু গুপ্তবংশের উচ্ছেদ করতে এগিয়ে আসছে। শুধু গুপ্তবংশের উচ্ছেদ সাধনই যদি তার উদ্দেশ্য হত তাহলে আমার কোনও চিন্তাই ছিলনা, কিন্তু আমার লক্ষ লক্ষ প্রজাকে সে ধ্বংস করবে তা আমি সহ্য করতে পারবোনা। শকদের মত ক্রুর আর হয় না, স্ত্রী শিশু বৃদ্ধ কাউকেই রেহাই দেবে না। রক্তের নদী বইয়ে দেবে আমাদের এই সোনার দেশে। আমি রাজা হয়ে আমার প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য আমার পত্নীকে ত্যাগ করব বলে ঠিক করেছি।

—হুঁ, ও রঘুকুলের রামচন্দ্র হতে চেয়েছিল, ছিঃ!

—সেই কথা শুনে আমার শরীরে আগুন জ্বলে উঠল। আমি মালবগণের কন্যা এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের পাটরাণী। রাগের মাথায় ছোট বড় কথাও বলেছিলাম। না বলে পারলাম না, অতবড় কাপুরুষ নির্লজ্জকে কোন মতেই ক্ষমা করতে পারছিলাম না। সে তখন রামচন্দ্রের উপমা দিতে লাগল। আমি মনে করলাম এমন কাপুরুষ আমার পতি হতে পারেনা এবং মালব কন্যা বেশ্যাবৃত্তিও করতে পারে না। অগত্যা আমি চন্দ্রকে সকল কথা বললাম।

যদিও আমি জানতাম চন্দ্র তখন অন্য কিছু একটা ভাবছিল। আমার কথা শুনে চোখের জল মুছিয়ে চন্দ্র বললো—তার জীবন থাকতে সে আমার দ্বারায় গুপ্তবংশের সুনামকে কলঙ্কিত করতে দেবেনা। তুমি জানো চন্দ্রগুপ্তের চরিত্রে বহু দোষ আছে কিন্তু ওর সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হল কাপুরুষের নাম শুনতে পারে না ও।

আবার চন্দ্র বলতে লাগলো—আমি একমুহূর্তে ভেবে নিলাম যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার লক্ষ্মীঅর্থাৎ তার পত্নীকে পেয়ে খুশী হতে চায় সে শুধু কামুক এবং অন্ধ ছাড়া আর কিছু নয়, এই বিশ্বাস আমার মনে দৃঢ় হল। কিন্তু শক সেনাপতি সম্বন্ধে আমার অবশ্য সেকথা মনে হয়নি। পতিত শকরাজকে ছলনা করেই জিততে হবে ভেবে আমি এক অন্য উপায় অবলম্বন করলাম। যদিও সে পথে বিপদ ছিল পদে পদে কিন্তু যে মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করতে সঙ্কল্প করেছে তার বিপদকে চিন্তা করলে চলেনা। আমি বীর সেনকে ডেকে আমার মত প্রকাশ করলাম। বীরসেন সানন্দে আমার মতে রাজী হয়ে গেল। সে প্রতিজ্ঞা করল আমার হুকুম পেলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তেও চিন্তা করবেনা। বীরসেন প্রথমেই পাঁচ শত বাছা বাছা সৈন্য সংগ্রহ করতে আমাকে সাহায্য করল। আমি সৈন্যদের সামনে খোলাখুলি বললাম,

—ছল করে শত্রুর ঘরে ঢুকতে হবে আমাদের। যদিও তারা অতখানি বোকা নয় যে আমরা বেশীক্ষণ আমাদের লুকিয়ে রাখতে পারব। মোট কথা প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে আমাদের। তবুও জীবন থাকতে মগধ রাজবংশের সঙ্গে তার মান মর্যাদা শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারবো না। মনে কর আমরা স্ব-ইচ্ছায় নিজেদের জীবন বলি দিতে যাচ্ছি, অতএব মরতে যারা ভয় পায়না আমি শুধু তাদেরই আমার সঙ্গে যেতে বলব। উপস্থিত সকলেই একসঙ্গে আমার প্রস্তাব স্বীকার করল। আমি নিজে ধ্রুবদেবীর বস্ত্র পরলাম। সকলেই আমরা তরুণ যুবক। আমাদের লম্বা কেশ চমৎকার বেণী বন্ধনে সাহায্য করল। দাড়ী গোঁফের চিহ্নমাত্র থাকতে দিলাম

না। প্রতি পাঁচজনের মধ্যে একজনের কাছে একটা অস্ত্র রাখলাম। প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠেই একবার দাড়ি গোঁফ কামিয়ে মুখচূর্ণ মেখে নিতাম মুখে।

—আমি তোমার নাটক দেখেছি চন্দ্র। আমি বিশ্বাস করি যে তোমার সমস্ত শিল্পজ্ঞান উজাড় করে তুমি নিজেকে প্রস্তুত করেছিলে।

—ছোটবেলায় যখন আমি অভিনয় করতাম তখন কখনও আমার মনে হয়নি সেই অভিনয় শিক্ষা একদিন এতবড় কাজে লাগবে। যাইহোক আমি রামগুপ্তের সামনে আমার যোজনা উপস্থিত করে বললাম—"ভাই! একবার আমাকে প্রাণপণ চেষ্টা করবার সুযোগ দাও। অসফল ও যদি হই তাহলে কিছুটা সময় তুমি পাবে নিজেকে খানিকটা তৈরী করতে। রামগুপ্ত আমার কথা শুনে খুব খুশী হল। আমাকে আলিঙ্গন করে আমার বিক্রমের জন্য সাধুবাদ দিল। আমি জানতাম যে রামগুপ্ত একঢিলে দুই পাখী শিকারের আনন্দে আমাকে উৎসাহ দিচ্ছে। আমার কথামত তখন রামগুপ্ত অতি নম্রতার সঙ্গে শকরাজার কাছে তার সংবাদ পাঠালো।

পাঁচশত শিবিকায় মহারাণী ধ্রুবস্বামী নিজ সখী সহচরী নিয়ে যাত্রা করলো। ওদিকে ঘোড়সওয়ারের কাছে সংবাদ পেয়ে শকরাজ ধ্রুবদেবীকে পাওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠছে। আমরা তার ছাউনিতে গিয়ে পৌঁছলাম। ছাউনি তখন যমুনার ওপারে। অবগুণ্ঠনের মধ্যে আমার নগ্ন সৌন্দর্য দেখে দেবপুত্রশাহীর কামাতুর মন তৃপ্তি পাচ্ছিল না তাই ঘোমটা খুলে ফেলল একটানে। মাথা নীচু রেখে আমি একবার বাঁকা চোখে কটাক্ষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম, আর একটু মুচকী হাসি। আমার বড় বড় চোখের কাজল রেখা চোখ দুটিকে আরও মোহক করে তুলেছিল। দেবপুত্রশাহী ভীষণ খুশী হয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে ডাকল "প্রিয়তমা", আমি আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে মুচকী হেসে ওর হাত দুটি নামিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।

—বুঝতে পারছি চন্দ্র যে তোমার অভিনয় কতখানি প্রাণবন্ত হয়েছিল।

—সত্যিই প্রথম অভিনয়ে সাফল্যলাভ করে আমার খুব আনন্দ হল। ক্রমশ রাত্রি এলো। প্রাসাদে আলো জ্বললো, কিন্তু আমার বুকের মধ্যে অন্ধকারে একটা অজানা আতঙ্ক ক্রমশ ভারী হয়ে উঠতে লাগল। অন্তিম সময়ের জন্যে অধীর হয়ে উঠলাম আমি। কিছুক্ষণ বাদে দেবপুত্র তার নতুন রাণীর কাছে এলো। সামনে লাল সুরা আর সুবর্ণ পাত্র রেখে গেল দাসী। তারপর নৃত্য-সঙ্গীত শুরু হল। আমরা দুজনে এক আসনে বসলাম। আমি খুব আদর করে আমার প্রিয়তমের মুখে সুরাপাত্র তুলে দিতে লাগলাম। একবার ও আমাকে খাইয়ে দেয় আর একবার আমি ওকে। তবে কে বেশী খেয়েছে সেটা নিশ্চয় তুমি বুঝতে পারছো।

আমি বললাম—অভাগা দেবপুত্রশাহী কেমন করে বুঝবে যে ভগবান কৌটিল্যের বরদান নিয়ে কে তার ঘরে ঢুকেছে।

—তারপর, সুরার পালা চলতে থাকলো অবিরাম। ক্রমশ দেবপুত্রের চোখ লালবর্ণ ধারণ করলো। কখন নেশার ঘোরে ওর হাত দুটি আমার পিঠে রাখছে কখনও বা আমার হাত ধরে ও বুকের উপর নয়ত আমার বিল্বস্পর্দ্ধী কৃত্রিম স্তনযুগলের উপর। আমি তখন অন্যান্য সকলকে বাইরে যেতে ইসারা করতে দাসীরা শয্যা রচনা করে গর্ভগৃহ থেকে বাইরে চলে গেল। এখনও একটি প্রদীপ জ্বলছে সেখানে। আমরা মাত্র দুইজন তেমনি বসে আছি। দেবপুত্র অধীর হয়ে ওঠে ক্রমশ। আমি নিম্নস্বরে বললাম, প্রদীপের সামনে আমার লজ্জা করে। এই বলে জড়ানো সুরে প্রতিহারীকে প্রদীপ নিভিয়ে দিতে আদেশ করলাম। যদিও বাইরের সকল প্রতিহারী আমার লোক।

—তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। শুধু প্রতিহারী কেন সমগ্র প্রাসাদটায় কোথায় কজন তোমার অনুচর ছিল তা আমি কল্পনার চোখে বেশ দেখতে পাচ্ছি।

—তারপর আলো নিভে যেতে আমি দেবপুত্রের বুকে হাত বোলাতে বোলাতে আন্দাজ করে নিলাম ওর হৃৎপিণ্ডটা কোথায় আছে। তারপর আলিঙ্গন করতে গিয়ে ডানহাতের ছুরিটা ঠিক ওর হৃৎপিণ্ডের উপর বসিয়ে প্রাণপণে সবটুকু ঢুকিয়ে দিলাম। সেই সঙ্গে বাঁ হাত দিয়ে মুখটাও চেপে ধরেছিলাম যাতে শব্দ করতে না পারে। যদি ওর এতটুকু কিছু ক্ষমতা হোত, তাহলে আরও ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। আমার আশেপাশে সর্বদা পঞ্চাশজন সৈনিক প্রস্তুত ছিল।

সেই বেশেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় প্রাসাদ ত্যাগ করলাম, এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্দিষ্ট স্থানে এসে পৌঁছলাম। তারপর বাকি রাতটা দৌড়ে কাটালাম। আমাদের সৈনিক তৈরী ছিল এবং আমাদের জন্যে ঠিক সময়মত ঘোড়া এসে পৌঁছল। নিজের সীমান্তের ছাউনিতে এসে আমি সকল সংবাদ সৈন্যদের শোনালাম। তারা আনন্দে উন্মত্তের মত লাফাতে লাগল। চারিদিকে যুবরাজ চন্দ্রগুপ্তের জয়জয়কার হতে লাগল। আমি আর দেরী না করে সেনাপতিকে শকসৈন্যদের আক্রমণ করতে আদেশ করলাম, আর আমি বীরসেনকে নিয়ে রামগুপ্তের শিবিরে এলাম। যদিও রামগুপ্ত এর আগে সংবাদ পেয়েছিল, কিন্তু তুমিত জানো জয়, ব্রহ্মা যখন সকলকে বুদ্ধি ভাগ করে দেন তখন রামগুপ্ত সকলের পেছনে ছিল।

ধ্রুবস্বামিনীও সেখানে উপস্থিত ছিল। সময়টা ছিল তখন দিন। রামগুপ্তের কাছাকাছি কয়েকজন শরীর রক্ষক উপস্থিত ছিল। কিন্তু অতবড় সফলতার পর আমার মনে তখন এত সাহস হয়েছে যে বিশ-পঞ্চাশ জন সৈন্যকে আমি তৃণবৎ জ্ঞান করলাম। রাম আমাকে আলিঙ্গন করবার জন্য কাছে এগিয়ে এলো। দেবপুত্রের হৃৎপিণ্ড ভেদ করা ছুরি তখনও আমার কোমরে রয়েছে। আলিঙ্গন করতেই আমি নিঃসঙ্কোচে সেই ছুরি রামের বুকে বসিয়ে দিলাম। রাম আহঃ করে মাটিতে পড়ে গেল। ধ্রুবস্বামী ছুটে এসে আমার বুকের মাঝে আশ্রয় নিল। চোখে তার করুণার অশ্রু।

আমি চীৎকার করে সকলের দিকে তাকিয়ে বললাম—তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যার ঐ কাপুরুষের মৃত্যুতে ক্ষোভ হতে পারে? তখন ধ্রুবস্বামীর কণ্ঠস্বর শুনলাম "জেদ্রু, জেদ্রু ভট্টা", উপস্থিত সকলেও বলে উঠল, জেদ্রু, জেদ্রু ভট্টা। ব্যস এখন থেকে গুপ্তরাজলক্ষ্মীর স্বামী চন্দ্রগুপ্ত।

—আর ধ্রুবস্বামীনিরও স্বামী। ব্যঙ্গ করে বললাম আমি। আমি লক্ষ্য করছিলাম শেষ কথা বলতে চন্দ্রগুপ্তের মনটা যেন উদাস হয়ে গেল। তাই আমি বললাম—বোধ হয় তোমার আর কোনও উপায় ছিল না।

—ঠিক বলেছ জয়। যদিও রাজকুলে ভ্রাতৃবধ নেহাৎ সাধারণ কথা, তাছাড়া রাজপুত্রের অপর নাম ত জনক ভক্ষক। তবুও আমি যখন আমার ভবিষ্যৎ গঠনের স্বপ্ন দেখতাম, তখন কখনও রামগুপ্তকে হত্যা করবার কথা ভাবিনি। তবে ওকে আজীবন বন্দী করে রাখার কথা আমি নিশ্চয় ভেবেছি। কারণ আমি ভাবতাম যে ওর মত পঙ্গু বুদ্ধির মানুষকে হত্যার প্রয়োজনই হয় না। কিন্তু যখনই ও নিজের স্ত্রীকে অন্যের হাতে তুলে দিতে রাজী হয়েছিল, তখনই আমাকে নিষ্ঠুর করে তুলেছিল আমার স্বভাব।

আসমুদ্র হিমাচলকে পদতলে নত করেছিল যে সমুদ্রগুপ্ত, ও তারই পুত্রবধুকে নৃশংস শকরাজের শিবিরে পাঠিয়েছিল। ও বেঁচে থাকলে ওর অনুচরেরা এমনি আরও পরামর্শ দিত ওকে। তাই একই সঙ্গে সকল ঝগড়ার অবসান করে দিলাম আমি।

* * * *

এরপর একে একে মনের কথা সবই খুলে বলল চন্দ্রগুপ্ত।

—আমি এমন এক বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবো যার শেষ সীমা হবে পূর্ব থেকে পশ্চিম সমুদ্রতট পর্যন্ত।

—অর্থাৎ?

—যেমন পূর্ব সমুদ্র (বঙ্গোপসাগর) হাতে থাকলে সকল পূর্ব-দ্বীপ যবদ্বীপ, চীন প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য আমার হাতে থাকবে। তেমনি

পশ্চিম সমুদ্র (আরব সাগর) হাতে থাকলে পশ্চিমের সকল বন্দর যবন, পারস্য প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যও আমার হাতে থাকবে। আজকার একমাত্র ব্যবসায়েই লক্ষীলাভ করা যায়। যখন আমার কোষ অর্থে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, তখন অন্যান্য সকল রাজারা ভয়ে আমার পায়ের কাছে তাদের রাজমুকুট নামিয়ে রাখবে।

—তোমার দৃষ্টি তাহলে ক্ষত্রপ এবং বাকাটকদের উপরেই বেশী নিবদ্ধ ?

—হ্যাঁ, ক্ষত্রপরা পিতার দুর্বলতার সুযোগে আবার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। তাদের নামগন্ধ পর্যন্ত এ পৃথিবী থেকে আমি মুছে দেব।

—তাই বলে ক্ষত্রপদের শক্তিও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়।

—আমি জানি যে মহাক্ষত্রপ সত্যসেন এবং রুদ্রসেন যথেষ্ট শক্তি রাখে। তারপর ওরা যখন জানবে যে সমুদ্রগুপ্তর মত চন্দ্রগুপ্ত শুধু তাদের বশ্যতা স্বীকার করিয়ে নিয়ে ক্ষান্ত হবে না, তখন তারা আরও মরিয়া হয়ে উঠবে। তাই বলে তুমি ভেব না যে চন্দ্রগুপ্ত চুপ করে বসে আছে। পিতা ভট্টারকের আমলের বৃদ্ধ সেনাপতির হাতে আমি অধিকার রাখিনি। শুধুমাত্র সেনাপতির সম্মানে তাঁকে রেখেছি।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ এখন সেনাপরিচালনার ভার আমি নিজে নিয়েছি।

—তবুও তার বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা রয়েছে যা তোমার নেই হয়ত।

—সেই জন্যেইত তাকে আমার পরামর্শদাতা হিসেবে রেখেছি। তাছাড়া তুমি বোধহয় জানোনা যে আমি নতুন নিয়মে শাসন প্রবর্তন করে একজন উপরিক (ভাইসরয়) ও একজন কুমারামাত্য (জিলা-শাসক) কর্মচারী নিয়োগ করেছি।

—তাহলে আজকাল উপরিকদের মহারাজ পদবী দেওয়া হবেনা ?

—হ্যাঁ, পদবী তারা পাবে তবে তাদের বংশ পরম্পরায় পাওয়ার অধিকারী থাকবে না, আমি তাদের পদবী দান করব। আরও

একটা পরিবর্তন করেছি আমি। ব্রাহ্মণ যোদ্ধাদের আমি সৈন্যবিভাগ থেকে সরিয়ে নিয়েছি। ওরা রাজার সেবা করবে অন্যদিক দিয়ে।

—কিন্তু মৌর্য সেনাপতি পুষ্পমিত্রকে তুমি জানো। যিনি ব্রাহ্মণ এবং মৌর্যবংশের সেনাপতি ছিলেন।

—জানি। কিন্তু সুযোগ পেয়েই তিনি মৌর্যকে ফাঁকি দিয়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজের রাজ্যস্থাপন করেছিলেন। খড়গধারী ব্রাহ্মণদের আমার দরকার নেই, কিন্তু কৌটিল্যের বুদ্ধির প্রয়োজন আছে আমার। সেনার জন্যে ক্ষত্রিয়রাই উপযুক্ত। বংশপরম্পরায় তাদের মধ্যে রয়েছে রণোম্মাদনা, রাজমুকুটের লোভ নেই তাদের। তারা জানে যে রাজমুকুট এমন জিনিস যার ছায়া গায়ে পড়লেই বীরত্ব লুপ্ত হয়ে যায়।

—রাজমুকুটকে তুমি এত খারাপ ভাবো ?

—হ্যাঁ, তোমার আনন্দ হচ্ছে না ? তা না হবার কথা, তুমি যৌধেয় কিনা।

—তোমার শরীরেও যৌধেয় রক্ত রয়েছে চন্দ্র।

—আছে, সে জন্য আমি গর্ব অনুভব করি। আমি ভবিষ্যতে ধ্রুবস্বামিনীর কাছ থেকে পুত্র আশা করি। চন্দ্র ধ্রুবস্বামির দিকে তাকাতে ধ্রুবস্বামীনি আনন্দিত হয়ে বললো—আর্যপুত্র, গণের কাছ থেকেই শুধু বীরতার আশা করো বুঝি ?

—হ্যাঁ প্রিয়তমে, কেননা তাদের গায়ে মুকুটের ছায়া পড়ে না। আমার পিতা গণকুমারীর সন্তান ছিলেন, আমিও গণকুমারীর গর্ভে জন্মেছি, আশা করি তুমি আমাকে তেমনি সন্তান উপহার দেবে !

ধ্রুবদেবী তার শাশুড়ী দত্তাদেবী এবং দিদিশাশুড়ীর উপযুক্ত পুত্রবধু, কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের কাছে অন্তঃপুর সম্বন্ধে এতখানি সংযম আমি আশা করিনি। অবশ্য নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ও সব কিছু করতে পারে। ওর সিদ্ধান্ত হল দুএকদিন ভোগ করতে হয় করো, তাই বলে সারাজীবন তাকে আটকে রাখার কোনো মানে হয়না। ধ্রুব দেবী শুধু চন্দ্রগুপ্তের কথায় সায় দেওয়া স্ত্রী নয়, বরং তার তীক্ষ্ণ

বুদ্ধির জন্য চন্দ্রগুপ্ত সকল কাজেই তার পরামর্শ গ্রহণ করতো। তাছাড়া আমাকে ওরা যতখানি আদর যত্ন করতো অর্থাৎ ওদের প্রভাব যতখানি আমাকে প্রভাবান্বিত করেছিল, অন্যলোক হলে আজীবন গুপ্তবংশের দাসত্ব স্বীকার করতো হাসিমুখে। সম্বন্ধে যদিও আমি মাতুল ছিলাম, কিন্তু রাজবংশের এমন মাতুল গণ্ডা গণ্ডা ঘুরে বেড়ায় ঠিকানাহীন ভাবে।

হাজার হাজার দাসদাসী থাকা সত্ত্বেও পাটরানী নিজে হাতে পরিবেশণ করে আমাকে খাওয়ান এবং সব রকমে আমার সুখ সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখাটা অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। আমি জানতাম সে সবের মধ্যে কখনও একটু আধটু যদিও লোক দেখানো তবুও এমন সহজ ও সরল স্বভাব খুব কমই দেখা যায়। পরিহাস করতেও ধ্রুবদেবী খুব চতুর ছিল। সেদিন বললো—মাতুল ভট্টারক, তোমরা দুজনে অজ্জুকার কোলে লালিত-পালিত হয়েছো। আজ তিনি বেঁচে নেই যে তোমাকে অনুরোধ করবেন। তাই আমি তার হয়ে বলছি, এবং আমার একমাত্র ইচ্ছা যে তোমরা দুজন সারাজীবন একই জায়গায় থাকো। বলতে বলতে ধ্রুবদেবীর চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি বললাম—এই চীর-চীবর নিয়ে তা কেমন করে সম্ভব হয়।

—তা হোক। চীর-চীবর চিরকাল থাকবে না। আমি শুনেছি কত রাজকুমার প্রথম জীবনে চীর-চীবর ধারণ করে আবার সব পরিত্যাগ করে গৃহস্থাশ্রমে মন দিয়েছেন। যেদিন থেকে তুমি এসেছ, সেইদিন থেকে আমি ভাবছি যে তোমাদের দুজনকে আবার এক করে নিজের কাছে রাখবো।

—অর্থাৎ ভাবছিলে কেমন করে আঁচলে বেঁধে রাখবে?

—হ্যাঁ আঁচলে বাঁধতে চাই তবে সে আঁচল আমার ছোট বোনের আঁচল।

—তাই নাকি? তাহলে আমি আর মাতুল ভট্টারক থাকব না।

—তা হোক, আমার সহোদরা আমার চেয়ে কম নয় কিছুতেই।

—তাহলে তার জন্য আর এক চন্দ্রগুপ্তের খোঁজ করা দরকার।

—মাতুল আমার কথা পরিহাস ভেবে অবহেলা করো না। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি যেদিন তুমি আমার সহোদরার হাত ধরে দাঁড়াবে, সেদিন তোমাদের দুজনকে এক জায়গায় দেখতে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

—ধ্রুব ভট্টারিকা। তোমার মনে আঘাত দিতে চাই না আমি, তবুও আমি বলব, তুমি একটা সুন্দর তরুণ জীবনকে একটা চীবর নীরস জীবনের সঙ্গে বাঁধতে চেয়ে ভুল করছো।

—কেন মাতুল। চীবর যখন থাকবে না, তখন ঐ জীবনে আবার আনন্দের ঢেউ খেলবে। তুমি নিজের জীবনটাকে ইচ্ছে করে নীরস করে রেখেছ মাতুল। অদৃশ্য থেকে যে মহান শক্তি এই সৌন্দর্যরাশি সৃষ্টি করেছিলেন, তার কথা ভাবছ না। আমি শুনেছি পাটলিপুত্রের অন্তঃপুরিকাদের থেকে কেমন করে তুমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে।

—তার জন্যে কাউকে কখনও অপমান করেছি বলে কেউ কি অভিযোগ করেছে ?

—অপমান তুমি করতে পারো না, বিশেষ করে স্ত্রীজাতির অপমান ত নয়, তা আমি জানি। কিন্তু মুখে মুখে তাদের সম্মান দেখিয়ে সর্বদা তুমি দূরে দূরে থাকতে। তাই আমি জানি, যে কোনও নারীই তোমার জীবনে আসুক সে তোমার সমস্ত বুকভরা ভালবাসা পাবে।

—তাই বুঝি ভট্টারিকা নিজের বোনের জন্যে অখণ্ড ভালবাসা দিতে ব্যস্ত হয়েছ ? কিন্তু তুমি এটাও বুঝতে পারছো যে এই চীবর যতক্ষণ শরীরে থাকবে, ততক্ষণ অখণ্ড ভালবাসার কথাই ওঠেনা।

—একবার তুমি হাঁ করেই দেখ যে হলুদ রংয়ের চীবরের আকর্ষণ বেশী না নীল রংয়ের চোখের আকর্ষণ বেশী। খুব শীগগীর আমার বোন এখানে আসছে, একবার দেখে তারপর যা বলবার বলো।

—দেখতে হবে না, রত্নাকরের একটি রত্ন দেখলেই বাকী রত্নেরও আন্দাজ করা যায় অনায়াসে।

ধ্রুবদেবীর আকর্ষণ সত্যিই দিন দিন আমাকে আরও কাছে

টানতে লাগলো। আমার চিন্তা হল স্নেহের বাঁধন ছেঁড়া খুব কঠিন এবং সেই বাঁধন ক্রমশ আমাকে আরও জড়িয়ে ফেলেছে। চন্দ্রগুপ্তের ছিল অন্যরকম কায়দা। অন্য উপায়ে সে আমাকে ফাঁসাতে চেষ্টা করতে লাগল। একদিন বলল—জয়, তরুণ বয়সের সব স্বপ্নই প্রায় পূর্ণ হয়েছে, কিন্তু বাকী এবং শেষ আশা পূর্ণ হতে পারে যদি তুমি পূরণ করো। তোমাকে যদি আমার মহাসেনাপতি রূপে দেখতে পাই, সেই হবে আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ।

ছলনা ধরতে অসুবিধায় পড়তে হয়নি আমাকে। চীবর আমার সবচেয়ে বড় সাথী, তাই সোজাসুজি অস্বীকার করে ওদের মনো-ব্যথার কারণ হইনি।

॥ ষোল ॥

বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধ

এক যুগ পরে আমি অগ্রোদকায় ফিরলাম। এখন আর আমি অপরিপক্ক বুদ্ধি কিশোর নেই। ত্রিশ বৎসরের পরিণত যুবক। মাধব আর আমি যমুনা পার হয়ে ভিক্ষু বেশ খুলে যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে গণ-ক্ষত্রিয়ের পোষাক পরে নিয়েছি।

চন্দ্রগুপ্ত প্রেম, ভালবাসা, পদগৌরব প্রভৃতি সকল দিক দিয়ে আমাকে বাঁধতে চেয়েছে। ও জানে যৌধেয়রা কেমন বীর। বিশেষ করে জন্মভূমির মর্যাদা রক্ষায় তারা মৃত্যুকে খেলার মত মনে করে। চন্দ্র যদিও আমাকে যৌধেয় ভূমি আক্রমণ করবার কথা কখনও বলেনি, তবুও আমি জানতাম, সে আমাকে ক্ষত্রপ, বাকাটক, কুষাণ, দেবপুত্রের উচ্ছেদ করবার কথা বারবার বলেছে কিন্তু কুষাণ-ক্ষত্রপ সীমান্তের যৌধেয়দের নাম বলতে পারেনি, ইচ্ছে করেই মনের কথা গোপন করেছে। তার বেশী চন্দ্রগুপ্তের কাছে আমি আশা করিনি। মাতৃকুলের উপর সমুদ্রগুপ্তের যতখানি শ্রদ্ধা, ভালবাসা ছিল তার তুলনা হয় না। একমাত্র সমুদ্রগুপ্ত ছাড়া তেমন বীর আর কোথাও নেই যে মাতৃকুলের উপর অতখানি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে। সমুদ্রগুপ্ত নিজ পিতা-মাতার নামে দীনার ঢালাই করেছিলেন এবং তার পিছনে "লিচ্ছবয়ঃ" কথা লিখে মাতৃকুলের প্রতি স্নেহ এবং কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত কৌটিল্যের অনুমতি বিনা কোন বীরকেই বীর বলে স্বীকার পর্যন্ত করত না। তাই তার মাতৃকুলের উপর শ্রদ্ধার আশাও আমি করতাম না।

অগ্রোদকার সকল আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবেরা আমার পিতার সম্পত্তি খুব যত্নে সংরক্ষিত করে রেখেছিল। তারা আমাকে

যৌধেয় জাতির সবচেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে মনে করত। তারা ইতিমধ্যে বহুপ্রকারে আমার সংবাদ জানবার চেষ্টা করেছে। আমার উপস্থিতিতে সকলে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেল। কিন্তু আমি আশ্চর্য হলাম যে ভবিষ্যৎ বিপদ সম্বন্ধে তারা মোটেই সতর্ক নয়। হয়ত লিচ্ছবি-দৌহিত্রের মত তারাও যৌধেয়-দৌহিত্রের উপর খুব বেশী আশা করে বসে ছিল এতদিন।

আমি প্রথমেই গণবৃদ্ধের কাছে গিয়ে তাঁকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা বোঝাতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু একদিনের আলোচনায় বুঝলাম যে, তিনি এখনও পুরোনো পৃথিবীতে বিচরণ করছেন। অগত্যা আমি তরুণদের ডেকে জড়ো করলাম। তাদের বোঝালাম যে যৌধেয়-জাতির নৌকা চলতে চলতে ভীষণ বিপদের দিকে এগিয়ে চলেছে। চন্দ্রগুপ্তের কাছ থেকে কোনও প্রকার দয়া আশা করা নির্বোধের কাজ হবে। এমন কি চন্দ্রগুপ্ত হয়ত প্রথমেই যৌধেয়কে তার তীরের নিশানা করবে।

বন্ধু রেবতক আমার কথা শুনে প্রশ্ন করলো—ক্ষত্রপ, বাকাটক হাতের কাছে থাকতে যৌধেয়কে আগে আক্রমণ করবে কেন ?

—কেন না চন্দ্রগুপ্ত তার সকল প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আমাদেরই সবচেয়ে নির্বল মনে করে।

—চন্দ্রগুপ্ত যৌধেয়কে ভালকরে জানে ?

—নিশ্চয়। চার শত্রুর এক শত্রু যৌধেয় ভূমির সব সংবাদই সে রাখে। তার পক্ষে সবচেয়ে দুর্বলকে প্রথমে আক্রমণ করা মোটেই অসম্ভব নয়। তাছাড়া চন্দ্রগুপ্তকে তোমরা এতখানি মূর্খ মনে করো না যে, একসঙ্গে চারজনের উপর সে আক্রমণ করবে।

—আমাদের নির্বল মনে করে কেন ?

—তোমরা কেউ গিয়ে আমাদের গণবৃদ্ধের সঙ্গে আলোচনা করলেই বুঝতে পারবে। অগ্রোদকা, রোহিতকী, পৃথুদকা প্রভৃতি সব জায়গায় গিয়ে একবার দেখে এসো যে গত ত্রিশ বছরের তুলনায় এখন আমাদের শক্তি বেড়েছে না কমেছে। যদিও যৌধেয় তরুণরা

তাদের জন্মভূমির জন্য এখনও সব-কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। কিন্তু সকল যৌধেয় গণ-বৃদ্ধদের মতি-মতলব অন্যরকম। তাছাড়া গত ত্রিশ বৎসর যাবত যে সকল ধনী কারবার করে প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করেছে তারা কখনই যুদ্ধ-বিগ্রহ পছন্দ করবে না। তাদের সন্তানেরা যৌধেয়ের অপেক্ষা বণিক হয়ে থাকা পছন্দ করবে।

রেবতক সকল কথা শুনে স্বীকার করল। স্বীকার না করবারও কথা নয়। তারা জানত যে আমার চেয়ে বেশী চন্দ্রগুপ্তকে জানা এ পৃথিবীতে আর কারও সম্ভব নয়। যৌধেয় ভূমিতে বসে চন্দ্রগুপ্তের প্রস্তুতির সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আমি ওদের দেখিয়ে দিলাম, কেমন করে কম্বোজ, তুষার, সিন্ধ প্রভৃতি দেশের ঘোড়া যমুনার তটে এসে হাটে হাটে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। এর আগে কখনও ঘোড়ার দাম এত বাড়েনি এবং এত লাভও হত না এই ব্যবসায়ে। হঠাৎ ঘোড়ার চাহিদা বেড়ে যাওয়াও লক্ষ্য করবার মত।

অতঃপর আমি পঁচিশজন ভিন্ন ভিন্ন নগরের যৌধেয় তরুণকে অশ্ব-বণিক সাজিয়ে পাটলিপুত্র পাঠালাম। যদিও সীমান্তে পৌঁছতেই তারা আশাতীত মূল্য পেয়েছিল, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য হল পাটলিপুত্রে যাওয়া তাই পাটলিপুত্রে গিয়েই বিক্রি করেছিল তারা।

ফিরে এসে সেই পঁচিশজন ছদ্মবেশী অশ্ব-বণিক যৌধেয় জানালো যে বিক্রমাদিত্য কোনও ভীষণ বিক্রম দেখাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমি বন্ধুদের বুঝিয়ে দিলাম যে গুপ্তরাজ্যের চর যৌধেয় ভূমিতেও যথেষ্ট রয়েছে এবং চন্দ্রগুপ্ত প্রতিদিন এখানকার সংবাদ পাচ্ছে। ভিক্ষু, ভিখারী, বণিক, জ্যোতিষী প্রভৃতি যত পূর্বদেশীয় লোক যৌধেয় ভূমিতে ঘোরাফেরা করছে, তারা প্রায় সকলেই চন্দ্রগুপ্তের গুপ্তচর। অতএব আমাদের অতি সাবধানে প্রস্তুত হতে হবে।

কৌশল করে আমি যৌধেয় ভূমিতে ঘোড়দৌড় খেলার প্রবর্তন করলাম। বাহ্যিক উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জুয়ায় অর্থলাভ বা সুনাম ক্রয়। তাছাড়া শুধু শিকার করবার সখের জন্য শূয়র প্রভৃতি জানোয়ার শিকার করবার রীতি প্রবর্তন করলাম। গোপনে গোপনে আখড়ায়

ভীড় জমতে লাগলো। দিনের বেলায় প্রায়ই সুরা ও নারীর প্রতি অনুরক্ত হওয়ার অভিনয় করতে লাগলো যৌধেয় যুবকরা। কোনদিন যদি অস্ত্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একশত লোক জমা হত, ঠিক তার পরদিন স্ত্রী-পুরুষের মিলিত নৃত্যগীত দেখবার জন্য এক সহস্র লোক জমা হতে লাগল। সমগ্র যৌধেয় ভূমির গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট দল বেঁধে সৈনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করলাম। যৌধেয় তরুণরা সকল সময় নেশায় বুঁদ হয়ে থাকতো। যদিও সেটা কৃত্রিম নেশা।

এ রহস্য শুধু তরুণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো। বৃদ্ধদের মনের অবস্থার জন্য তাদের কাছেও রহস্য প্রকাশ করিনি। তাদের চোখে তরুণরা দিন দিন জাহান্নামের পথে চলতে লাগল। একদিন বৃদ্ধ পুরস্কর্তা আমাকে ডেকে বল্লেন—তরুণদল তোমার কথায় ওঠে বসে তা আমি জানি। কিন্তু তুমি কি এসব কার্যকলাপ খারাপ মনে করছ না, যে তরুণরা সদাসর্বদা সুরার নেশায় বেহুঁশ হয়ে থাকে, তরুণীদের সঙ্গে নাচানাচি করতে গিয়ে নিজেরা মারামারি করে।

—স্বীকার করছি যে ওরা খারাপ রাস্তায় যাচ্ছে, কিন্তু ওদের দোষ আমি ততখানি দেখছিনা। কারণ গত বিশ ত্রিশ বছর যাবত বৃদ্ধদের আস্কারা পেয়েই ওরা ঐ রকম হয়েছে।

—কিন্তু আমরা ত কখনও এমন ছিলাম না।

—ছিলেন না প্রকাশ্যে, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক কিছুই করেছেন আপনারা। মথুরার মহারাজার নকল করেছেন আপনারা। তাদের অন্তঃপুর দেখে এসে আপনারা একাধিক সুন্দরী দাসী রাখছেন। যদিও সেগুলি গোপনে, তাহলেও আমাদের যৌধেয় জাতির পক্ষে সে গুলি কলঙ্কজনক এবং অপরাধ। সে অপরাধ আপনি আমাকে গোপন করতে পারেন, সে অপরাধ আপনার নিজের সন্তানদের কাছে গোপন রাখতে পারেন কি? ঠিক এমনি করে এক জনের থেকে আর একজনের মধ্যে বিলাসিতা, কামনা বাসনার বীজ ছড়িয়ে পড়েছে।

—তাহলে এখন তুমি সে ভার নাও। যদি সত্যিই গুপ্তদের

সঞ্চয় পড়ে থাকে যৌধের ভূমির উপর, যদি সত্যিই তেত্রিশ বৎসর আগের মত গুপ্ত ফৌজ এসে যৌধেয় ভূমিতে আগুন জ্বালায়, ধ্বংস করতে আরম্ভ করে, তাহলে কে দাঁড়াবে সেই শত্রুর বিরুদ্ধে। কে রক্ষা করবে জন্মভূমিকে।

—রক্ষা করবার কথা দূরে থাক। এখনো আমাদের দেশের যৌধেয় বণিকরা লক্ষ লক্ষ ঘোড়া দ্বিগুণ লাভে গুপ্তদের কাছে বিক্রি করে তাদের শক্তি বৃদ্ধি করছে পরোক্ষভাবে। আমার মতে এক সঙ্গে দুদিকের স্বার্থরক্ষা করা যায় না। হয় দ্বিগুণ লাভে ব্যবসা করে অর্থসঞ্চয় করুন নতুবা দেশকে তৈরী করুন এবং স্বাধীনতা রক্ষা করুন। তবে যৌধেয় স্বতন্ত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব। কারণ আপনাদের পক্ষে চীনাংশুক ত্যাগ করে মোটা চীবর পরা এখন খুবই কষ্টকর হবে। গন্ধশালী ও গোধুম চূর্ণ ত্যাগ করে কোদো খাওয়া। পঞ্চভূমিক সৌধ এবং প্রাসাদ ত্যাগ করে মামুলী ঘরে বাস করা খুব অসুবিধার কথা। যৌধের ভদ্র পুরুষদের স্বগায় সুখ থেকে বঞ্চিত করা হবে শুধু।

—বৎস জয়! এখন আমি বুঝতে পারছি যে মনে কতখানি আঘাত পেয়ে তুমি এমন কঠোর শব্দ প্রয়োগ করতে বাধ্য হচ্ছ। আমরা এতদিন সত্যিই অন্ধকারে ছিলাম, ভুলপথে চলেছিলাম, সেজন্য আমাদের উপর তোমার রাগ বা অভিমান করা উচিত হয়েছে। কিন্তু যৌধেয় ভূমির উপর তুমি রাগ করে চুপ থেকোনা। যদি আমরা ভুলপথে চলে যৌধেয় মাতৃভূমির সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়ে থাকি, তাহলে তুমি কি আমাদের তাই করতে দেবে? না আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে সাবধান করে দেবে। কথা বলতে বলতে বৃদ্ধ পুরুকর্ত্তার চোখে জল আসে। আমি তাঁর পা ধরে বিনয় করে বল্লাম,—আর্য, কঠিন শব্দ প্রয়োগের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি বিশ্বাস রাখুন আমরা আমাদের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে আমাদের মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষা করব। আজ রাত্রে আমার সঙ্গে চলুন আপনাকে দেখাব যে চন্দ্রগুপ্তের চোখে ধূলা দেবার জন্য আপনাদের তরুণরা কী করছে।

সন্ধ্যাবেলা বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি আমাদের কোন দলের কার্যকলাপ দেখতে চান। তিনি এমন একটা আখড়ার নাম করলেন যাদের নামে বৃদ্ধ মহলে সবচেয়ে বেশী দুর্নাম রটেছে। আমি তাকে নিয়ে সেই আখড়ায় পৌঁছলাম। আমাদের দেখে সকল তরুণ তরুণীরা ভীষণ মাতলামি সুরু করল। কেউ শুয়ে শুয়ে গান ধরেছে, কেউ বা নেশায় বুঁদ হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে। কেউ বা বৃদ্ধকে দেখে ঠাট্টা করছে আবার কেউ বা বৃদ্ধের কাছে এসে হাত জোড় করে ক্ষমা চাইছে। বৃদ্ধ দেখেশুনে বিষণ্ন মনে আমাকে বল্লেন—বৎস চলো আমরা অন্যত্র যাই। নেশার খেয়ালে হয়ত আমাদের অপমান করে বসতে পারে। আমি তাড়াতাড়ি সুরাপাত্র থেকে এক পাত্র সুরা ঢেলে নিজে এক চুমুক খেয়ে আর এক পাত্র বৃদ্ধের দিকে এগিয়ে দিলাম। বৃদ্ধ এক চুমুক খেয়ে বল্লেন,—কই এতে ত সুরার গন্ধমাত্র নেই। এতো মিষ্টি জল। তখন সকল তরুণ তরুণীরা ভাল মানুষের মত সোজা হয়ে দাঁড়াতে বৃদ্ধ আসল ব্যাপার বুঝতে পেরে তাদের উদ্দেশ করে বললেন—প্রিয় যৌধেয় কুমারগণ, আমি আজ যা চোখে দেখলাম তাতে আমি শুধু আশ্চর্যই হইনি, তোমাদের কী বলে আশীর্বাদ করব জানি না। তবুও একটা কথাই আমি বলতে চাই যে তোমাদের হাতেই যৌধেয় মাতার লজ্জা নির্ভর করছে। সকলে মিলে একসঙ্গে বৃদ্ধের কথার উত্তরে জানালো—আগে আমাদের প্রাণ যাবে, তারপর যৌধেয় মাতার স্বতন্ত্রতা হরণ করবে।

পুরস্কর্ত্তার চোখে জলের ধারা নেমে আসে, তিনি আর কিছু বলতে পারেন না।

ইতিমধ্যে আমাদের মধ্যে যারা ধনী ছিল তারা যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য তাদের সকল অর্থ দান করেছে। এমন একজন ও যৌধেয় তরুণ নেই যাকে আমি আমাদের সংগঠনের বাইরে রেখেছি। শুধু তাই নয়, তরুণীদেরও আমি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেছি। তারা তীর ও বর্শা চালনায় পুরুষদের সমকক্ষ হয়ে উঠেছে।

এমনি করে দেখতে দেখতে একবছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রস্তুতি আশাতীত ভাবে সাফল্যলাভ করেছে। একদিন গণসভা ডেকে বৃদ্ধ পুরস্কর্তা উপস্থিত সকলকে অনুরোধ করে বল্লেন, যৌধেয় পুরস্কর্তার নামের আগে যে মহারাজ কথাটা এতদিন যোগ করে দেওয়ার প্রথা আছে বর্তমানে আমি অনুরোধ করছি এই বিষসদৃশ কথাটি বাদ দেওয়া হোক। কিন্তু নতুন লাখপতি জালুক সে কথার প্রতিবাদ করে বললো—অনাদিকাল থেকে যে নিয়ম চলে আসছে, তাকে আমরা অস্বীকার করতে পারবো না। গণসভা তাদের যোগ্য ব্যক্তিকে এই সম্মান দিয়ে আসছে। এতে কারও ব্যক্তিগত অমতের কিছু থাকতে পারে না।

উপস্থিত আরও দু'চারজন ধনী জালুকের যুক্তির সমর্থন করলো। তখন আমি পুরস্কর্তার অনুমতি নিয়ে তাদের বুঝিয়ে দিলাম, যেখানে সকলের সমান অধিকার, পদবী কর্তার নিজের খেয়াল খুশীমত কিছু করবার নেই, সেখানে এমনি ধরণের পদবী বা সম্মান দেওয়ার কোন অর্থ থাকতে পারে না। ঐ চারটি অক্ষরের শব্দ মানুষের মনে অহং ভাব জাগিয়ে তোলে, অন্যের মনে ঈর্ষা জাগায়। অনাদিকাল থেকে এই নিয়ম চলে আসছে, একথা ভুল। কারণ গণতন্ত্রই একমাত্র আদি ও পুরাতন নিয়ম! পূরাকালে এমন কোন পদবী দেওয়ার প্রথা ছিল না। যে সময় থেকে এই প্রথা চালু হয়েছে, সে সময় এটার একমাত্র কারণ ছিল তৎকালীন প্রতাপশালী শক বা যবনদের সন্তুষ্ট করবার জন্য। তাছাড়া আমাদের পুরস্কর্তাকে যদি আমরা সত্যিই মান্য করে চলতে চাই, তাকে শ্রদ্ধার ভাব দেখাতে চাই, তাহলে আমরা শুধু আর্য বলেও সেই ভাব প্রকট করতে পারি, শুধু গণপতি বা যৌধেয় সেনাপতি বলেও তাকে মান্য করতে পারি।

আমার যুক্তিই অবশেষে ফলবতী হল এবং সর্বসম্মতিক্রমে মহারাজ পদবী উঠিয়ে দেওয়া হল।

আমাদের এক বৎসরের প্রচেষ্টায় যৌধেয় দেশের চেহারা ফিরে গেল। জালুক এবং আরও দু'চারজন ধনী ব্যবসায়ী ছাড়া সমগ্র

যৌধেয়রা আমাদের প্রশংসা করতে লাগলো। ইতিমধ্যে মাধব আমাদের সবকিছু দেখে শুনে মালবদেশে গিয়ে চেষ্টা করছিল তাদের গণকে একত্রিত করতে, কিন্তু মালবগণ ওর কথায় কর্ণপাত করেনি। তাই মাধব আবার ফিরে এসেছে। সেদিনকার সভায় সবশেষে আমাদের অশ্বপতি সেনাপতি আমাদের অশ্বের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বললো— বর্তমান যুদ্ধে ঘোড়ার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী, অথচ সেদিকে আমরা অনেক দুর্বল। যত ঘোড়া আমাদের দরকার তার সিকিও নেই। ততগুলি ঘোড়া কিনতে হলে যেমন প্রচুর অর্থের দরকার, তেমনি চাহিদা অনুযায়ী ঘোড়া পাওয়াও অসম্ভব।

সেনানায়ক রেবতক তার অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে বললো— আমার বাড়ীতে কয়েকটি কম্বোজ দেশীয় ঘোড়া রয়েছে এবং আমাদের দেশীয় স্ত্রী ঘোড়াও আছে। তাদের যে বাচ্চা হয়েছে সেগুলি কম্বোজ বা তুষার দেশীয় ঘোড়ার চেয়ে কোন অংশেই খারাপ নয়। অতএব আমার মতে এই উপায়ে যদি চেষ্টা করা যায় তাহলে আমাদের দেশের কমপক্ষে দশহাজার স্ত্রী ঘোড়ার কাছ থেকে এক বছরে দ্বিগুণ বাচ্চা আশা করতে পারি।

রেবতকের যুক্তির সমর্থন করলাম আমরা সকলে এবং সেইদিন থেকে যৌধেয় ভূমি থেকে বাইরে ঘোড়া বিক্রী বন্ধ করে দেওয়া হল। পরে এই উপায়ে আমরা আশাতীত ফল পেয়েছিলাম।

চন্দ্রগুপ্তের গুপ্তচর তবুও আমাদের সংবাদ কিছু কিছু সংগ্রহ করছিল। আমাদের চর মারফত আমরা জানতে পারলাম চন্দ্রগুপ্ত খুব ব্যস্ত হয়েছে পড়েছে। কিন্তু আমরাও প্রস্তুত আছি এ খবরও গুপ্ত সম্রাট জানে। ইতিমধ্যেই মথুরার উপরিক জালুকের মত তার দু'একজন পরিচিত মারফত আমাদের ধমকও দিয়েছে কিন্তু আমরা খুব নম্রভাবে জানিয়ে দিলাম যে, আমরা চিরকাল গুপ্ত পরমভট্টারকের সহায়কও মিত্র হয়েই থাকতে চাই।

হঠাৎ একদিন আমাদের চর এসে জানালো যে গুপ্তবাহিনী যৌধেয় সীমান্ত অভিযানে রওয়ানা হয়েছে। তবে আমাদের একটা

বিষয় বিশেষ ভাববার ছিলনা, সেটা হল দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমান্তের প্রতিবেশী রাজ্যগুলি। মহাসেনাপতি বৃদ্ধ গণপরিষদের অধিবেশন ডেকে সভাসদদের কাছে সংবাদ জ্ঞাপন করলেন। পরিষদ তিনজন সভ্যকে নিয়ে যুদ্ধসমিতি গঠন করলেন এবা তাদের উপর যুদ্ধের ভার অর্পণ করলেন। এই তিনজন হল মহাসেনাপতি বল্ল, আমি ও সেনানায়ক রেবতক। অতঃপর কুনিন্দ ও আর্জুনায়ন সঙ্ঘের দুজন সেনানায়ক এসে যোগ দিল, ধনমিত্র ও শিব। মথুরার পশ্চিম সীমান্ত থেকে স্রুঘ্ন (অম্বালা) পর্যন্ত সীমান্তের আমাদের সকল দুর্গ প্রস্তুত করে নিলাম। আমাদের সবচেয়ে বড় নগর ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লী) কাছাকাছি ছিল বলেই এইখানেই যুদ্ধের প্রথম আক্রমণের আশঙ্কা করেছিলাম! তাই আমি রেবতক ও মাধবসেন আমরা এইখানে রইলাম।

কুরু (মীরাট) দেশের জনসাধারণ যদিও দুই সহস্রাব্দি থেকে তাদের গণ-স্বতন্ত্রতা হারিয়েছে, তবুও গুপ্তরাজার উপর তারা মনে মনে খুশী নয়। এ সময়ে তারাও আমাদের সহায়ক হল।

হস্তিনাপুর এবং তার আশেপাশে গুপ্তসেনা এসে উপস্থিত হল। প্রতিমূহূর্তে অশ্বারোহী চর আমাদের সংবাদ পৌছে দিচ্ছে। পদাতিক অশ্বারোহী এবং পাঁচশত হস্তীসেনাও এসেছে গুপ্তফৌজের সঙ্গে। আমারা অবশ্য যমুনার ওপারে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারতাম কিন্তু তাতে আশঙ্কা ছিল নদী পার হয়ে যদি ঠিকমত রসদপত্র সরবরাহ না হয় তাহলে বিপদ আসতে পারে। অতএব আমরা নিজ সীমান্তের কাছাকাছি সকল গ্রাম খালি করে শত্রুকে আসার সুযোগ দিয়ে ওৎ পেতে রইলাম। আগে থেকে বহুদূর পর্যন্ত সকল নৌকা আমরা হস্তগত করেছিলাম। তাই নিশ্চিন্ত ছিলাম যে এপারে শুধু পদাতিক বা অশ্বারোহী কিছু আসতে পারে। বড়জোর হস্তীসেনাও আসবে কিন্তু অতবড় রথ এপারে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। যদিও মথুরা থেকে আসা সম্ভব, কিন্তু সেদিক থেকেও আমাদের তিনটি সুরক্ষিত ঘাঁটি পার হয়ে আসতে হবে।

পরদিন যুদ্ধবাজনা বেজে উঠলো যমুনার ওপারে। মাধব বললো—চন্দ্রগুপ্ত মনে করেছে যৌধেয়কে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেবে, তাই খুব ধীরে সুস্থে নিশ্চিন্ত মনে সেনাবাহিনী নিয়ে আসছে যুদ্ধ করতে। আমরা চুপচাপ লক্ষ করছিলাম। পাঁচদিন এমনি সাজগোছ করতে কাটল। তার পরদিন অস্টমী। সেদিন মধ্যরাত্রে চাঁদ অস্তে গেল। অন্ধকার হয়ে এলো পৃথিবী। চারিদিক নিস্তব্ধ। দুইপারে হাজার হাজার লোক রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে এমন সময় জলের মধ্যে থপ থপ শব্দ হতে আমাদের সৈনিকরা সজাগ হয়ে উঠল। তিন চার পংক্তিতে হাতির দল এগিয়ে আসছে। তাদের পদশব্দে সমুদ্র মন্থনের কথা মনে পড়ে। আমরা ইচ্ছে করে বিশ পচিশটা হাতীকে তীরে উঠে আসতে সুযোগ দিলাম, তারপরেই আমাদের সৈনিকরা অজস্র বান বর্ষণ করতে আরম্ভ বরল, সেই সঙ্গে বর্শা চলল অজস্র।

মূহূর্তে হাতীর দল অতিষ্ঠ হয়ে অন্যদিকে মোড় ঘুরল। কিন্তু চারিদিকে মাটির মধ্যে আমারা লোহার কাঁটা পুতে রেখেছিলাম, কোথাও বা গর্ত খুঁড়ে রেখেছিলাম। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যে হাতীর দল কাবু হয়ে পড়ল। সামনে বর্শা ও বান, আশেপাশে লোহার কাঁটার ঘা খেয়ে যন্ত্রনায় ছুটোছুটি করতে গিয়ে আবার কাঁটার আঘাত নয়ত গর্তের মধ্যে পড়তে লাগল। দুই দণ্ডের মধ্যেই আমরা যুদ্ধের গতি বুঝতে পারলাম। কিন্তু সূর্যোদয় পর্যন্ত যুদ্ধ চললো। ইতিমধ্যে বহু গুপ্তসেনা বন্দী হয়েছে আমাদের হাতে। তার মধ্যে গুপ্ত সেনানায়ক বীরসেন অন্যতম।

বন্দী অবস্থায় বীরসেনকে আমার সামনে হাজীর করলো আমাদের সেনা। আমি তাকে দেখেই তার কাছে গিয়ে স্পর্শ করে বললাম— বিমাদিত্য মহাবলাধিকৃত, যৌধের ভূমিতে আপনাকে স্বাগত জানাই। বীরসেন আমার দিকে মাথা তুলে একবার দেখেই হেসে ফেলল। "বন্ধু বীরসেন, যে পরিবেশে আমাদের সাক্ষাত হল তা নিয়ে ভাববার প্রয়োজন নেই। এখন আমরা কেউ কারও শত্রু নই।

আমি বীরসেনকে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আমার বাড়ীতে নিয়ে সবরকম সুবিধার ব্যবস্থা করতে আদেশ করলাম।

সূর্যোদয় হতেই আমরা যমুনাতটে উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তখনও বহু গুপ্তসেনা আদেশের অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমাদের সেনা দেখেই তারা পিছন ফিরে নিজেদের এলাকায় ফিরে গেল। যৌধেয় সেনারা বিজয়োল্লাসে চীৎকার করে উঠল।

আমি বন্দীদের নিয়ে মহাসেনাপতি বল্লর কাছে গিয়ে আমাদের বিজয় বার্তা শোনালাম। তিনি আনন্দে আমাকে, রেবতক ও মাধবসেনকে আলিঙ্গন করলেন।

অতঃপর আমাদের বিজয়বার্তার সংবাদ নিয়ে সংবাদবাহী রওয়ানা হল। অগ্রোদকা, রোহিতকী, পৃথুদকা, খাণ্ডিলা এবং কুলিন্দ ও আর্জুনায়ন প্রভৃতি সকল জায়গায় সংবাদ পৌছতে সারা যৌধেয় ভূমিতে আনন্দোৎসবের আয়োজন হল।

ততক্ষণ চন্দ্রগুপ্ত তার পরাজিত বাহিনী নিয়ে হয়ত দূরে গিয়ে কোথাও বিশ্রাম করবার কথা ভাবছে।

বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে প্রথম যুদ্ধে আমরা বিজয়লাভ করলেও আমরা জানতাম যে চন্দ্রগুপ্ত অত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। আজ হোক অথবা দশবৎসর পরে হোক এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে ও নিশ্চয় আবার যৌধেয় ভূমি আক্রমণ করবে। প্রথমবার আমাদের সৈন্যদের রণ-নিপুণতা বা শক্তি সম্বন্ধে কিছুই আন্দাজ করতে পারেনি গুপ্ত সেনা। কয়েকদিন পর আমি চন্দ্রগুপ্তের কাছে সংবাদ পাঠালাম যে বীরসেন বন্দী অবস্থার বদলে আমার বাড়ীতে বন্ধুর মত বাস করছে। সুস্থ হয়ে উঠলেই তাকে সসম্মানে পাঠিয়ে দেব।

সবচেয়ে আনন্দের কথা হল যৌধেয় রমনীরা এই যুদ্ধে আমাদের সহায়তা করেছে সবচেয়ে বেশী। তারা নিজেরাও অস্ত্রধারণ করেছে শত্রুর বিরুদ্ধে। যুদ্ধ বিদ্যা শেখাবার সময় আমি প্রত্যেক যৌধেয় রমণীকেও শেখাবার ব্যবস্থা করেছিলাম।

আমি জানতাম এমন একদিন আসবে যেদিন নিজের জাতকে, জন্মভূমিকে রক্ষা করতে পুরুষের পাশে নারীকে দাঁড়াতে হবে। সেদিন যৌধের রমণীর হাতে কঙ্কণের বদলে খড়গ শোভা পাবে, মাথায় বেণীর বদলে শিরস্ত্রান, মঞ্জুশ্রীর বদলে বুকে থাকবে বর্ম।

সেদিনকার যুদ্ধে যৌধেয় রমণী তার প্রমাণ দিয়েছে। যদিও নারী সেনাবাহিনীকে যুদ্ধ করবার কোন আদেশ গণপরিষদ দেয়নি তবুও বৌদি সুনন্দা তার দুই বোন নন্দা আর বসুনন্দা ত্রিশ চল্লিশ জনের একটি ছোট দল গঠন করে, কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। যুদ্ধ হয়েছিল রাত্রে। তাই রাত্রে নারীসেনার যুদ্ধ করাটা যদিও গণপরিষদ নিন্দার চোখে দেখেছিল, কিন্তু সে দোষ ছিল আমার। আমিই তাদের অস্ত্র ধরতে শিখিয়েছিলাম।

সুনন্দা বৌদির সে রাত্রের বীরত্বের কথা যৌধেয় জাতির কাছে চিরস্মরণীর হয়ে থাকবে যতদিন একজনও যৌধেয় বেঁচে থাকবে।

যদিও সেদিন রাত্রের অন্ধকারে ও যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার জন্য আমি স্বচক্ষে তার যুদ্ধ দেখতে পারিনি তবুও যতটুকু শুনেছি বা দেখেছি তাতে তার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হয়ে আসে। যুদ্ধকালে হঠাৎ শত্রুপক্ষের পাঁচটি হাতী আমাদের সৈন্যদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তখনি ত্বরিতগতিতে সুনন্দা, নন্দা ও বসুনন্দা কুড়ি পঁচিশজন নারী সেনাকে নিয়ে হাতীর সামনে দাঁড়িয়ে বর্শা দিয়ে দুটো হাতীর চোখে আঘাত করে দুটো হাতীকেই অন্ধ করে দেয়। যন্ত্রনার ক্ষিপ্ত হাতী হঠাৎ সুনন্দা বৌদিকে শুঁড় দিয়ে ধরে পায়ের তলায় ফেলে পিষ্ট করতে থাকে। পলক না পড়তেই নন্দা তার হাতের খড়গ দিয়ে হাতীর শুঁড়ের অর্ধেকটা কেটে ফেলে। যন্ত্রণায় হাতীগুলি পিছন দিকে পালায়। সুনন্দার সখীরা যখন তার শুশ্রূষায় ব্যস্ত তখন সুনন্দার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনে সকলে চমকে ওঠে। সুনন্দা আদেশ করল আমাকে ছেড়ে দিয়ে আক্রমণ কর। একটিও শত্রু যেন পালাতে না পারে। তার আদেশ পালন করল, কিন্তু হায়! ফিরে

এসে দেখল তারা সুনন্দার দেহে আর প্রাণ নেই। ওরা প্রত্যেকেই আহত হয়েছিল। তার মধ্যে বসুনন্দা সবচেয়ে বেশী। বৈদ্য আশা দিয়েছে, কিছু সময় লাগবে একেবারে সুস্থ হয়ে উঠতে।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক দেড় মাসের মধ্যে যৌধেয় ভূমির বিরাট পরিবর্তন শুরু হল। এতদিন যাদের উৎসাহ শুধু মৌখিক ছিল, তারাও তৎপর হয়ে উঠল। তাদের চিন্তা হল দেশকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে হবে। সাপের মাথা থেঁৎলে দেওয়া হয়নি, শুধু আঘাত করা হয়েছে, সে ফণা তুলে তেড়ে আসবে একদিন।

তবুও জালুকের মত দু'চারজন ধনী ও দু'চারজন বৃদ্ধ আমাদের ক্রিয়া কলাপকে যেন সানন্দে সমর্থন করতে পারছিল না। আমাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। এবার আমরা প্রথমে চাষের উন্নতির জন্য যৌথভাবে কাজে নেমে পড়লাম। নারী পুরুষে কোন ভেদাভেদ নেই, যে যতখানি পারবে কাজ করবে। আমাদের মিলিত ভাবে কাজ শুরু করা দেখে সারা গ্রামবাসী ছুটে এলো। বৃদ্ধেরা বললো—দু'দিনের হুজুগ বইত নয়। কোদাল চলোনো ঠাট্টা নয়। মাথার ঘাম গা বেয়ে নামতে আরম্ভ করলেই শখ মিটে যাবে। প্রথম কয়েক দিন সত্যিই খুব কষ্ট হতে লাগল। অনভ্যস্ত হাতে ফোস্কা পড়ল অনেকের। রৌদ্রে পুড়ে চেহারা লাল হয়ে উঠল। নন্দা তার স্বামী রেবতকের কাছে এসে বললো—আর্যপুত্র! একটু বিশ্রাম করে নাও।

হাসতে রেবতক জবাব দিল—এটা ক্ষেত। এই কাদামাটি মাখা লোকটাকে আর্যপুত্র বলে অপমান করোনা দেবি।

—তাহলে কি বলে ডাকব?

—অন্য যা খুশী। হয় রেবতক বলো নইলে মশা, মাছি, ছারপোকা যেটা বলতে ভালো লাগে। ঠোঁট বাঁকা করে নন্দা বললো—যদি আমার বীর স্বামী ঐ সব নামের উপযুক্ত হত, তাহলে সেই নামে ডাকতে আমার জিব এতটুকু কাঁপতো না।

—আমার মতে সোজাসুজি রেবতক অথবা রেবত বলেই ডাকবে

কেমন ? আর পরিশ্রমের কথা বলছ ? আমার চেয়ে বরং তুমিই একটু বিশ্রাম করে নাও।

—না আমি যে আমার সখীদের মুখ্য।

—আর আমাদের মুখ্য হল জয়—

আমি এতক্ষণ ওদের কথা শুনছিলাম। আমার নাম শুনে আমি বললাম—নন্দা বৌদি, তার চেয়ে বলনা কেন কাজ ছেড়ে ঐ গাছতলায় চল দুটো কথা বলি। আমাদের কথা ছেড়েই দাও।

—তোমাকে আর বলতে হবে না। সেদিনকার দুধ আনবার কথা আমার মনে আছে। ভুলে যেওনা আমি সেই নন্দা।

সেদিনকার কথা মনে পড়লে প্রথমে সুনন্দার কথা মনে পড়ে। হঠাৎ আমার মনটা বিষাদে ভরে ওঠে।

—হ্যাঁ, তুমি সেই নন্দাই আছো, কিন্তু আজ আর সুনন্দা বৌদি নেই যে ছুটে এসে আমাদের ঝগড়া মিটিয়ে দেবে। সুনন্দার কথা বলতে নন্দার মুখটা কালো হয়ে গেল।

যৌথ প্রথায় চাষ করবার ফলে আমাদের দেশের পরিবর্তন যে এত তাড়াতাড়ি আসতে পারে তা কখনও ভাবিনি। সবচেয়ে বড় পরিবর্তন হল দাস ও কর্মকরদের মধ্যে। এতদিন তারা শুধু পশুর মত ব্যবহার পেয়ে এসেছে প্রভুদের কাছে। এবার যৌথ চাষের সময় সকলে যখন মাঠে নামল, তখন দাস কর্মকররাও বাদ গেল না। ক্ষেতে এলে আর কেউ কারও দাস নয় কেউ কারও মালিক নয়। সকলে এসেছে তাদের পরিশ্রম দান করতে। দুপুরে যখন আমরা সকলে মধ্যাহ্ন ভোজন করতাম তখন দাস কর্মকররাও বসত আমাদের সঙ্গে। আমরা যা খেতাম ওরাও খেত তাই। ফলে দেখা গেল ফসল কাটবার সময় অবধি দাসদের উপর মালিকদের মনোভাব অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একসময় যাদের দেখে চোঁখে চোখ রেখে কথা বলবার নিয়ম ছিল না এখন তারা নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা করতে লাগল। ফসল কাটবার সময় তাদের আনন্দ দেখলে মনে হত স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তাহলেই এইখানেই আছে।

॥ সতেরো ॥

বিবাহ

বসুনন্দা আমাকে বহুবার দেখেছে। আলাপও যে একেবারে হয়নি তা নয়। কিন্তু তখন ওকে নিতান্ত বালিকা মনে হত। তারপর সেদিন যখন যমুনার তীর থেকে যুদ্ধে আহত হয়ে বাড়ী ফিরে এল, তখন আমি প্রায় রোজই ওকে দেখতে যেতাম। সমস্ত শরীরেই অস্ত্রের চিহ্ন ছিল। কিন্তু সব চেয়ে বড় আঘাত পেটের কাছে। ঠিক বুকের নীচে বর্শার সাঙ্ঘাতিক আঘাত। চিকিৎসা ঠিক সময় মত হয়েছিল তাই রক্ষে। জীবন মৃত্যুর টানা হেঁচড়া চলল কটা দিন। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য ওর লালমুখ কাপাসের মত সাদা হয়ে গেছে। গণপুরকর্তা প্রতিদিন একঘণ্টা বসুনন্দার কাছে গিয়ে বসে থেকে দেখাশুনা করে আসতেন। সুনন্দা বৌদি তার বীরত্বের পুরস্কার নেবার সময় পায়নি। কিন্তু বসুনন্দা সত্যিই ভাগ্যবতী। প্রতিদিন শত শত লোক আসত তার সংবাদ নেবার জন্যে।

বসুনন্দাকে আমি নানাভাবে দেখেছি। যখন ওর মুখ একেবারে রক্তশূন্য সাদা হয়ে গিয়েছিল তখনো দেখেছি। সেই অবস্থায়ও ওর টানা ভ্রূযুগলের নিচেকার চোখদুটিকে বড় সুন্দর মনে হত। ধীরে ধীরে কথা বলত বসু। কিন্তু ওর গলার স্বর এমন মধুর ছিল যে মনে হত বার বার শুনি। যখন আমি চন্দ্রগুপ্তের বিষয়ে কোন পরিহাস-পূর্ণ কথা বলতাম, তখন বসু খিলখিল করে হেসে ফেলত এবং তার মুক্তোর মত দাঁতগুলির শ্বেত আভা মুখ সৌন্দর্যকে শতগুন বাড়িয়ে দিত। একদিন জাহাজ ডুবির কথা বলছি। শুনতে শুনতে ওর মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একা সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে নিরুদ্দেশের দিকে চলেছি, সেই সময়ের কথা শুনে বসু বলে উঠলো—কী চমৎকার!

—হ্যাঁ, চমৎকারই বটে। অকূল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সম্বন্ধে তোমার বোধ হয় কোন অভিজ্ঞতাই নেই তাই ও কথা বলতে পারছ।

—অভিজ্ঞতা আছে বলেই ত বলছি। শুনে আমার ঈর্ষা হচ্ছে।

—যেমন তোমার ঐ আহত স্থানটা দেখে আমার ঈর্ষা হয়।

—এতে আবার ঈর্ষার কী আছে? আমিতো মৃত্যুর সঙ্গে লড়বার অবসর পাইনি। চোখের পলকে সব অন্ধকার হয়ে গেল। সুনন্দা দিদিকে পরাজিত করেছে কিন্তু আমাকে পারেনি। আমার মনেই নেই যে কখন মৃত্যুর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলাম আর কখনই বা তাকে ধাক্কা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি।

বসুনন্দার কথা শুনে নন্দা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো—না তা কি আর জানতে পেরেছ? দেশশুদ্ধ লোককে জানিয়ে ছেড়েছ। ছ-টা দিন তোমার চিন্তায় একটা লোকও যদি চোখের পাতা দুটি এক করেছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসুনন্দা বললো—চোখের সামনে আদর্শ ছিল আমার দিদি সুনন্দা। বসুনন্দার চোখ ছল ছল করে ওঠে সুনন্দার কথা বলতে গিয়ে,—যদিও আমাকে সঙ্গে নিতে সকলেরই অমত ছিল।

—হ্যাঁ দেবর। আমারি অমত ছিল। যুদ্ধ মানেই আমরা অবধারিত মৃত্যু বলে জানি। তাই আমার ইচ্ছে ছিল না যে আমরা তিন বোন একই সঙ্গে পৃথিবী থেকে বিদায় নিই।

তারপর আরও কিছুদিন কেটে গেছে। বসুনন্দা সুস্থ হয়ে উঠছে। কিন্তু বেশী পরিশ্রম করতে মানা করে গেছেন বৈদ্য। কে কার কথা শোনে। ইতিমধ্যেই জোর করে ও ক্ষেতে যেতে সুরু করেছে। গম কাটবার সময় তখন। অন্য মেয়েরা যদিও ওকে বেশী কাজ করতে দিত না, তবুও বসু নিজে ধীরে ধীরে সইয়ে নিল।

ক্ষেতের ফসল প্রায় উঠে গেছে। অন্যবারের তুলনায় এবার ফসল হয়েছে দ্বিগুণ। গৃহস্থের আনন্দের সীমা নেই। এবার ফসল এমন আশাতীত ভাবে ফলবার অন্যতম কারণ হল অন্যবারের মত

জলের অভাব ভোগ করতে হয়নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে এবার চাষীর মাথা ব্যথা হয়নি। আগেই আমরা বিরাট একটা জলাশয় তৈরী করেছিলাম। বর্তমানে সেই জলাশয়ের নামকরণ হয়েছে সুনন্দা সাগর। সেদিন তরুণীরা বসুনন্দাকে অন্নপূর্ণার সাজে সাজিয়ে সান্ধ্যোৎসবে হাজীর করলো। বসুনন্দার সে রূপের তুলনা হয় না। চোখ ফিরিয়ে আনা যায় না সে রূপরাশির উপর থেকে। স্বর্ণবেণী বিনুনীর মধ্যে সবুজ রংয়ের কচি কলাইলতার ডগা বুনে দেওয়া। মাঝে মাঝে শ্বেত বর্ণের ফুল। তাছাড়া সর্বাঙ্গে ফুলের অলঙ্কার। একহাতে তার মঙ্গল কলস, অন্য হাতে গমের শীষের গুচ্ছ। বসুনন্দার সখীরাও সকলে পুষ্পালঙ্কারে সেজেছে এবং তারাও সকলে কলাইলতা, কেউ বা গমের শিষ প্রভৃতি হাতে নিয়ে সঙ্গীতের আসরে এসে যোগ দিল। বেশ কিছুক্ষণ সঙ্গীত হল। সংবাদ পেয়ে গ্রামের অন্যান্য আখড়ায় নৃত্য-গীত বন্ধ রেখে সকলে এসে ভীড় করেছে এখানে। দর্শক মণ্ডপ পরিপূর্ণ। তারপর শুরু হল নাচ। রাস-নৃত্য, যুগ্ম-নৃত্য নানাপ্রকারের নৃত্য-অনুষ্ঠান চলল। যুগ্ম-নৃত্যের সময় বসুনন্দার জুড়ী হবার জন্যে দু'তিনজন তরুণী আমাকে টেনে নিয়ে গেল। আমাকে দেখে বসুনন্দা লজ্জা পেল। ওর পা যেন জড়িয়ে এলো। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম—বসু, আমাকে তোমার সাথে নাচতে হবে। বসুনন্দা এগিয়ে এলো। এই প্রথম আমি আর বসুনন্দা একসঙ্গে নাচলাম। সেদিনকার সে স্মৃতি আমার আজীবন মনে থাকবে।

আমার বাড়ীতে একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ নেই। মধ্যে মধ্যে আমার দুই বোন তাদের ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন আসত তখনই তাদের কলহাস্যে বাড়ী মুখরিত হয়ে উঠত। তারা চলে গেলে আবার নিঝুম পুরীর মত পড়ে থাকত। দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল নন্দা বৌদির ঘরে। রাত্রে শোবার সময় নিজের ঘরে এসে শুতাম। তারপর যখন আমাদের তরুণরা আরও সংগঠিত হয়ে উঠল তখন নিজের ঘরে আসবার সময় পেতামনা একেবারেই। সর্বদা আমাকে ঘুরতে হত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে। তাই যেখানে যখন সময় পেতাম

সেইখানেই খাওয়া শোওয়ার ব্যবস্থা করে নিতে হত। অগত্যা আমার সংসারের সব কিছুই নন্দা বৌদির অর্থাৎ রেবতকের সংসারের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হল।

আমাদের যৌথপ্রথার চাষে প্রতি বৎসর অধিক সংখ্যক পরিবার এসে যোগ দিতে লাগল। তাদের প্রয়োজন মত জমি বণ্টন করে দিত আমাদের পরিষদ সদস্যরা। এদের মধ্যে দাস ও কর্মকরেরা ও সমান অধিকার পেতে লাগল। সর্বপ্রথম আমরা আমাদের দাস কর্মকরদের বাদ দিয়েছিলাম। তবুও স্বইচ্ছায় ওরা আমাদের কাছে আসতো। একমাত্র রাজকার্য ছাড়া অন্যান্য সকল কাজে সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল ওরা।

পরবর্তী তিনচার বৎসরের মধ্যে আমরা শুধু বহু ধান্যক বলেই পরিগণিত হইনি। গো-মহিষ, অশ্ব, মেষ প্রভৃতি সকল পশু-ধনের উপরও আমাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাছাড়া শিল্পোন্নতিও হয়েছে বহু প্রকারে। বিগত পাঁচ বৎসরের তুলনায় কল্পনাতীত।

তবুও যৌধেয়দের সবচেয়ে মুল্যবান সম্পত্তি তাদের সন্তান। পশুসন্তান ও তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কথা বলতে বলতে তরুণ সেনানায়কদের মাঝে মাধব বলে ফেলল—তোমরা শুধু পশুদের সন্তান নিয়ে ব্যস্ত থাকবে না মানব সন্তানদের কথাও চিন্তা করবে। মাধবের কথার রেবতক উত্তর দেয়ঃ তুমি কি বলতে চাও খুলে বল মাধব।—না ভাই তোমাকে কিছু বলিনি। তুমি চিন্তা করোনা, তোমাকে এবং নন্দা বৌদিকে গঙ্গাপারে যেতে হবে না। যদিও তুমি যৌধেয় জাতিকে তিনটি সন্তান দিয়েছ, তবুও আমি বলব যে জাতির প্রয়োজনের তুলনায় তিনটি সন্তান নগণ্য। আমি মাধবকে বললাম—অর্থাৎ আমি নন্দাকে বলব যে প্রতিবৎসর মাত্র একটি সন্তান যৌধেয় জাতির চাহিদা মেটাতে পারবে না। তার চেয়ে বৎসরে অন্তত দুটি সন্তান দিতে হবে নন্দা বৌদিকে। রেবতক মাধবের দিকে তাকিয়ে উত্তর দিল—আমিও তোমাদের সঙ্গে সহমত। যদিও ছ মাসে একটি করে সন্তান জন্ম দেওয়া

সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতির উপর ততখানি অধিকার মানুষের এখনও হয়নি। তবে একসঙ্গে যুগ্ম, ত্রিগ্ম সন্তান দেবার কথা আমাদের সকলের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করা যাবে। আর সে প্রার্থনা নিয়ে মাধব যাবে নন্দার কাছে। সকলে সমস্বরে বলে উঠল—আমরা সকলে রাজী, মাধবই যাবে নন্দা বৌদির কাছে। মাধবের অবস্থা তখন কাহিল।

মাধব বলল—জয়, তুমি নন্দা বৌদির কাছে গিয়ে বল, ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী একশত সন্তান জন্ম দিয়েছিল, কিন্তু নন্দা বৌদিকে আমরা মাত্র কুড়িটার জন্যে অনুরোধ করবো। রেবতক টিপ্পনি কেটে বলে, এই কথা যদি সত্যিই নন্দার কানে গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে তোমার মাথা ন্যাড়া করে ছাড়বে মনে রেখ।

বসুনন্দার বয়স এখন উনিশ। ওর চমৎকার স্বাস্থ্যের সঙ্গে যে সৌন্দর্যরাশি দিন দিন বাড়ছিল, যৌধেয় ভূমিতে তার তুলনা মেলে না। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার আমরা একসঙ্গে নৃত্য-গীত-এর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি। অগ্রোদকায় যখনই থাকতাম তখন প্রতিদিন বসু নিজে হাতে পরিবেশন করে আমাকে খাওয়াতো। এছাড়া গল্পচ্ছলে কখনও বা দু-একটা ঠাট্টাও করেছি ওকে। নন্দার বোন বলে ওকে পরিহাস করবার অধিকার আমার আছে, তবুও খোলাখুলি ভাবে আমি কখনও প্রেম নিবেদন করিনি। তাছাড়া বেশীর ভাগ সময় আমাকে ঘুরতে হত এখানে ওখানে। সকল জায়গার সৈনিক শিক্ষা, চাষ আবাদের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ের তদারক করে বেড়াতে হতো। এমন কি ছোট ছোট শিশুদেরও খেলাচ্ছলে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধের মহড়া শিক্ষা দিতে লাগলাম। নন্দা বৌদির নতুন খেলা আরও বেশী লোকপ্রিয় হয়ে উঠল। পাঁচজন তরুণ কম্বল চাপা দিয়ে হাতী সাজত আর তিনজন যৌধেয়ানী সেজে বিনাফলার তীর মেরে হত্যা করা হত। ওদিক থেকে গুপ্ত সেনাপতির কান ধরে আর একজন টানতে টানতে নিয়ে এসে হাজির করত সেখানে।

তাছাড়া দশ বারো বৎসরের বালকেরা যেভাবে বিনা লাগামে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে খেলা দেখাতে শিখেছে, তা দেখে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। এমনি নানাপ্রকার সংগঠন দেখে দেখে আমার দিন ফুরিয়ে যেত খাওয়া দাওয়ার কথা মনেই পড়ত না। সেদিন তেমনি ঘুরতে ঘুরতে অগ্রোদকায় এসে পৌঁছুলাম। নন্দা বৌদি আমার কাছে এসে বলল—দেবর, সেদিন শুধু শুধু বেচারা বন্ধুক অপদস্ত হয়েছিল। পরে আমি জানতে পারলাম সকল কিছুর মূলে ছিলে তুমি। আমি বৌদির উৎফুল্ল চোখের দিকে তাকিয়ে সহজভাবে উত্তর দিলাম—কেন বৌদি আমি যদি কিছু বলেই থাকি তা অন্যায় কি বলেছি। সিংহশাবকের মতই ত আমার চারটি ভ্রাতুষ্পুত্র রয়েছে, আরও যদি ষোলটির আশা করি, সেত আমার দেশের জন্য করেছি। একজন নারীর কাছ থেকে যদি যৌধেয় কুড়িটা সন্তান পাবার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, তাহলে একবার ভেবে দেখ বৌদি, আগামী দশ পনেরো বছর পর সমগ্র ভারতবর্ষে আমরা একটা স্থায়ী গণ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

—হুঁ! আর যদি কুড়িটার জায়গায় ছত্রিশটা হয় তাহলে?

—তাহলে? সত্যি বলছি বৌদি, ছত্রিশটা হলে আমি সারা যৌধেয় ভূমিকে দুধ দিয়ে স্নান করিয়ে দেব আর তোমার শ্রীচরণে তিন দিন তিন রাত্রি মাথা দিয়ে পড়ে থাকব। বৌদি মুচকী হেসে আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে বলল—হ্যাঁ, আর তোমার ভাগ্যের দরজা আমি খুলে দেব।

—কেমন করে?

—চল্লিশ জন যৌধেয় সন্তানের আধাআধি আমরা ভাগ করে দেব। তোমার বিশ, আমার বিশ।

—দেবর বৌদির আবার তোমার আমার কি রকম?

—আহা হা, কচি খোকাটি যেন। দেশের লোককে উপদেশ দিয়ে বেড়াতে পারো নিজের বেলায় কিছু বোঝ না? তোমাকে বিয়ে করতে হবে।

—ও, আমাকেও বিয়ে করতে হবে ?

—সারাজীবন কুমার হয়ে থাকতে চাও নাকি ? তাই যদি ইচ্ছে ছিল ত বৌদ্ধবিহারে পড়ে থাকলে না কেন ?

—সে কথা যাক। তা আমাকে মেয়ে দেবে কে ? সে কথা ভেবেছ ?

—ভেবেছি। মেয়ে খুব সুন্দরী, বৌদি একবার চারিদিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল—আমি সব পাকা করে ফেলেছি। এখন শুধু তোমার স্বীকৃতি পেলেই হল।

—আগে পাত্রীটি কে তাই বলো।

—জালুকের বড় মেয়ে। নন্দা হেসে ফেলল বলতে বলতে।

—ব্যস ? আর সেই মেয়ের কাছে তুমি কুড়িটা সুস্থ যৌধেয় সন্তান আশা করেছ ?

—যৌধেয় সন্তান না হোক ছারপোকা ত হতে পারবে। সন্তানের ভার আমি নিজে নিয়েছি। সে ব্যবস্থা আমি করব।

—আর বন্ধুক তাকে উপাশ্রয়ে পাঠাবার ব্যবস্থা করছে।

—তা ছাড়া উপায় কি ? বেচারী ত্রিশ বৎসরের হতে চলল। আগের মত হলে অবশ্য জালুক বিশ ত্রিশ হাজার দীনার দিয়ে কাউকে ফাঁসাতো। কিন্তু তোমাদের যা মতি গতি, যৌধেয় হয়ে তোমরা ত তার বাড়ীতে পা দিতেই চাও না। সকলেই মেনকা, তিলোত্তমা চায়।

—বৌদি তাহলে এই সব মেয়েদের উদ্ধার করবার ভার নিয়েছ বুঝি ?

—তা বলতে পারো। গুপ্তরা গো-ব্রাহ্মণ রক্ষার ঢেঁড়া পেটাচ্ছে, আমি মনে করলাম এই সব অভাগী কুমারীদের রক্ষার ভারটা আমিই নিজে হাতে তুলে নিই।

—তা করতে পারো, কারণ তোমার কাঁধ খুব মজবুত। কিন্তু আমার কাঁধ বড্ড দুর্বল।

—বেশ, তোমার কাঁধ যেমন কমজোর, তেমনি তোমাকে হালকা বোঝা দিচ্ছি।

—বোঝা পরে দিও, আগে পেট ভরে খেতে দাও তারপর যা হয় বলো।

—দেবর, বসুনন্দাকে তোমার মনে ধরে ?

—তোমাকে সহস্র ধন্যবাদ বৌদি।

—অর্থাৎ আজ্ঞা শিরোধার্য ?

—একবার নয়, লক্ষ, কোটিবার। অবশ্য বসু যদি আমাকে তার চরণসেবকের উপযুক্ত মনে করে।

বৌদি এক দৌড়ে গিয়ে বসুকে টেনে নিয়ে এল আমার সামনে। তারপর ওকে দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করল—বসু লজ্জার কথা নয়। আমি আমার দেবরকে বলে রাজি করেছি। সে তোমার জন্যে জীবন উৎসর্গ করবে।

বসুনন্দার লাল গাল দুটি আরও লাল হয়ে ওঠে। এতক্ষণে আমার খাওয়া শেষ হয়েছে। আমি থালার উপর হাত ধুয়ে বসুর সামনে দাঁড়িয়ে মিনতির সুরে বললাম—বসুনন্দা। তুমি নন্দা বৌদির বোন। তাকে তুমি ভালো করেই জানো। সে যাকে ধরে তাকে ছাড়ে না। আমার উপর আদেশ হয়েছে তোমার ভবিষ্যতের সকল দায়িত্বভার বহন করবার। তোমার মতামত জানতে পারি কি ? একমুহূর্তে বসুর চেহারা বদলে গেল। হঠাৎ মুখ তুলে আমার দিকে একবার তাকিয়ে আবার মুখ নিচু করল। সেই একটি চাহনিতে ওর সব কিছু বলা হয়ে গেল। সে চাহনির বর্ণনা করা অসম্ভব, শুধু এইটুকু আমি বুঝতে পারলাম যে আমার হৃদয়ের অন্তস্থল অবধি এক মুহূর্তে যেন একটা প্রলয় হয়ে গেল। বৌদি আমার হাতে বসুর হাত দুটি রেখে বলল—দেবর, আমার বোন বোবা অর্থাৎ আমি ওর হয়ে তোমাকে স্বীকারোক্তি জানাচ্ছি। এই নাও আজ থেকে বসুনন্দা তোমার, আর তুমি বসুনন্দার। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ আজ পূর্ণ হল জয়। আমার কর্তব্য আমি শেষ করলাম।

॥ আঠারো ॥

সন্তান আমার ভবিষ্যৎ

অগ্রোদকায় যদিও ধানের রেওয়াজ ছিল না কিন্তু আমরা তবু পুরনো প্রথা মেনে চলতে রাজী নই। আমরা খলতিকা থেকে সুন্দর সুন্দর গন্ধশালী ধানের বীজ এনে চাষ আরম্ভ করেছি। প্রায় দশ একর জমিতে প্রথম ধান চাষ করে দেখলাম কেমন চাষ হয়। কিন্তু আমরা কখনও কল্পনাও করিনি যে আমার প্রচেষ্টা এমন অবর্ণনীয় ভাবে ফলপ্রসূ হবে। দশ একর জমিতে প্রায় মানুষ সমান গাছগুলি দেখে সেদিন আনন্দে বসুনন্দাকে ডেকে নিয়ে গেলাম ক্ষেতে। আমরা যখন মাঠে গিয়ে পৌঁছুলাম, আকাশ তখন পরিষ্কার নীল। মাঝে মাঝে দু-এক টুকরো মেঘ পূব থেকে পশ্চিমের আকাশে ছুটে চলেছে। হাওয়ার তালে তালে ধানের শীষগুলি আত্মভোলা হয়ে নাচছে যেন। যেন আমাদের অভিনন্দন জানাতে বার বার মাথা নত করছে। আমরা আল-এর উপর দিয়ে ঘুরে ফিরে দেখছি। ক্রমশ আকাশে মেঘ জমতে শুরু করল। বোধ হয় শীগগীর বর্ষণ শুরু হবে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। সূর্য ঢাকা পড়ল পশ্চিমের আকাশের মেঘের নিচেয়। সেই আধো আলোয় হাল্কা হাওয়ার দোলনে সবুজ ধানের ক্ষেতকে মনে হতে লাগল যেন সবুজ সাগরে ঢেউয়ের নাচন। আনন্দে চলতে চলতে এক একটা গাছকে আমি স্পর্শ করছি আর আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। কখনও বা দু-একটি শিষ ছিঁড়ে নিয়েছি অজান্তে হাতের মুঠোর মধ্যে। বসুও তরঙ্গায়িত ধানগাছগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে উপভোগ করছিল। কিন্তু আমার হাতে এক গোছা ধানের শীষ দেখে দাঁড়িয়ে বলল— প্রিয়তম, এই শস্যগুলি কত সুন্দর, কত মোলায়েম, স্পর্শে প্রাণ

জুড়িয়ে যায়। কিন্তু তুমি এগুলিকে ছিঁড়লে কেন? কথা বলতে বলতে বসুর স্বর আর্দ্র হয়ে আসে। আমি হাতের গাছগুলিকে সেইখানে ফেলে দিয়ে বললাম—ঠিক বলেছ প্রিয়ে, এ কোমলতা স্পর্শ করবার জন্য, আমার অন্যায় হয়েছে। কথা শেষ হতেই আকাশের বুক চিরে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো। আকাশ ছেয়ে গেল কালো মেঘে। বসু আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—দেখ কী কালো মেঘ। মনে হচ্ছে কোথাও বিরাট অগ্নিকুণ্ড থেকে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের বুকে এসে জমছে।

—হ্যাঁ, আর মাঝে মাঝে সেই আগুনের অন্তর ভেদ করে স্বর্ণশিখা বেরিয়ে আসছে।

দেখতে দেখতে টিপ টিপ করে বৃষ্টি শুরু হল। দিন এখনও এক যাম বাকী। কিন্তু মেঘের ঘটা দেখে মনে হল এখন বাড়ী পর্যন্ত যাওয়া যাবে না। অগত্যা আমরা সুনন্দা সাগরের ঘাটের চাতালে গিয়ে দাঁড়ালাম। বৃষ্টি বেশ জোরে পড়ছে। পাশের গাছে ময়ূরগুলি কেকাধ্বনি করছে। বসুনন্দা সেইদিকে তাকিয়ে বলল—বাহ্য প্রকৃতির এই সৌন্দর্য মানুষকে হাতছানি দেয়। আমি বসুর প্রফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম—মানুষের সৌন্দর্যের বেশীর ভাগ হল এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। আকাশের বুকে ঘন বাদল, একদিকে সুনন্দা সাগরের ঐ বিশাল জলরাশি, ঐ সবুজ ধানের ক্ষেত, ঘন শব্দের তালে তালে ময়ূর ময়ূরীর কেকাধ্বনি। এমন দৃশ্য দেখলে মানব মনে প্রাকৃতিক ভাবের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। ঐ চেয়ে দেখ ময়ূরী কেমন প্রেমানন্দে ওর প্রিয়তমের পাশে পাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে। বসু আমার কাঁধে হাত রেখে দেখতে লাগল।

বৃষ্টির ধারা বাড়তে লাগল। কখন যে সূর্যাস্ত হয়েছে তা বুঝতেই পারিনি। এতক্ষণে দিগন্ত রেখার দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম সন্ধ্যা হয়েছে।

দিন আসে দিন যায়। নিজের কাজে আমাকে কখনও কখনও

এক দেড়মাস পর্যন্ত অগ্রোদকার বাইরে থাকতে হতো। বিক্রমাদিত্যকে আমরা পরাজিত করতে পারিনি, আহত করে ছেড়ে দিয়েছিলাম। আহত বাঘ আরও হিংস্র হয়ে ওঠে তা জানতাম। তাই খুব সতর্কতার সঙ্গে আমরা তার গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম।

চন্দ্রগুপ্ত ইতিমধ্যে প্রজাদের সুখের জন্য দেশব্যাপী বড় বড় পাকা রাস্তা, রাস্তার দুধারে গাছ লাগানো এবং মাঝে মাঝে বিশ্রামাগার কোথাও বা পান্থশালা প্রভৃতি নির্মাণ করেছে। পতিত জমিতে ফসল ফলানো ছাড়া দুর্গম অঞ্চলে অনায়াসে লোকচলাচল ব্যবস্থা করা প্রভৃতি বহুপ্রকার উন্নতি সাধন করেছে। চন্দ্রগুপ্ত'র মুদ্রা অন্যান্য মুদ্রার চেয়েও খাঁটি সোনার তৈরী। নানা রকমের মুদ্রা তৈরী করিয়েছে এবং রীতিমত প্রবর্তন করেছে সেগুলি। কোনটায় চন্দ্রগুপ্তের হাতে ধনুর্বাণ মূর্তি অঙ্কিত, তার নিচেয় লেখা 'শ্রীবিক্রম', কোনটাতে বা সিংহকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়ছে, কোনটাতে বামন ওর মাথায় বৃক্ষ ধরে আছে। নানারকমে নিজের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রচারের চেষ্টা। মুদ্রার অপর দিকে লক্ষ্মীর মূর্তি এবং তাতে লেখা "নরেন্দ্রচন্দ্র প্রথিতো দিবং জয়ত্যজেয়ো ভূবি সিংহ বিক্রম", সিংহ বিক্রম, সিংহ চন্দ্র, দেব শ্রীমহারাজাধিরাজা শ্রীচন্দ্রগুপ্ত। নিজের প্রযত্নে চন্দ্রগুপ্ত সফল হয়েছিল আশাতীত ভাবে। আমি দেখেছি দূর দূর গ্রামের অশিক্ষিত গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল চন্দ্রগুপ্তকে মানুষ ত দূরের কথা রাক্ষস, দানব কেউই পরাস্ত করতে পারবে না। এমন কি বেতালও তার আজ্ঞাবাহী অনুচর। মুদ্রার উপর অঙ্কিত বামনের মূর্তিকে তারা বেতাল বলেই জানত।

দক্ষিণ দিকের রাজ্যগুলিকে আমরা ভয় করতাম না। আমাদের গণসঙ্ঘ এবং মহাক্ষাত্রপ রুদ্রসিংহের রাজ্যের মাঝখানে মালবগণ অবস্থিত। আমরা নিশ্চিত জানতাম যে চন্দ্রগুপ্ত শক্তিহীন না হওয়া পর্যন্ত রুদ্রসিংহের স্বতন্ত্রতা স্থায়ী হতে পারে না। পশ্চিম দিকের রাজ্যকেও ততটা ভয় করতাম না। কারণ সেদিকে

আমাদের পড়শী দেবপুত্রশাহী নিজে পারসীক শাহানশাহের অনুগত। তাছাড়া তার নিজের পশ্চিমোত্তর সীমান্তে সর্বদা হূণদের উৎপাত লেগেই আছে। বাইরের শত্রুর অত্যাচার থেকে দেশকে রক্ষার দিকেই তার নজর বেশী, যুদ্ধের দিকে নয়। যদিও চন্দ্রগুপ্তের পরাজয়ে তারা আমাদের শক্তির কথা জানতে পেরেছিল, তবুও তারা জানত যে কুণিন্দ, যৌধেয়, আর্জুনায়ন গণসঙ্ঘ বিপাশা ও শতদ্রুর আগে এগুবে না কখনও। চন্দ্রগুপ্তও জানত যে আমরা যমুনা পার হতে চাই না। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত আসমুদ্রাধিপতি হতে চায়। যদিও একবার হেরে গেছে আমাদের কাছে, কিন্তু তার ক্রমবর্ধমান সৈন্যসংখ্যা দেখে আমরা সদা সর্বদা বিপদের আশঙ্কায় প্রস্তুত হয়েই থাকতাম। দিনরাত আমাকে ঘুরতে হত নানা জায়গায়।

সেদিন খণ্ডিলা গ্রামে অস্ত্রবিদ্যার প্রতিযোগিতা ছিল। অনুষ্ঠান শেষ হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। সন্ধ্যের পর মিত্রগোষ্ঠীর এক জমায়েতে আলোচনা চলছে এমন সময় মাধব এসে উপস্থিত। আমাকে দেখেই মাধব কাছে এসে বলল—ভাই জয়! আমি একটা সুখবর নিয়ে এসেছি এখানে। খবরটা শুধু তোমার পক্ষে শুভ নয়, আমাদের সকলের। আমি হাসিমুখে মাধবকে বললাম—অর্থাৎ ক্ষাত্রপ এবং বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে ত? সত্যিই যদি তাই হয় তাহলে সুখবর বলতে হবে।

—হুঁ! তোমার সব সময় দূরে দূরে নজর রাখা অভ্যাস।

—সেটা অন্যায় নয় মাধব। আজ প্রত্যেক যৌধেয়ের দূরের দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। যৌধেয় জাতির সামনে আজ এমন এক বিপদ ঘনিয়ে আসছে যা আর কখনও আসেনি। বিক্রম আমাদের জাতির শিকড়শুদ্ধ বিনাশ করবার সঙ্কল্প করেছে।

—তার জন্য আমরা ভীত নই। একবারে যদি তার শিক্ষা না হয়ে থাকে, তাহলে আর একবার এসেই দেখুক। আমি আরেকটি সংবাদ এনেছি। বসুনন্দা বৌদি একটি যৌধেয় সন্তান জন্ম দিয়েছে।

আনন্দে মাধব আর কথা বলতে পারে না। হঠাৎ আমাকে এসে জড়িয়ে ধরে নাচতে আরম্ভ করল। অতঃপর উপস্থিত সকলে আমাকে আলিঙ্গন করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। আমারও যে খুবই আনন্দ হচ্ছিল, তা বলাই বাহুল্য। মাধব বলল—জয়, একজন নবীন যৌধেয়ের জন্ম হওয়ায় আমাদের খুশী হবারই কথা। যৌধেয় এক পুরুষে 'জয় মন্ত্রধারী' হয়নি।

—হ্যাঁ, আমাদের খুশী হওয়া উচিত। যৌধেয় মাতারা সব সময়েই বীর প্রসব করেছে। তাছাড়া আজ তোমাদের একান্ত চেষ্টার ফলে যৌধেয় মাতা শুধু বীরপ্রসবা নয়, আজ তারা 'স্বয়ম্বীরা'। আমার কথা শেষ হতে খণ্ডিলার পুরস্কর্তা আমার হাত ধরে বললেন—জয়, আমার ইচ্ছা আমাদের পৌত্রের নাম হোক বিজয়। উপস্থিত সকলে আমাকে ঐ একই অনুরোধ জানাল। আমি বললাম—কাকার কথার অমান্য হবে না!

সেদিন আর আমার ঘুম হল না। সারারাত আমার চোখের উপর ভেসে উঠতে লাগল কত না কল্পনার ছবি। আমার সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছিল, যৌধেয় জাতিকে রক্ষার জন্য আরও দুটি হাত বাড়ল। ঐ হাত দুটি যখন বলিষ্ঠ হয়ে তার কর্তব্যে রত হবে তখন আমি শক্তিহীন হয়ে পড়ব। পরদিন সকালেই অগ্রোদকা যাত্রা করলাম।

অগ্রোদকা খণ্ডিলা থেকে ষোল যোজন দূরে অবস্থিত। কিন্তু আমি মাত্র একদিন রাস্তায় বিশ্রাম করে দ্বিতীয় দিন পৌঁছে গেলাম। নন্দা বৌদি আমায় দেখেই ছুটে এসে আমার ধূলিধূসরিত কপালে চুমু খেয়ে বললেন—দেবর, আজ আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই। আমাদের ঘরে তোমার মত আর এক যোদ্ধার জন্ম হয়েছে। বৌদির চোখের কোনে আনন্দের অশ্রু টল টল করে ওঠে। আমি বৌদির হাত ধরে হেসে উত্তর দিলাম—যোদ্ধা জন্মেছে ভালো কথা, কিন্তু চার দিনের শিশুর মধ্যে আমার মুখের আদল কি করে বুঝলে? বৌদি আমাকে আদর করে একটা চড় মেরে বলল—এ বিদ্যা

আমাদের অর্থাৎ স্ত্রীদেরই একমাত্র জানবার অধিকার আছে, আর জানতেও পারি আমরা। হঠাৎ মাধব বলে ফেলল—আর বিড়াল তার সকল বিদ্যা বাঘকে শেখায় না, নয় বৌদি? আমার কথায় আবার যেন রাগ করো না। প্রবাদবাক্য বললাম শুধু।

—প্রবাদ আছে বলে যাও, কিন্তু মনে রেখ কোন বৌদির সামনে বলছ। দেখ জয়, আমি যদি বিড়াল হয়ে থাকি তাহলে ভিজে বিড়াল কে একবার চেয়ে দেখ। চল খেয়ে দেয়ে তারপর পুত্রমুখ দেখবে।

—বৌদি, খণ্ডিলাবাসী ঐ পুত্রের নাম রেখেছে কী জান?

—ওমা সে কি কথা? আমি ওর নাম রাখব।

—তা রেখ, কিন্তু খণ্ডিলার পুরুকর্তা এবং অন্যান্য সকলে নাম রেখেছে বিজয়। যদি তোমার পছন্দ হয় ত ঐ নামই রেখ।

—চমৎকার। ঠিক আমার মনের মত নাম হয়েছে।

সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের এখানে পুত্রোৎসবের বিরাট আয়োজন হল। গ্রামশুদ্ধ লোক এসে জমল। সকলেরই যেন নিজের ঘর। অনেক রাত্রি পর্যন্ত বীরগাথা গান হল। অনুষ্ঠান আয়োজনের সীমা নেই। হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আমি নন্দা বৌদিকে কাছে পেয়ে বল্লাম—বৌদি, আজ আমার একটা কথাই বার বার মনে হচ্ছে যে, যৌধেয়দের শরীরে বীর রক্ত সঞ্চারিত করেছে যৌধেয় নারী।

—কিন্তু দেবর, যৌধেয় নারী তোমার দান চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রাখব। এতদিন আমরা শুধু নামেই যৌধেয়ানী ছিলাম।

প্রসূতী ঘরের সামনে গিয়ে আগেই আমার দৃষ্টি বসুর মুখের উপর গিয়ে থেমে গেল। মুগ্ধ হয়ে গেলাম তার পরিবর্তন দেখে। এখন ওর আর সেই অরুণোদ্ভাসী পদ্মমুখ নেই। ক্ষীণ পাণ্ডুর মুখমণ্ডল। তার উপর সেই কুমারী-সুলভ চাপল্য নেই। তার বদলে মাতৃত্বের জ্যোতি ঝলমল করছে। ময়ূর মেচক সদৃশ ঔজ্জ্বল্যতার বদলে শিথিল, রুক্ষ, কৃষ্ণ চিকুর। ওর অঙ্গের প্রতি বিন্দু বিন্দু স্থান থেকে আহরণ করে যে আর একটি নবজীবন জন্ম নিয়েছে, তার

সুস্পষ্ট ছাপ। এমনি দেখতে যদিও খুবই খারাপ লাগে বসুকে, কিন্তু আমি তার মধ্যে এক অনুপম সৌন্দর্য লক্ষ্য করলাম। ভাবলাম, নারী মাতৃত্বের জন্যে কতখানি ত্যাগ স্বীকার করে। এমন সময় নন্দা শিশুকে তুলে আমার সামনে এনে ধরল। তবুও আমি বসুর দিকেই তাকিয়ে ছিলাম। তখনও বসু তার সন্তানটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে যেন গর্ব ও স্নেহের আকর ফুটে উঠেছে। আমি এবার দেখলাম সেই কমল কলির মত ছোট্ট কোমল শিশুকে। বৌদির হাতের মধ্যে শিশুর কচি অঙ্গ যেন থলথল করছে। কেমন চমৎকার তাকিয়ে দেখছে। ওর নীল চোখ দুটি দেখে মনে হল যেন বসুর কাছ থেকে চুরি করেছে। আমি ভাবছি ঐ সুন্দর ছোট্ট শিশুটি মাত্র বিশ বৎসর পর একজন বিশাল বক্ষ শক্তিশালী যৌধেয় হয়ে উঠবে। আমার মুখভাবে গর্ব প্রকাশ পাচ্ছিল, বসু দেখে দেখে যেন আরও গর্ব বোধ করতে লাগলো। আমি এ পৃথিবীর বুকে বালি পদচিহ্নের মত লুপ্ত হয়ে যাবনা, তার জন্য আমার প্রতিনিধি রেখে যাব, এই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ ও তৃপ্তি।

—দেখেছ দেবর, কেমন সুন্দর হয়েছে? ঠিক তোমার মত হয়েছে না?

—সুন্দর শিশু তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখতে ঠিক তোমার মত হয়েছে।

—আমার মত না বসুর মত? হ্যাঁ, তা বলতে পারো। এর চোখ, মাথার চুল বসুর মত হয়েছে। কিন্তু ললাট, চিবুক এগুলি? তাই বলছিলাম, স্ত্রীদের এমন এক বিদ্যে জানা আছে, যাতে আমরা বুঝতে পারি এই শিশু বিশ বছর পরে কেমন হবে।

॥ উনিশ ॥

কালিদাস ও যৌধেয়

দিন আসে দিন যায়। যৌধেয়দের প্রতিপত্তি, সমৃদ্ধি বেড়ে চলেছে ক্রমশ। কৃষি, পশু ও মানুষের আজ আর কোনও অসুবিধা নেই। গ্রামে গ্রামে ক্ষেতের পাশে পাশে কূয়ো, জলাশয় তৈরী করে অনাবৃষ্টির জন্য ফসল নষ্ট হবার আশঙ্কা দূরীভূত হয়েছে। অন্যান্য শস্যের সঙ্গে সুন্দর ধানের চাষও চালু হচ্চে আজকাল। এ ছাড়াও উত্তর বঙ্গ (পুণ্ড্রবর্ধন) থেকে পুণ্ড্র ইক্ষু এনে আমরা চাষ করছি এবং আমাদের পুণ্ড্র ইক্ষুর খ্যাতি দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ডালিম, আঙ্গুর ও উডুম্বর প্রভৃতি গান্ধার কম্বোজ দেশীয় ফলের চাষও প্রবর্ত্তন করেছি। গত বিশ বৎসরে যৌধেয় শুধু সৈনিক শক্তিতেই অস্বাভাবিক উন্নতি করেনি। যৌধেয় ভূমির প্রতি গ্রাম, নগরীর রূপ পালটে গেছে সম্পূর্ণভাবে। পঁচিশ বছর পর যদি কেউ এদেশে আসে, তাহলে সে চিনতে পারবে না এটা কোন দেশ।

বৌদি নন্দার কথামত আমি বিশটি সন্তান জাতিকে উপহার দিতে পারিনি বটে তবে তিনটি উপযুক্ত সন্তানলাভ করেছি। বিজয় রিপুঞ্জয়, আর সঞ্জয়। বিজয়ের বয়স এখন ষোল। এখনই তার শারিরীক ও মানসিক শক্তি দেখে যে কোনও পিতামাতার গর্বে বুক ফুলে ওঠে। রিপুঞ্জয় দশ বৎসর ও সঞ্জয় আট বৎসরের। বসুনন্দা এখনও আমার সকল কাজে সহ-ভাগিনী। নন্দা বৌদিও তেমনি সকলকে হাসিয়ে, ভয় দেখিয়ে স্নেহ ভরে হাসছে। আমি ইতিমধ্যে যৌধেয় ভূমিতে বিদ্যা ও শিল্পের খুব প্রচার করেছি। আমাদের এখান থেকে কম্বল, কার্পাস, বস্ত্র এবং অন্যান্য দন্তশিল্প ও পাথরের জিনিষ পত্রাদি বাইরের প্রায় সকল দেশেই রপ্তানি হয়। শিল্পিদের শুধুমাত্র গণসংস্থার সভ্যপদ দেওয়া ছাড়া আমাদের সঙ্গে

আর কোন অসাম্যতা রাখতে দিইনি। দাসপ্রথা একেবারেই আর নেই। প্রতিটি যৌধেয় আজ মহাসুখী। তার সঙ্গে আমিও। যৌধেয় পুরস্কর্তা বৃদ্ধ বল্ল দেহত্যাগ করবার পর গণ-সঙ্ঘের পক্ষ হতে আমাকেই এখন পুরস্কর্তা ও মহাসেনাপতির কার্যভার গ্রহণ করতে হয়েছে।

এত সুখের মধ্যেও যখনই যমুনাপারের ঘটনাবলীর সংবাদ কানে আসত তখনই মনটা খারাপ হয়ে যেত। ইতিমধ্যে চন্দ্রগুপ্ত পূর্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) এবং সাগর পর্যন্ত তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। পশ্চিমের সমুদ্র পর্যন্ত যে বাকাটকের অধিকারে ছিল, তাকে মুঠোর মধ্যে আনতে চন্দ্রগুপ্ত যে অদ্ভুত কৌশল দেখিয়েছে তা শুনলে আমি এখনও আশ্চর্য হয়ে যাই। পৃথ্বিসেন সমুদ্রগুপ্তের শেষ সময়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। বাকাটকের রাজত্ব নর্মদা থেকে কৃষ্ণা পূর্ব থেকে পশ্চিমের সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমি আশা করতাম একদিন নিশ্চয় চন্দ্রগুপ্ত বাকাটক আক্রমণ করবে। তাহলে ভালই হবে। দুই অত্যাচারী নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি করে মরুক। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত একটি বানও খরচ না করে, একটাও ভেট না দিয়ে সমগ্র বাকাটক ভূমি কবলিত করেছে।

চন্দ্রগুপ্তের দ্বিতীয় রানী কুবের নাগার গর্ভে প্রভাবতী নামে এক পরমাসুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহন করে। পিতার সকল গুণই কন্যার পাওয়া স্বাভাবিক। লোকে বলে প্রভাবতী চন্দ্রগুপ্তের ঘরে সরস্বতীর অবতার হয়ে জন্মেছিল। কথাটার সত্যাসত্য সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে খুব প্রতিভাশালী ও মনস্বিনী তরুণী ছিল প্রভাবতী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। বর্তমানে পৃথ্বিসেনের পুত্র রুদ্রসেন প্রভাবতীর পতি এবং চন্দ্রগুপ্তের জামাতা এবং সবচেয়ে সম্মানিত সামন্ত। অতএব বাকাটকের বিশাল ও শক্তিশালী সকল সেনা এখন বিক্রমের সেনাদলের অন্তর্ভূক্ত।

অন্যদিকে মালব জাতিও গুপ্তদের শক্তির কাছে মাথা নত করেছে। জয়বর্মা ও সিংহবর্মা দুই পিতাপুত্র মালবগণকে নিজেদের পরিবারের

সম্পত্তি বলে ভাবতো। মালব উপযুক্ত সময়ে সজাগ হয়নি এবং সিংহবর্মার পুত্র নরবর্মা মালব গণের স্বাধীনতা চন্দ্রগুপ্তের হাতে তুলে দিয়ে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার তুলনা হয় না। নরবর্মাকে বিক্রম সাহায্য করে গণশাসন তুলে রাজশাসন প্রবর্ত্তন করেছে এবং নরবর্মাকে সিংহাসনে বসিয়েছে। নরবর্মা হয়ত ভেবেছে তার বংশ পরম্পরা রাজ্যের রশ্মি থাকবে। নরবর্মার বিশ্বাসঘাতকতার কথা শুনে আমি অনেকদিন পর্যন্ত খাওয়া দাওয়া ত্যাগ করে ছিলাম। আমার বন্ধুদের আমি বলতাম, চন্দ্রগুপ্ত একফোঁটা রক্তপাত না করেই আমাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

মহাক্ষত্রপদের অবস্থা আরও সঙ্কটময় ছিল। দক্ষিণদিক প্রভাবতীর স্বামী রুদ্রসেন ঘিরে নিয়েছিল। উত্তরে নরবর্মার হাত থেকে শাসনভার চলে গেল চন্দ্রগুপ্তের হাতে। এখন তিনদিক থেকে গুপ্তসেনা চোখ রাঙিয়ে ভয় দেখাতে লাগল। আমি জানতাম ক্ষত্রপদের ভূমির উপর বিক্রমের সবচেয়ে বেশী লোভ। তারমধ্যে অবন্তীলাট ও সৌরাষ্ট্রই প্রধান। চন্দ্রগুপ্ত জানত যে এই দুটি বন্দরে পশ্চিমি মেঘ স্বর্ণবৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের মনোভাব বোঝা সুকঠিন। আগে যৌধেয় ভূমির উপর দৃষ্টিপাত করবে, কিংবা ক্ষত্রপ-দের ভূমির উপর তা বলা যায় না। সেইটাই আমাদর সবচেয়ে চিন্তার বিষয়।

চন্দ্রগুপ্তের সৈন্যবল ও ধনবল সমুদ্রগুপ্তের চেয়ে শুধু বেশী নয় পিতার চেয়েও বুদ্ধিমান, কুটনীতিজ্ঞ এবং নিষ্ঠুর, তা আমি জানি। চন্দ্রগুপ্তের স্বভাব হল যে কোনও কাজে আগে কৌশল অবলম্বন করা। পরে অন্যান্য উপায়। সবশেষে সৈন্যবলের সাহায্যে কার্য উদ্ধার করা।

বাকাটককে নিজের কন্যাদান করে ও প্রমাণ দিল যে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারে। তারপর প্রজাদের মধ্যে সদভাব সৃষ্টি করবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টার অন্ত ছিল না। দেশের নানাস্থানে মন্দির নির্মাণ করিয়ে নানাদেশের শিল্পীদের নিমন্ত্রণ করে এনে সেই মন্দির

গাত্রে নানাপ্রকার মূর্তি প্রভৃতি অলঙ্করণ করিয়ে তাদের পাওনার চেয়ে বেশী অর্থ ও সম্মান দিয়ে তাদের প্রশংসার পাত্র করে নিয়েছে নিজেকে। সেখানে শ্রদ্ধান্সু জনতার কাছে নিজেকে ধর্মরাজ বলে স্বীকৃতি পেয়েছে। শুধু তাল-বেতালের কাহিনী নয়, নিজের সম্বন্ধে নানাপ্রকার উদ্ভট গল্প রচনা করে চন্দ্রগুপ্ত নিজে অপরকে প্রেরণা জোগাত। ফলে মানুষের মনে বিশ্বাস জাগাতো যে বিক্রমাদিত্য সাধারণ মানুষ নয়। কোনও শাপভ্রষ্ট দেবতা জন্মেছেন মাটির ধরণীতে। নিজেকে পরমবৈষ্ণব বলে জাহির করতো এবং প্রচার করতো যে, বিক্রমাদিত্য ভূ-বরাহ। সে ম্লেচ্ছদের কাছ থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করেছে। আমি স্বয়ং চন্দ্রগুপ্তের তৈরী এক বরাহ মন্দির দেখেছি মথুরায়। মূর্তির মাথাটা বরাহের মত, বাকি সমস্ত শরীরটা এক বলিষ্ঠ পুরুষের। বরাহের দাঁতের মধ্যে পৃথিবীর মূর্তি দেখে আমার আশ্চর্যের সীমা ছিল না। আমি কখনও কল্পনা করিনি যে, চন্দ্রগুপ্ত এতদূর অগ্রসর হতে পারে। বরাহের মুখে পৃথ্বির যে মূর্তি ছিল, সেটা অবিকল ধ্রুবস্বামীর মূর্তি। শিল্পীর দৃষ্টিতে সে মূর্তি অপূর্ব সুন্দর। কিন্তু চন্দ্রগুপ্ত নিজের পত্নীর মূর্তি কেন বরাহের দাঁতের সঙ্গে যুক্ত করল? তার এক অর্থ এই হতে পারে যে কুষাণ দেবপুত্রের হাত থেকে ও ধ্রুবস্বামীনীকে উদ্ধার করেছিল। চন্দ্রগুপ্ত যদি সাহস না করতো, তাহলে গুপ্ত রাজলক্ষ্মী সত্যিই নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু একে মহারাজের রূপে পৃথ্বি উদ্ধারের রূপ দেওয়া চন্দ্রগুপ্তের স্বকীয়তা। ধ্রুবদেবীর উদ্ধারের কথা যারা জানে তারা একে আমল দেবেনা কিন্তু যারা জানেনা তাদের মনে ভূ-বরাহ রূপে জাগ্রত থাকবে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য। যে কোন রসিক এই অদ্ভূত মূর্তি দেখে পরমভট্টারকের প্রশংসা না করে পারবে না।

প্রথম বিজয়ের পর উনিশ বৎসর কেটে গেছে। এতদিন আমরা ক্রমাগত সৈন্যবল বৃদ্ধি করেছি। তবুও আমাদের ভয় কাটেনি। আজ যৌধেয় জাতির প্রত্যেক শিশুবৃদ্ধ, নর-নারীর একমাত্র চিন্তা হল চন্দ্রগুপ্তকে কেমন করে দমন করা যায়। আমাদের দেশের সকল

অবস্থার কথা চন্দ্রগুপ্ত জানে, তাই ওর মনে সবচেয়ে বেশী আপশোষ হল যে বাকাটককেও ছলনায় বশীভূত করুক। কিন্তু আপন মামা তার হাতের বাইরে চলে গেল। ধ্রুবদেবী কমপক্ষে কয়েকশত চিঠি লিখেছে আমাকে। নানাপ্রকারে আমাকে বশীভূত করবার চেষ্টা করেছে। এমন কি নিজের বোনের প্রেম নিবেদন জানিয়ে আমাকে জালে আটকাবার চেষ্টা করতেও কসুর করেনি। প্রথম যুদ্ধের পর আমি আর চিঠির উত্তর দিইনি। তখন দূত পাঠিয়ে ধ্রুবদেবী ইচ্ছা প্রকাশ করেছে "অজ্জুকার জন্মভূমি দেখতে চাই"। হয় ত ভেবেছিল যে অগ্রোদকায় আসতে পারলে আমার মনকে ফেরাতে পারবে। আমিও তাকে মনে মনে ভয় করতাম। হয়ত সত্যিই একদিন এসে হাজির হবে। যদিও আমাকে জাদু করবার ক্ষমতা তার ছিল না, তবুও শুধু শুধু ঝামেলা আমি পছন্দ করতাম না। চন্দ্রগুপ্ত পনের বৎসর যাবত আমার পিছনে লেগেছিল আমাকে বশ করবার জন্য। এমন কি বাকাটকদের মত নিজের মাতুল বংশকে এক প্রতাপশালী রাজবংশে পরিণত করবার জন্য সর্বতোভাবে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দিয়েছিল।

বর্ষা শেষ হয়েছে। মাঠের ফসল এখনও কাটা শুরু হয়নি। সেদিন আমি রেবত ও বসুনন্দা ঘোড়ায় চেপে মাঠের মধ্যে বেড়িয়ে ফিরছি। এমন সময় দেখলাম দুইজন ঘোড়সওয়ার আমাদের দিকে আসছে। পিছনের লোকটিকে পরিচারক বলে মনে হল। লোকটি কাছে এসে আমাকে প্রশ্ন করল,—মহাশয়! এখানে মহাসেনাপতি জয় যৌধেয়-এর বাড়ী কোথায় বলে দেবেন? লোকটির বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। চেহারায় বিনম্রভাব। লোকটির উজ্জ্বল চোখ দুটিই আমাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করল।

পরিধানে শ্বেত কঞ্চু, শ্বেত উষ্ণীষ, শ্বেত অন্তরবাসক এবং কাঁধের উপর শ্বেত উত্তরীয়। আমি সবিনয়ে প্রশ্ন করলাম—আর্য, কোথা থেকে আসছেন আপনি?

—মথুরা থেকে। শুনেছি মহাসেনাপতি জয় একজন প্রৌঢ়

বিদ্বান এবং কলাবিদ। অধীনও একজন নগণ্য শিল্পী তাই তাঁকে দর্শন করবার ইচ্ছা নিয়ে সুদূর অবন্তীপুর থেকে এসেছি। আমি যুক্তকরে বললাম,—আমাদের মহাসেনাপতির নামে বোধ হয় কেউ মিথ্যে প্রসংশার কথা বলেছে। আমিও একজন কলাভক্ত যৌধেয়। মহাসেনাপতি একজন যোদ্ধা একথা সকলেই জানে। কিন্তু যোদ্ধার সঙ্গে কলাপ্রেমের কি সম্বন্ধ? আগন্তুক হর্ষিত হয়ে উত্তর দেয়—আপনি বোধ হয় তাঁকে জানেন না। আমি খুব বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হয়ে আসছি। দয়া করে যদি তার বাড়ীটা কোনদিকে বলে দেন ত অনুগৃহীত হই। আমাদের কথার মাঝে রেবতক আর বসুনন্দা অতিকষ্টে হাসি চেপে রাখছিল। আমি তাদের ইশারা করে বললাম,—আর্য, বিশ্বাসের কথা আর কি বলব। জয় যৌধেয় আমাদের মহাসামন্ত, কিন্তু নিজের থাকবার মত ঘর নেই তার। আশ্চর্য হল আগন্তুক।

—তাহলে মহাসেনাপতি থাকেন কোথায়? আমি শুনেছি অগ্রোদকাতে তার জন্মস্থান।

—হ্যাঁ, জন্মস্থান ঠিকই। এখানে তার ভাই বন্ধু অন্যান্য সকলে থাকেন। তিনি রাতদিন ঘুরে বেড়ান। এখানে কখনও থাকবার প্রয়োজন হলে খুশীমত কোনও বন্ধুর বাড়ী গিয়ে হাজীর হন।

—তা হলে এখানেই কারুর বাড়ীতে মহাসেনাপতি আছেন ত?

—না। বড়ই দুঃখের কথা যে আপনি এতদূর থেকে এসেছেন কিন্তু মহাসেনাপতি দু'একদিন আগেই বাইরে গেছেন। কবে ফিরবেন তাও কোন নিশ্চয়তা নেই।

—কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাত না করে ত আমি ফিরে যেতে পারি না। যেখানেই থাক সাক্ষাত করতেই হবে।

—খুবই কষ্ট হবে আপনার। একবার বিশেষ দরকারে আমিও তার খোঁজে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু কুড়িদিন ক্রমাগত ছুটোছুটি করে তবে তাকে ধরতে পেরেছিলাম। যে গ্রামে যাই, সেই গ্রামের লোকের কাছে শুনি সামনের গ্রামে গেছেন। তাও দু' চার যোজন

হলে ত চিন্তা ছিল না। বারো চৌদ্দ যোজন পথ তিনি একদিনে পাড়ি দেন।

—যাই হোক, তাকে ধরতেই হবে।

—বেশ, আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করবো। কিন্তু দয়া করে আজ আপনি আমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করুন।

আগন্তুক সানন্দে আমার আতিথ্য স্বীকার করল। তাকে নিয়ে নিজের বাড়ীতে গেলাম। সত্যিই আমি আমার পৈতৃক বাড়ীটা এক সম্মিলিত চাষী ও কর্মকরদের দিয়ে দিয়েছিলাম। তবুও আমি আগন্তুককে সবচেয়ে সুন্দর ঘরটিতে নিয়ে গেলাম। তাকে বসিয়ে পা ধুইয়ে মধুর সরবত এবং ফল দিয়ে অল্পাহার দিলাম। এতক্ষণে জানতে পারলাম আগন্তুক অবন্তীপুরের একজন ব্রাহ্মণ কলাকার। আগন্তুক ভোজনের আগে প্রকাশ করে ফেলেছে সে একজন ছোট কবি। শুধু তাই নয়, কথায় কথায় সে মধুদম্বিত তরুণীর উদ্দেশে নিজের রচিত একটা পদ্য শোনাল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—আর্য, আপনার মদিরায় অরুচি নেই ত?

—না না, মদিরায় অরুচি হলে কবি কিসের। তা ছাড়া আমি ভগবতী কালীর দাস। এবার আমার আর সন্দেহ রইল না যে আমি মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে কথা বলছি। তবুও আমি নিজের পরিচয় এত তাড়াতাড়ি প্রকাশ করতে চাই না। মহাকবির নাম শুনে আমার পরিবারের অন্যান্য সকলে খুবই আনন্দিত হল। এতদিন শুধু মহাকবির নামই শুনেছে। আজ তাকে দর্শন করে প্রীত হল।

তার মেঘদূতের পংক্তি ত আমাদের ছেলেমেয়েদের মুখে মুখে। মেঘদূত আমিও পড়েছি, কিন্তু ভেবে পেতাম না যে মেঘকে অলকাপুরী পাঠাবার সময় পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে মধ্যপথের যৌধেয় ভূমি, তার বর্ণনা কেন দেয়নি। ভোজন শেষে যখন মদিরার পাত্র হাতে আমরা আলোচনা করছি, তখন কবির দিকে তাকিয়ে আমি বললাম—মহাকবি!

—না না আমাকে মহাকবি বলবেন না।

—আপনি অস্বীকার করলে হবে কি। যৌধেয় ভূমি মহাকবি কালিদাসকে খুব ভাল করে চেনে।

—তার জন্য যৌধেয় ভূমির কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি কী এমন মহাকাব্য লিখেছি যে মহাকবি হবার উপযুক্ত? অশ্বঘোষ, সৌমিল্ল এবং ভাষ'এর কাছে আমি তুচ্ছাতিতুচ্ছ।

—সে বিচার করবার ভার আমার নয়। তবে আপনার 'মেঘদূত' প্রতি ঘরে ঘরে সমাদৃত। ঐ একটি কাব্যই আপনার প্রতিভার উজ্বল স্বাক্ষর। কিন্তু মহাকবি, অলকার পথে আমাদের যৌধেয় ভূমির উপর দিয়ে যেতে হয়, অথচ তার সম্বন্ধে আপনি কিছুই বর্ণনা করেননি কেন?

—আমি যৌধেয় ভূমি এর আগে কখনও দেখিনি। এখন বুঝতে পারছি কত রমনীয় এ দেশ। মহাকবি যখন দেখলেন যে আমি তার গুণমুগ্ধ, তখন আমাকে প্রাণখুলে তিনি কবিতা শোনালেন। আমিও বীণা বাজিয়ে শোনালাম।

তারপর আরও সাতদিন মহাকবিকে অগ্রোদকায় রাখলাম। আমি মহাকবির মনোরঞ্জনের জন্য বিশেষভাবে নৃত্য-গীতের আয়োজন করলাম। মহাকবির সদ্য রচিত গীতগুলি যৌধেয় তরুণীরা মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করে শোনাল। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা কবিবর মহা-যোদ্ধাপতির সন্ধান করতে বিনয় পূর্বক বললাম,—মহাকবি, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি যে জয় যৌধেয়ের সঙ্গে সাক্ষাত করবার জন্য উতলা হয়েছেন সে আপনার সামনে উপস্থিত। কালিদাস বিস্ফারিত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো এবং আমাকে আলিঙ্গন করলো।

—মিত্র জয়। না না, সেনাপতি জয় যৌধেয়।

—কবি, প্রথম সম্বোধনই অধিক প্রিয় আমার কাছে। আপনার অমৃত মধুর বানী স্বেচ্ছায় যা ব্যক্ত করে, জয় তাতেই কৃতার্থ মনে করবে নিজেকে।

—বেশ, মিত্র জয়। আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে দূত হয়ে এসেছি। কিন্তু এখন আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা যে আমি তোমার দূত না বিক্রমাদিত্যের। আমি স্বীকার করছি যে যৌধেয় ভূমি আমাকে জয় করে নিয়েছে। যৌধেয় ভূমির চেয়ে অধিক সুখে প্রজারা কোথাও বাস করে বলে আমার জানা নেই। তা ছাড়া এখানকার প্রজাদের মধ্যে, নর-নারীদের মধ্যে যে স্বচ্ছন্দতা ও আত্ম-সম্মানবোধ দেখলাম তা যদি নিজের চোখে না দেখতাম ত আমার কাছে স্বপ্ন হয়ে থাকতো। মিত্র, ক্ষমার কথা বলে আমাকে লজ্জা দিও না। প্রথম দিনেই তুমি আমাকে চিনতে পেরেছিলে। এখন যদি অনুমতি দাও ত আমার উদ্দেশ্য প্রকাশ করি।

—আমি সর্বদাই সাবধান আছি মহাকবি, আপনি নিঃসকোচে আপনার বক্তব্য বলুন।

—বলছি। তুমি প্রথমেই আমার সঙ্কোচ দূর করে দিয়েছ মিত্র। তবুও মনে রেখো, আমি যা বলছি তা আমার কথা নয়। আমার মুখ দিয়ে বিক্রমাদিত্য কথা বলছে।

—চন্দ্রগুপ্ত আপনাকে পাঠিয়েছে? কিন্তু আপনিত উজ্জয়িনী···

—হ্যাঁ মিত্র। মহাকালের নগরীতে জন্ম নেবার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

—কিন্তু মহাকবি, আপনি আপনার জন্মভূমি ছেড়ে পাটলিপুত্র গিয়ে আশ্রয় নিলেন কেন?

—প্রতিষ্ঠার জন্য। পরমভট্টারক বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত আজকাল গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমে বাস করছেন।

—হঠাৎ গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম তার এত ভাল লাগল কেন?

—সেখানে বসেই ত আমি "তনুত্যজাং ন শরীর বন্ধঃ" লিখেছি।

—ও পরম ভট্টারক তা হলে সেখানে তনুত্যজি মোক্ষপ্রাপ্তির আশায় ঘর বাঁধেননি?

—মিত্র, পরমভট্টারককে আমার চেয়ে তুমি ভালো জানো।

—সে বহুদিনের কথা।

—যতদিনই হোক না কেন মানব চরিত্র একই প্রবাহে বয়ে চলে। কথায় বলে ছয় মাসের কুকুর আর বারো বছরের ছেলে যেমন হবার হল, নাহল ত গেল। অতএব চন্দ্রগুপ্তর সঙ্গে যখন তোমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিল, তখন সে পূর্ণবয়স্ক।

—হ্যাঁ, কুড়ি বৎসর বয়স। তারপর—আপনার উজ্জয়িনী ছাড়বার কথা আমি শুনতে চাইছিলাম।

—উজ্জয়িনী আমাকে জন্ম দিয়েছে, লালন পালন করেছে, বিদ্যা দান করেছে। কালিদাসের মধ্যে যা কিছু দেখছ তা সবই উজ্জয়িনীর দান এবং ক্ষত্রপকুল প্রাণখুলে আমাকে সম্মান দেখিয়েছে। কিন্তু মেঘদূত রচনা করবার পরই আমাকে সকলে মাথায় তুলে নিল এবং মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ একেবারে আমাকে নিমন্ত্রণ করলো। আমি নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করলাম। এমন কি রুদ্রসিংহ তার অর্ধাসন আমাকে দিয়েছিলেন, তার সবচেয়ে মধুরকণ্ঠি গায়িকাকে দিলেন মেঘদূত গাইবার জন্যে। সেদিন গান শেষ হলে দ্রবিত স্বরে রুদ্রসিংহ বললেন,—তরুণ কবি, সত্যিই কি তুমি অভিশপ্ত? না কেউ তোমার প্রেমের পথে অন্তরায় হয়েছে? আমি বললাম, না ভট্টা! এ শুধু কবির কল্পনা। রুদ্রসিংহ বললেন, আমি বুঝতে পারছি কবি, তোমার বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। নইলে নিছক কল্পনার এত শক্তি হতে পারে না। নিঃসন্দেহ এ তোমার বঞ্চিত অন্তরের বেদনাময় উচ্ছ্বাস। ক্ষত্রপবংশ চিরকাল বিদ্বানদের চরণ সেবক। তুমি নিঃসংশয়ে বলো, যদি কোনও ক্ষত্রপ কুমারী তোমার মনে আঘাত দিয়ে থাকে, অথবা যার প্রেমে তুমি এতখানি উতলা হয়েছ তার নাম বলো, আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি তোমাকে অদেয় কিছুই নেই। অতএব বুঝতেই পারছো যে মহাক্ষত্রপদের সম্বন্ধে আমার মনোভাব কেমন ছিল। তাছাড়া তখন কালিদাসের সঙ্গীত শিপ্রা নদীতট পর্যন্ত গুঞ্জন করছে।

—হ্যাঁ মহাকবি, দূতের কথা শুনে প্রথমে আমি মনে করেছিলাম যে আপনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের কাছ থেকে আসছেন।

—তা হলে হয়ত আমাদের উভয়েরি কর্তব্য সহজ হত। আমার দুর্ভাগ্য যে নিজের জন্মভূমির দূত হয়ে আসিনি। যাক সে কথা, মেঘদূতের পর আমি যা কিছু লিখেছি, উজ্জয়িনী ও অবন্তীর লোক তাকেই মাথায় তুলে নিয়েছে। যশ, মান, প্রতিপত্তি, ভোগ সব কিছু অতি মাত্রায় পেয়েছি। তবে মেঘদূত লেখবার সময় কোনও ক্ষত্রপ কুমারীর সঙ্গে আমার প্রেম ছিলনা এ কথা সত্যি। কিন্তু এখন নবনীত শ্বেত কোমলাঙ্গী শক তরুণীরা কবির কাছে তাদের সর্বস্ব দান করবার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। অবন্তী আমাকে অনেক কিছু দিয়েছিল। কিন্তু তুমি ত জানো মিত্র, অবন্তী সুন্দরীদের রূপের খ্যাতি। তার উপর শকানী, যবনী, আভিরানী প্রভৃতি সুন্দরীদের রূপ চিত্রণ করতে কবি কালিদাসকে নতুন তালিকা সৃষ্টি করতে হয়েছে, নতুন শব্দ গড়তে হয়েছে। তাদের নবনী শুভ্র মুখের উপর উপছে পড়া রক্তাভ স্বভাব বিম্ব বিদ্রুম সদৃশ রক্ত অধর। সে রূপের বর্ণণা একমুখে কত করব। অতিশয়োক্তির কথা নয়, তার প্রতি অঙ্গের বর্ণনা করতে গেলে প্রকৃতির বর্ণনাও হীনোক্তি মনে হয়। সেই দীর্ঘ সুন্দর নয়ন দিয়ে যদি কটাক্ষ হানতে থাকে অবিরাম, সেই দুই চারু ভুজে যদি কবিকে আলিঙ্গন করতে চায়, তাহলে তুমিই বলো মিত্র, এই তরুণ কবিকে কে রক্ষা করতে পারে? সংযমী পুরুষ আমি নয় এবং যোগীদের সংযম যোগ'এর উপর আমার বিশ্বাস নেই। তাই প্রেমের অকুল সাগরে গা ভাসান দিলাম। যখন তার আসল রূপের সন্ধান পেলাম, তখন তার কান্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। তার মাধুর্য ফিকে হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই প্রার্থিত প্রেম আজ নিরন্তর মাদক মদিরার ক্ষণিক উত্তেজনার মত মনে হয়। তখন নিজের কবিতার মধ্যে যে স্তুতিগান করতাম, স্বপ্ন দেখতাম, মিত্র, এখন সে প্রেম আমার জীবন থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

—প্রেমে যদি এখনই বিরক্ত জাগে, তাহলে পরিণাম কী হবে মহাকবি?

—এখন আমি মদিরা পান করি, কিন্তু তৃপ্তি পাই না। আমি

মদিরাক্ষণাকে আলিঙ্গন করি, ভোগ করি, কিন্তু মুহূর্তপরে অতৃপ্তি এসে ঘিরে ধরে। ফলে আমি একই পাত্রের মদিরাকে এবং একই মদিরেক্ষণাকে দ্বিতীয়বার গ্রহণ করতে পারি না। তাই যে প্রেম আমি পাইনি, তাকে কল্পনা দিয়ে পূরণ করি। এমনি করে ভবঘুরের মত কাটছে আমার জীবন। অবন্তীপুরেব প্রতি ঘরের সুরা, প্রতিটি সুন্দরী আমাকে স্বাগত জানায়। যদিও মহারাজা বা পরমভট্টারকের পক্ষে তেমন স্বাগত পাওয়া অসম্ভব নয়, তবে সে হল প্রভুতার বলে। তার মধ্যে হৃদয় নেই, আন্তরিকতা নেই। আমি শুধু নিজেই তৃপ্তি লাভ করতে চাইতাম না, তাদেরও তৃপ্তি দিতাম। কিন্তু ক্রমাগত আমার কানে আসতে লাগলো নানা প্রশংসার বাণী। কালিদাসের প্রশস্তি গান পশ্চিম সাগরের ওপারেও গুঞ্জন তুলছে। তখন প্রেম থেকে আমার মন অন্যদিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। সে হল যশ।

—কিন্তু কবি, যশের জন্য ত আপনাকে চেষ্টা করতে হয়নি। সে কাজ ত কালিদাসের জিহ্বা করছে। আপনার কবিতা যে একবার কানে শুনেছে, তারই মনে আঁকা হয়ে গেছে চিরকালের জন্য। এমনি এক কান থেকে আর এক কানে যেতে যেতে সমগ্র ভারতখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে।

সেদিনকার মত আলোচনা শেষ হল। দৌত্যবার্তা পরের দিন পর্যন্ত স্থগিত রইল। রাত্রে আমার তেমন ঘুম হলনা। সারারাত চিন্তা করলাম কালিদাসের কথাগুলি। মহাকবির প্রতিভা খুব তীক্ষ্ণ কিন্তু হৃদয় কুটিল নয়। ওর হৃদয়ে সৌন্দর্য-প্রেম অগাধ কিন্তু যুগোপ-যোগী কামুকতা নেই।

পরদিন মহাকবিকে নিয়ে আমি আমার বাগানে গেলাম। পুকুরের পাথর বাঁধানো ঘাটে গেলাম দুজনে। কালিদাস চারিদিকে তাকিয়ে বললো,—এখানে প্রচুর পরিমাণে কবিতার উপকরণ রয়েছে। কিন্তু তাহলে আবার নিজেকে নতুন করে গড়ে তুলতে হয়। আজকাল মাঝে মাঝে আমি নিজের উপরই অসন্তুষ্ট হয়ে যাই।

—বড়ই চিন্তার কথা মহাকবি। এই ভাবটা দূর করতেই হবে। এতে হয়তো আপনার প্রতিভাকে আরও বিচ্ছুরিত হতে সাহায্য করবে। কিন্তু বাণীতে কিছু ত্রুটি দেখা দেবে।

—ভাবছি, আজ যদি এই যৌধেয় ভূমিতে এসে এর অপরূপ সৌন্দর্য না দেখতাম, এদের প্রজাদের প্রাণখোলা স্নেহ ভালবাসা না পেতাম, তা হলে এ আবিষ্কারটাও হয়ত করতে পারতাম না। আর চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে থেকে যেতাম। যাই হোক কাল যে কথা বলছিলাম সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। এ কথা তুমি যা বলছ যে আমার যশ, মান, প্রতিভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়াতে যেমন কোন চোষ্টাই আমি করিনি অথবা চেষ্টার কোন প্রয়োজনও হয়নি। তবুও আমি দেখেছি এমন আরও কবি ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন যাদের প্রতিভার আলোক এখনও আমাদের আলোকিত করে আছে। আমি একথা বলিনা যে আমাদের দেশে বাল্মিকী, অশ্বঘোষ, মাতৃচোট, ভাস, সৌমিল্ল ছাড়া আর কেউ কবি জন্মায়নি এবং আমি তাদেরই সমকক্ষ একজন। আমি শুধু ভাবছি, আমার কবিতার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে। যেমন অন্যান্য কবিদের বেলায় হয়েছে। আমি শুধু মুখে মুখে রচনা করেই ক্ষান্ত হইনি, তাকে ভূর্জপত্রে এবং তালপত্রে লিখে রেখেছি। সেই তালপত্রের সাহায্যে লোকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যাচ্ছে আমার রচনাগুলিকে। এমনি করেই প্রচার হচ্ছে আপনা থেকে। কিন্তু শুধু এই উপায়েই কবিতার চিরস্থায়িত্ব লাভ করানো যায়না। ব্যাসের মহাভারত এবং বল্মিকীর রামায়ণ আজ এতখানি প্রসিদ্ধিলাভ করতো না, যদি ব্রাহ্মণরা সেগুলিকে চালু না করত। আমি জানি আমার কবিতা ঋষি কাব্যের স্থান পাবে না, কারণ আমার কবিতা অতি আধুনিক। অতএব ব্রাহ্মণদের আশা ছেড়ে দিলে একমাত্র রাজা মহারাজারাই এই কবিতার স্থায়িত্ব দান করতে পারে, অন্য কারও দ্বারায় অসম্ভব।

—কিন্তু রাজাও ত চিরস্থায়ী নয়।

—মিত্র, তুমি মনে করোনা যে, কালিদাস চন্দ্রগুপ্ত বা তার পুত্র

কুমারগুপ্তের বিষয় বস্তু নিয়েই শুধু কবিতা লেখে, অথবা গুপ্তবংশকে মাটি থেকে আকাশে ওঠাবার জন্যেই কবিতা রচনা করে।

—না হলে বিক্রমাদিত্য আপনার কবিতাকে চিরস্থায়িত্ব প্রদান করবার চেষ্টা করবে কেন ?

—কবির শ্লেষপূর্ণ উক্তিকেও অ-কবিরা কাব্যের পর্যায়ে গণ্য করেন। আমি এখন রঘুবংশ রচনা করছি। সান্ত্বনা হিসেবে পরম ভট্টারককে বুঝিয়েছি যে রঘুবংশের দিলীপ হল তোমারই ঠাকুর্দা চন্দ্রগুপ্ত। নন্দিনী এবং সীমার মধ্যে তিলক প্রদানকারী সুদক্ষিণা আর কেউ নয় তোমার পিতামহী কুমারদেবী। দিগ্বিজয়ী রঘু হল সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত এবং অজ নামক চরিত্রের মাধ্যমে আমি তোমার যশকে এবং তোমাকে অমর করে রাখছি।

—চন্দ্রগুপ্ত কি অতটুকুতে সন্তুষ্ট হবে ?

—ঐখানেই ত ফাঁক রেখেছি। আর সেইজন্যেই এটা মহাকাব্য। মহাকাব্য লেখাতে অনেক সুবিধা রয়েছে। আমি রাজার স্বার্থকে একেবারে মুখ্য বলে চিত্রিত করেছি রঘুবংশে। তাহলে একটা পদ শোন :—

প্রজানামেব ভূত্যর্থে স তাভ্যো বলিমগ্রহীত।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥

মহাকবির শ্লোক শুনে আমি হেসে জিজ্ঞাসা করলাম—মহাকবি, এগুলি কি মিথ্যে নয়, যে শুধু প্রজাদের ভালোর জন্যেই রাজা কর নিয়ে থাকেন ? পরমভট্টারক, যুবরাজ, রাজকুমার, রাজকুমারী, পরমভট্টারিকা ও তাদের হাজার হাজার সতীন ও তাদের সখী সাথীদের জন্যে রাজকোষ থেকে যে পরিমিত ব্যয় হয়, সেগুলি কি প্রজাদের রক্ত জল করা অর্থ কর থেকে নেওয়া নয় ? রাজার কাছে যে কোন উপায়ে ধন আসুক না কেন, তা শুধু প্রজার পরিশ্রমের মধ্য দিয়েই আসে। তাছাড়া কোন রাজার বাড়ীতে দীনারের গাছ ত নেই, তবে হাজার গুণ দেবার প্রশ্ন উঠতেই পারে না।

—মিথ্যাকে ত আমি অস্বীকার করছি না। আমার কথা হল যদি মিথ্যে বলতেই হয়, তাহলে ছোট মিথ্যে বলে কি হবে। খুব বড় মিথ্যাই বলা উচিত। এতবড় মিথ্যে বলব যেন লোক তার পরিধি খুঁজতে খুঁজতে জীবন শেষ করে ফেলে। তাছাড়া এমন মিথ্যা শুধু আমি একা বলিনি। ব্যাস, বাল্মিকী প্রভৃতি মুনি ঋষিরা আমাদের রাস্তা দেখিয়ে গেছেন। বিক্রমাদিত্য অত সহজে ভোলবার পাত্র নয় তা নিশ্চয় তুমি জান।

—জানি মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত এবং কৌটিল্য দুজনের মিলিত বুদ্ধির চেয়ে বেশী বুদ্ধি ধরে একা বিক্রমাদিত্য।

—আমার ঐ উক্তির জন্য বিক্রম খুব প্রসন্ন। তার পরেও আমি 'ভূবা মহাবরাহদংষ্ট্রায়াং' বলে একটা শ্লোক লিখেছি। সেই শ্লোক শুনেই বিক্রম আনন্দে লাফিয়ে উঠেছিল। তারপর বলল—এই শ্লোকবর্ণিত ভাবার্থ আমাকে পাষাণে উৎকীর্ণ করতে হবে। তারপর যখন একজন দক্ষ মাথুর শিল্পী ঐ মহাবরাহের মূর্তি তৈরী শেষ করল, তখন বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রথম আমাকে দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তুমি এবং আমি রাজার অন্তঃপুরে বসে তাদের আসল নগ্নরূপ দেখেছি, তাই তাদের কোনও কিছুতেই আমরা আশ্চর্য হই না। তবে সেদিন যখন মূর্তি দেখলাম মথুরার মন্দিরে, তখন আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়েছিলাম। বরাহের মূর্তি ওর নিজের মূর্তি, কিন্তু মাথাটি রাখেনি নিজের। তারপর বরাহের দাঁতের সঙ্গে লাগান ভূ-দেবীর মূর্তি আর কারও নয় স্বয়ং ধ্রুবদেবীর।

আমি মহাকবির কথায় হেসে জবাব দিলাম—মথুরার মন্দিরে আমি ঐ মূর্তি দেখেছি. কবি।

—মথুরায়ও ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছে! মিত্র, সেদিন আমি মথুরা থেকে আসবার কথা মিথ্যা বলেছিলাম। আমার মনে হয় ঐ মূর্তি দেখে আমার মত তোমার মনেও একই চিন্তার উদয় হয়েছিল। কিন্তু বিক্রমাদিত্য এই সব বেশী পছন্দ করে। সরাসরি যদিও আমাকে হুকুম করেনি যে চন্দ্রগুপ্তের চরিত্র, বদান্যতা ও

গুপ্তবংশের উপর তুমি কবিতা লেখ। তা যদি বলত তাহলে আমার কর্তব্য ঠিক করতে বেশী চিন্তা করতে হত না। আমি আমার কবিতার মাধ্যমে শুধু সেই অন্তর্বেদনার গানই গাই যা যতদিন এই পৃথিবীতে মানুষ থাকবে ততদিন অমর হয়ে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে রাজাদের স্বার্থরক্ষার জন্য আমি এতসব কথা লিখেছি যা শুধু গুপ্তবংশ কেন প্রত্যেক রাজবংশ রক্ষা করবেই।

—কিন্তু এ সব ত মহাক্ষত্রপ রাজবংশেও সম্ভব হতে পারত।

—না, মহাক্ষত্রপ রাজবংশের সে শক্তি আর নেই। যদিও অনেক শত্রুদের আমরা রাজাশ্রিত ব্রাহ্মণদের মত শকদের ম্লেচ্ছ বলতে পারি না। ক্ষত্রপ কোনপ্রকারেই পল্লব, বাকাটক, গুপ্ত রাজবংশের চেয়ে কম নয়। তারা ব্রাহ্মণদের সম্মান করে, বিদ্যার উপযুক্ত মর্যাদা দেয়। নিজেদের ভারতভূমির সন্তান বলে ভাবে, ধর্মকে রক্ষা করে। অতএব তাদের আমি ম্লেচ্ছ বলতে পারি না। বিক্রমাদিত্যের মুখ থেকেও একথা একদিন আমি শুনেছি। কিন্তু একটা কথা হল, কোনও রাজবংশই দুই আড়াই শ বৎসরের বেশী নিজেদের বৈভবকে স্থায়ী রাখতে পারে না।

—ক্ষত্রপ ত তিন শ বৎসরেরও বেশী হল।

—হ্যাঁ, ওরা এখন অস্তাচলের সূর্যের মত লাল হয়ে আছে। যে রক্তাভ প্রভাতের বালসূর্যালোকেও থাকে। কিন্তু মানুষ প্রভাতের বালসূর্যের উপরই আশা করে। অস্তমান সূর্যের লালিমাকে আশা করা যায় না।

—হুঁ। সেইজন্যে গুপ্তবংশকে নিজের অর্ঘ দেওয়া পছন্দ করলেন?

—হাঁ। যদিও গুপ্তবংশের বালসূর্যকে আমি দেখিনি। তার বদলে আমি এক নতুন ধর্মের কিরণ দেখেছি। সেটাও এমন ধর্ম যে ধর্মকে শুধু কয়েকজন শিক্ষিত ধনী পরিবার জানে তা নয়, সকল সাধারণ জনতাও তাকে উপলব্ধি করতে পারে।

—অর্থাৎ গো-ব্রাহ্মণ পূজা, মন্দিরগুলির বিশাল আড়ম্বর এবং কথা পূরাণ!

—হ্যাঁ, আমি বিশ্বাস করি ব্রাহ্মণদের শক্তি আবার ফিরে আসবে। ক্ষমা করো মিত্র, আমি তোমার ঘরেও এক সুন্দর বুদ্ধ মূর্তি দেখেছি। আমার মনে হয় ভবিষ্যতে বুদ্ধধর্মের প্রভাব লুপ্ত হয়ে যাবে।

—আমিও আপনার সঙ্গে একমত মহাকবি। বুদ্ধধর্ম বহুজন হিতায় ধর্ম। যখন যবন, কুষান, শক প্রভৃতি রাজারা আমাদের দেশে এসেছিল, তখন প্রথমে বৌদ্ধরাই তাদের স্বাগত জানিয়েছিল। ব্রাহ্মণরা ম্লেচ্ছ বলে দূরে সরে এসেছিল। এই বর্ণভেদ ও জাতি-ভেদকে বৌদ্ধরা উচ্ছেদ করতে পারেনি এবং এই বর্ণব্যবস্থার ফলে আমরা আগন্তুকদের উচ্চস্থান দিতে পারিনি।

—ঠিক সুযোগ বুঝে ব্রাহ্মণরা নিজেদের ভূলের পরিবর্জন করে নিয়েছে। তারা সেই সকল ম্লেচ্ছদের নিজেদের ক্ষমতার দ্বারা উচ্চ ক্ষত্রিয় বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তুমি নিশ্চয় জানো মিত্র যে দেবপুত্রশাহী ও মহাক্ষত্রপ ব্রাহ্মণদের ভক্ত। তাই কালিদাস আশা রাখে যে এই নতুন ধর্ম এবং নতুন ব্যবস্থা চিরস্থায়ী হবে। যে আশা ক্ষত্রপদের কাছে করতে পারিনি। তাছাড়া বাকাটক সূর্যও এখন অস্তাচলের পথে। পৃথিৃসেন তাকে বাঁচাবার জন্যে যদিও কিছু চেষ্টা করেছিল কিন্তু বিক্রমাদিত্য সুযোগ বুঝে রুদ্রসেনকে জামাইরূপে নিজের দাস বানিয়ে সে আশাও নির্মূল করেছে। বাকাটকের শাসন সূত্র এখন প্রভাবতি গুপ্তা অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের হাতে।

—তাহলে মহাকবি, নিজের সৃষ্টির উপর তোমার আস্থা নেই। আমার মনে হয় সেটা ভুল। তোমার সৃষ্টির মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যা এমনিই অমর হয়ে থাকবে চিরকাল।

—হতে পারে আমার ভুল। তবুও বিক্রমাদিত্যের আশ্রয় নিয়েছি। তার আশ্রয় পৃথিবীর সমুদায় ভোগ আমার কাছে সুলভ হয়েছে, এবং অক্ষয় যশের আশাও করি। আমি এখন বিক্রমাদিত্যের কাছ থেকেই আসছি।

—তা ত আগেই শুনেছি।

—কিন্তু যে বার্তা আমি বহন করে এনেছি, সে কথা ব্যক্ত করতে তোমার কাছে আমি কুণ্ঠিত হচ্ছি। প্রলোভন দেখানো তোমাকে ধৃষ্টতা কারণ এতবড় যৌধেয় জাতির মহাসেনাপতি এবং যৌধেয় গণসঙ্ঘের পুরষ্কর্তা নিজের আবাসের জন্যে একটা ঘর পর্যন্ত রাখেনি। আমি যদি বিক্রমাদিত্যের মুখপাত্র হয়ে বলি যে, সমগ্র যৌধেয় এবং মালব ভূমিই নয় ভবিষ্যতে অবন্তী ও সৌরাষ্ট্র দেশ জয় করেও যদি তোমার চরণে উপহার দেওয়া যায়, তাহলেও তুমি অপমানিত বোধ করবে।

—সে কথা বিক্রমাদিত্য জানে। আমাকে দিয়ে মালবরাজ হবার প্রস্তাবকে স্বীকার করবার আশাও সে রাখে না।

—সে ত আমি আগেই বলেছি। কিন্তু বিক্রমাদিত্য সারা ভারতখণ্ডে একচ্ছত্র রাজত্ব স্থাপনের আশা করে।

—এবং সে আশা কেবলমাত্র ধর্মকে রক্ষার জন্য নয়। পরোপকার, চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং বিদেশীদের আক্রমণের হাত থেকে ভারতভূমিকে বাঁচাবার জন্যে। মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত ও কৌটিল্য ঠিক সেই আশাই রাখত।

—তারা অসফল হয়েছে এই ত বলবে? কিন্তু বিক্রমাদিত্য বলে গণতান্ত্রিকদের জন্যে তারা সফল হতে পারেনি এবং বিক্রমাদিত্যও পারছে না।

—গণ নিরঙ্কুশ রাজাদের চোখের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিক্রমাদিত্যের সময়ে গণপ্রভাব তেমন নেই। মালবদের হজম করা শেষ হয়েছে। কিন্তু বিক্রমাদিত্য জানে যে যৌধেয়দের হজম করা ততখানি সহজ নয়। এইবার সে যৌধেয়কে পদানত করতে চায় এবং তাকে সাহায্য করবার জন্য ব্রাহ্মণ এবং আপনি অর্থাৎ কবি, মহাকবিরাও প্রস্তুত হয়েছে। তারপর চন্দ্রগুপ্ত যখন এই সকল গণগুলিকে নিজের করায়ত্ত করতে পারবে তখন চুপি চুপি আপনারাও ইতিহাসের পাতা থেকে তাদের নাম মুছে দেবেন।

—তোমার কথাই ঠিক মিত্র। বিক্রমাদিত্য জানে যে যৌধেয়কে পদানত করা কত কঠিন।

—তার কারণ যৌধেয়দের মধ্যে বিভীষণ পাওয়া যাবে না।

—তার পরিণাম কি হবে ?

—এক একজন যৌধেয় নিজের জীবন আহুতি দেবে।

—বিক্রমাদিত্য যৌধেয়দের ফলে-ফুলে পূর্ণ শস্যভূমিতে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তা তুমি দেখতে পারবে ?

—হয়ত পারব। কিন্তু জীবন থাকতে যৌধেয় নাম লুপ্ত হতে দেখতে পারবে না কোন যৌধেয়।

—মিত্র, বীর চিরপূজ্য। কিন্তু এটাও এখন ভাববার সময় এসেছে, যে যমুনা থেকে লোহিত্য এবং হিমালয় থেকে কৃষ্ণবেণী (কৃষ্ণা নদী) পর্যন্ত শক্তিশালী নোনাজলকে যৌধেয় সহ্য করতে পারবে কিনা।

—বুঝেছি মহাকবি, কিন্তু মোকাবিলা করবার আগে হাতিয়ার নামিয়ে রাখা নির্বুদ্ধিতা, তাছাড়া এ যৌধেয় জাতির জীবন মরণের সমস্যা। আমি নতুন করে চন্দ্রগুপ্তের সামনে আবার বলতে পারি যৌধেয় সমুদ্রগুপ্তের কাছে যে সর্ত স্বীকার করেছিল, এখন এবং ভবিষ্যতেও তা মানতে রাজী আছে।

—তা হবার নয় মিত্র জয়। সে ভারতবর্ষে কোনও গণ বা কোনও রাজাকে স্বতন্ত্র থাকতে দেবে না। তার কথা হল একটিও গণ থাকতে ভারতখণ্ডের শক্তিকে দৃঢ় করা যাবে না।

—একজন মাত্র রাজার ইশারাতে সমস্ত ভারতখণ্ডের সকল প্রজা যেদিন প্রাণ দেবার জন্য তৈরী হবে, সেদিন বিদেশী শত্রুদের সহজেই পরাজিত করে বিক্রমাদিত্য শান্তিতে বাস করতে পারবে। কিন্তু আর একটা দিক চন্দ্রগুপ্ত ভাবেনি। ভারতখণ্ডের মধ্যে যখন দশ বিশটা পরমভট্টারক জন্ম নেবে, এবং যখন সেই সকল প্রজার দল দেশের মধ্যে নিজ নিজ ভট্টারকদের মুণ্ডপাত করতে থাকবে, তখন ভারতখণ্ড সবল হবে না দুর্বল হবে ?

—নিঃসন্দেহ দুর্বল হবে।

—গণরাজ্যে তাদের বিবেক বুদ্ধি আছে। আপনিই বলুন মহাকবি, আজ যদি আমি যৌধেয় গণসঙ্ঘের পুরস্কর্তা বা মহা-সেনাপতি হিসেবে তাদের আদেশ করি তোমাদের হাতিয়ার চন্দ্রগুপ্তের চরনে অঞ্জলি দিয়ে তার বশ্যতা স্বীকার করো, তাহলে আপনি কি ভাবেন তারা সে আদেশ পালন করবে ?

—কখনই নয়।

—চন্দ্রগুপ্ত আজ সারা দেশকে হীনবল করে নিজেকে সবল করতে চায়। আর আমি আমার দেশবাসীকে বিবেকী যোদ্ধা তৈরী করার আশা রাখি।

—তোমার আশা সম্ভব হত যদি সারা দেশটা ভিন্ন ভিন্ন গণ-অন্তর্ভুক্ত হত। নিজের চোখের সামনেই ত মালবগণকে লুপ্ত হতে দেখলে।

—তাই বলে আমিও কি সজ্ঞানে যৌধেয় গণকে লুপ্ত হতে সাহায্য করব ?

—তুমি কি সারা ভারতখণ্ডে যৌধেয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাও ?

—না। যৌধেয়রা এইরকম একছত্র ব্যবস্থার পক্ষপাতী নয়। আমাদের গণসঙ্ঘে কুনিন্দ, আর্জুনায়ন ও যৌধেয় তিনটি গণই সমান অধিকারী। এদের কারও মধ্যে কোনও বাধ্য বাধকতা নেই, সকলেই স্ব-ইচ্ছার যোগ দিয়েছে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। আমি ভারতখণ্ডে স্বতন্ত্র গণসমূহের স্বাধীন সঙ্ঘ দেখতে চাই।

—এ স্বপ্নের কথা।

—সে স্বপ্নও সুখের। কে বলতে পারে যে সময়ের মধ্যে আমরা বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি রাজপুরোহিতদের স্থাপিত রাজত্ব কাল থেকে আজকের বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে পৌঁছেছি, সেই সময়ের মধ্যে আমার স্বপ্ন সফল হবে না ?

—তা বটে, কাল আবর্তনশীল।

—আমাদের বিশ্বাস একদিন না একদিন আমার স্বপ্ন সার্থক হবে।

কালিদাস আমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তায় নিরাশ হল। কিন্তু বিদায়ের সময় সে অঞ্জলীভরে আমাদের স্নেহ ও প্রীতি নিয়েই গেল। আমার মনে হয় কালিদাসের প্রতিভার কিছু অংশ আমাদের গণকে উদ্বুদ্ধ করবে, কিন্তু ভয়ও হয় কালে কালিদাসের আশঙ্কা সত্যে পরিণত না হয়। হয়ত তার কবিতার সেই অংশগুলি পরবর্তী প্রভূদের দ্বেষাগ্নিতে নষ্ট হয়ে না যায়।

পরিশেষ

এর পরের ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ করবার জন্য লেখক আজ আর জীবিত নেই। তাই তার অসম্পূর্ণ ইতিবৃত্তকে সম্পূর্ণ করবার জন্য শোকাকুল হৃদয়ে মাধবসেনকে লেখনী ধরতে হয়েছে।

কালিদাসের বিদায় নেবার পর জয় বুঝতে পেরেছিল যে বিক্রমাদিত্য যৌধেয় আক্রমণ করতে বিলম্ব করবে না। অতএব যুদ্ধের জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুত হতে হলো। যদি যৌধেয় বিক্রমের রাজ্যসীমার মধ্যে গিয়ে যুদ্ধ করতো এবং এই যুদ্ধ শুধু প্রতিরোধাত্মক না হয়ে আক্রমণাত্মক হত, তা হলে এ যুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হত নিঃসন্দেহে। কিন্তু যৌধেয় অন্যের ভূমি হস্তগত করতে চায় না। যৌধেয়রা সর্বদা নির্মল হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করেছে এবং বর্ণনাতীত কোন অসঙ্গতি বা মালিন্য ছিল না। উজ্জয়িনীতে জয়ের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়ের দিন থেকে কোনও দিন আমরা দুজনে কাছ ছাড়া হইনি। মৃত্যু এসে আজ জয়কে আমার কাছ থেকে ছিন্ন করে নিয়ে গেল। আমি রোহিতকীতে জয়'এর পাশে ছিলাম যখন জয় সকল যৌধেয়ানীদের এক বিরাট সভায় ভাষণ দিচ্ছিল।

"যৌধেয়-যৌধেয়ানীগণ! তোমরাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ যৌধেয় বীরদের জন্ম দিয়েছ, তাদের তোমাদের স্তনের দুধ খাইয়ে মানুষ করেছ। আজ তোমরা শুধু যৌধেয় মাতা বা বোন নও, আজ তোমরা সকলে একমাত্র যৌধেয়ানী। আজ আমাদের সামনে যে

সঙ্কট এসেছে এমন সঙ্কট আমাদের ইতিহাসে আর কখনও আসেনি। আজ চন্দ্রগুপ্ত আমাদের কাছে দাবী করেছে যে আমরা যৌধেয় নাম ছেড়ে দিই, আমরা যৌধেয় ধর্ম ত্যাগ করি। যদি নাম বা ধর্ম না রইল, তাহলে আমাদের বেঁচে থাকারও কোন সার্থকতা নেই। আমরা জানি শত্রু খুবই বলবান। সারা ভারতখণ্ডে অর্ধেক জনবল, ধনবল তার অধিকারে, কিন্তু যৌধেয় জাতি কখনও রাজাদের জন বা ধনবলের তোয়াক্কা করেনি। আমরা একবার চন্দ্রগুপ্তকে পরাজিত করেছি। হয়ত সেকথা সে ভুলে গেছে। আবার আমাদের সে কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এবার পুরুষদের মত নারীরাও অস্ত্রধারণ করবার পূর্ণ অধিকার পেয়েছে। সুনন্দা তোমাদের পথ দেখিয়ে গেছে। আজ আমার ভাবতে আনন্দ হচ্ছে যে আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে আজ একাধিক সুনন্দা রয়েছে। শুধু যৌধেয় নারী নয়, আজ কুনিন্দ নারী ও আর্জুনায়ন নারীদের মধ্যেও অনেক সুনন্দা জন্ম নিয়েছে। যৌধেয় নরনারীদের কর্তব্য পালনের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ধৃষ্টতা।

দেশকে তৈরী করতে বিশ বৎসরের বেশী সময় আমরা পাইনি। গুপ্ত সম্বত ৮০ তখন চলছে (খৃঃ ৩৮০) জয়ের বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর। এমনি সময় তাকে শেষবার অস্ত্র ধরতে হল। এবার জয় জানতো যে চন্দ্রগুপ্ত শুধু অগ্রোদকা অধিকার করেই ক্ষান্ত হবে না।

যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই। আর সে ইচ্ছাও নেই। আমরা পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমান্তে দুর্গ তৈরী করেছিলাম, কিন্তু অশ্বারোহী এবং পদাতিক সৈন্যের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়েছিল। গুপ্তদের বহু রথ এবং হাতী ছিল। প্রথম আক্রমণ শ্রুঘ্ন (অম্বালা) সূহ্নদেশের দিক দিয়ে হল। সেদিকে আমরা তাদের যমুনা পার হতে দিইনি। কিছু দূরে দূরে মথুরার কাছ অবধি তারা যমুনা পার হবার চেস্টা করেছে কিন্তু সফল হয়নি। মথুরা আগে থেকেই গুপ্তদের অধিকারে ছিল এবং সেইটাই আমাদের

পক্ষে সবচেয়ে বেশী বিপদজনক ছিল। গুপ্তসেনা মথুরার পথে যমুনার ডানদিকের তটবরাবর উত্তরের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। জয় যৌধেয় গণ-সঙ্ঘের মহাসেনাপতি মথুরার দিকের ঘাঁটির গুরুত্ব বুঝতো, তাই সেখানে সে নিজে গুপ্তসেনাকে হটাতে হটাতে একেবারে সমতল ভূমি পর্যন্ত পৌঁছে দিল। একমাস পর্যন্ত গুপ্তসেনা সেদিক দিয়ে যৌধেয় ভূমিতে ঢুকতে পারেনি। বিক্রম স্বয়ং মথুরায় বসে সৈন্য পরিচালনা করছিল। বিক্রমাদিত্য তার সকল সেনাপতি-দের ঢালা হুকুম দিয়ে দিল যে ক্ষয় ক্ষতির দিকে দৃকপাত না করে এগিয়ে চলো। মথুরার ঘাঁটির কাছে যদিও শত্রুপক্ষের খুব বেশী ক্ষতি হচ্ছিল কিন্তু আমাদেরও কম হয়নি। অন্যান্য ঘাঁটি থেকে সেনা সরিয়ে আনতে হয়েছিল আমাদের মথুরার যুদ্ধক্ষেত্রে। পুরা আড়াই মাস যাবত ভয়ানক যুদ্ধের পর গুপ্তসেনা আর্জুনায়ন সীমার মধ্যে প্রবেশ করতে সমর্থ হল। কিন্তু যৌধেয় এক আঙ্গুল পরিমাণ ভূমির জন্য শত শত জীবন দান করেছে। যখন গুপ্তসেনা আর্জুনায়ন সীমার দিক দিয়ে এবং পূর্বদিকে যমুনা পার হয়ে মথুরার কাছে এসে উপস্থিত হল, তখন বাধ্য হয়ে জয়কে নিজেও ঘাঁটি পিছনে সরিয়ে আনতে হল।

ইন্দ্রপ্রস্থে গুপ্তসেনার কাছে যৌধেয় সেনার সবচেয়ে বড় পরাজয় হল। তাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হল নিজের মহাসেনাপতিকে বন্দী করে আনতে। জীবন থাকতে জয়কে ধরতেও পেরেছিল তারা। জয় যুদ্ধ করতে করতে ক্ষতবিক্ষত দেহে রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হয়েছিল। জয়'এর কাছে বীরসেন এসে প্রণাম করে দাঁড়ালো, জয় বীরসেনকে মাত্র একটি বাক্য বলতে সময় পেয়েছিল। "যৌধেয় ভূমি থেকে আমার শবকে নিয়ে যেতে পারো।" বীরসেন বড় বড় চিকিৎসককে ডেকে জয়কে চিকিৎসা করবার ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু তার আগেই যৌধেয় ভূমিতে তার শেষ নিশ্বাস মহাশূন্যে মিশে গেছে।

যদিও তাদের মহাসেনাপতিকে তারা হারিয়েছিল, কিন্তু জয়ের

কথামত একটি যৌধেয় ও ভেড়ার মত আত্মসমর্পণ করেনি। নদী, নালা, জঙ্গল, পাহাড়, প্রতি গ্রামে, প্রতি ঘরে ঘরে তারা লড়াই করে জীবন দিয়েছে। স্ত্রী পুরুষ সকলে কল্পনাতীত বীরত্ব প্রদর্শন করেছে এই যুদ্ধে। কোন বিশেষ ঘাঁটিতে আর যুদ্ধক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র যৌধেয় ভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

বিক্রমাদিত্য অগ্রদোকা, রোহিতকী, খাণ্ডিলা, পৃথুদকা প্রভৃতি নগরী অধিকার করল। সেখানে যে কোনও যৌধেয় স্ত্রী পুরুষকে পেয়েছে তাকেই নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। অতঃপর যৌধেয় সেনারা জঙ্গলে গিয়ে আত্মগোপন করে লড়াই করতে লাগলো এবং পরবর্তি দশবৎসর যাবত সে যুদ্ধ চলেছিল। ইতিমধ্যে একটি গ্রামও গুপ্তসেনা সম্পূর্ণ অধিকার করতে পারেনি। সীমান্তের পথে নগরীর প্রবেশ গুলিও গুপ্তসেনার দখলে ছিলনা। প্রত্যেক জায়গায় যৌধেয়ের আক্রমণের ভয় ছিল। কেউ বলতে পারতো না কখন কোন দিক দিয়ে যৌধেয় বীর তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতএব এই দশ বৎসর যাবত যৌধেয় ভূমির স্থানে স্থানে সৈন্য ছাউনি বাঁধতে হয়েছিল বিক্রমাদিত্যকে। লক্ষ লক্ষ যৌধেয়, আর্জুনায়ন ও কুনিন্দ বাসী নিজের জাতির স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য প্রাণ বলি দিয়েছে। গুপ্তসেনা অকাতরে যৌধেয়দের হত্যা করেছে। সুন্দর যৌধেয় ভূমিকে শ্মশানে পরিণত করেছে। কিছু কিছু যৌধেয় পড়শী রাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিল। তার মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসা বাণিজ্য করে কাটাতে লাগলো এবং আজও তারা আশা রাখে কোনও না কোনও দিন আবার তাঁরা দেশে ফিরে যাবে।

আর বিক্রমাদিত্য? যৌধেয় অধিকার করবার পরই অবন্তী আক্রমণ করলো। মালব ও বাকাটক সেনা তার সহায় ছিল। জয় আগেই এই আশঙ্কার কথা বলেছিল। তবুও ক্ষত্রপ যৌধেয়দের সঙ্গে মিলে বিক্রমের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে রাজী হয়নি। এখন ক্ষত্রপের আর কেউ সাথী রইল না। যদিও তারাও শত্রুর সঙ্গে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কয়েক মাসের মধ্যে

অবন্তী, লাট, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি বিক্রমাদিত্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। ক্ষত্রপবংশ চিরকালের জন্য লুপ্ত হয়ে গেল।

বিজয়োৎসাহে বিক্রমাদিত্য নানাপ্রকার রূপার সিকার প্রবর্তন করল। যার ষোলটি সিক্কা এক দীনারের সমান। সেই সিকার উপর মুদ্রিত হল ঃ

"শ্রীগুপ্তকুলস্য মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্রগুপ্তবিক্রমাদিত্যস্য"

॥ শেষ ॥